সতী

স্বপন বসু

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৭৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৮২

প্রকাশক
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
উইলিয়ম হজেসের সতীচিত্র (১৭৯৩) অবলম্বনে শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস,
কলকাতা-৯

ব্লক
স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং,
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্য বই :

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-৫৬)

[২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ]

নিবেদন

বছর তিনেক আগে পুরোনো কাগজের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে হয়েছিল নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মোহমুক্তভাবে সতীপ্রথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় বোধহয় এসেছে। বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম, সতী সম্পর্কে আর যাই হোক তথ্যের কোনো অভাব নেই। বিচিত্র সেইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হল, সতী সম্পর্কে প্রচলিত অনেক ধারণাই ঠিক নয়। ঠিক যে নয়, সেটা দেখানোই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। সতীপ্রথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পর যে কয়েকটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে হয়েছে তা হল :

(১) জোর করে মেয়েদের সতী করা হত, এ-ধারণাটা একেবারেই ঠিক নয়, শতকরা ৯৯টি মেয়েই সতী হত স্বেচ্ছায়,

(২) সতী যারা হত তারা সবাই আক্ষরিক অর্থে 'সতী' নয়, অনেকেই রীতিমতো 'অসতী',

(৩) আমাদের দেশেই নয়, সতীপ্রথা কোনো-না-কোনোরূপে একসময় সারা পৃথিবীতেই ছিল,

(৪) সতীপ্রথার বিরুদ্ধবাদীদের নায়ক রামমোহন—তাঁর দুর্ভাগ্য, হয় ভক্তরা তাঁকে মাথায় তুলেছেন, অথবা বিরোধীরা তাঁকে পথে বসিয়েছেন। অথচ সতীবিষয়ে তাঁর প্রকৃত ভূমিকাটি কি—তথ্যনিষ্ঠভাবে কেউই দেখাতে চেষ্টা করেন নি। আমরা সমকালীন অজস্র সাক্ষ্য উদ্ধার করে সতী বিষয়ে তাঁর প্রকৃত ভূমিকাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি,

(৫) সতীপ্রথা নিয়ে একসময় পত্রপত্রিকায় কি প্রচণ্ড সোরগোল উঠেছিল, সমাজজীবন কেমন টালমাটাল হয়ে পড়েছিল—তার একটু আভাস আমরা সমকালীন পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে পাঠকদের দেবার চেষ্টা করেছি। আমাদের আগে এ-কাজ কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আলোচ্য বিষয়টি যথেষ্ট গুরুগম্ভীর হলেও আমরা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে তা পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি, এবং সেই কারণেই প্রচুর সতী-ঘটনা আমরা তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এ বইতে এমন একটি লাইনও ব্যবহৃত হয়নি যা ইতিহাসনির্ভর নয়।

আমার এই বই-এর পরিকল্পনার কথা প্রথমেই নিবেদন করেছিলাম অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকে। তিনি উৎসাহিত করে বলেছিলেন, 'যাই লেখো সহজ

করে লিখো, বেশি পণ্ডিতি যেন ফলাতে যেও না।' লেখা শেষ হলে অনেক সময় নষ্ট করে তিনি সেটাকে ভদ্ররূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ লেখার কোনো অংশ যদি কারোর ভালো লাগে তবে জানবেন তা তাঁর কলমের গুণে, আর যেখানটা পড়তে হাই উঠবে—হলফ করে বলছি, জানবেন সেটি আমার অরিজিন্যাল প্রোডাকশন্।

এ-কাজ এত নিশ্চিন্তমনে করতে পেরেছি অধ্যাপক শ্রীবাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায়। কর্মস্থল আমার বহুদূরে, তবু দিনের পর দিন তাঁরই অনুগ্রহে পড়াশোনা চালাতে পেরেছি। অধ্যাপক শ্রীঅশোক মুস্তাফি প্রথম থেকে এ-কাজে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সতীর ছবির খোঁজে আমার হাত ধরে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে গেছেন। অধ্যাপক শ্রীঅনিমেষ বসু বহু কষ্ট করে সতী সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য একটি বই আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে তিনি যদি সহমরণের একটি ছবি তাঁর এক আত্মীয়কে বলে আনিয়ে না দিতেন, তাহলে এই গ্রন্থপ্রকাশের আগে সেটি কোনোভাবেই আমার হাতে এসে পৌছত না। গ্রন্থে ব্যবহৃত বর্ধমানের সতীর মাঠের সতী মন্দিরের ছবি তোলার জন্য ডঃ সঞ্জীব চক্রবর্তী আমার মুখ চেয়ে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করছি। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জি চৌধুরীর দয়ায় 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকার মূল ফাইল দেখার সুযোগ পেয়েছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের ধর্মতলা শাখার পাঠক-দরদী কর্মী মণ্ডল মশাই দয়া করে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার মূল ফাইল আমাকে দেখতে দিয়েছেন। কৃষ্ণনগর কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় টডের 'রাজস্থান' বইটি সম্পূর্ণ ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। সাউথ কেনসিংটনের ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামের শ্রীমতী বেটি টায়ারস স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আমায় কয়েকটি সতীচিত্রের সন্ধান জানিয়েছেন। ডাকের গোলযোগে ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ম থেকে পাঠানো সতীর একটি ছবি খোয়া গেলে তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছবিটির আর একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দেন। ডঃ অরুণ বসু, ডঃ স্বপনকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অমিতকুমার আচার্য এ বই সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো-না-কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন। সতী সম্পর্কে পড়াশোনা করার জন্য ইউ. জি. সি. আমাকে সামান্য কিছু অর্থসাহায্য করেন, এজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

'সতী'র উপকরণ সংগ্রহে যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল : ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লণ্ডন, ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন, ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ম, সাউথ কেনসিংটন, বোডলেয়ন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, বিবলিয়েথ ন্যাশনিয়েল, প্যারিস, মুসে মুদার্ট, প্যারিস, স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন, ওয়াশিংটন, ন্যাশনাল মিউজিয়ম, নতুন দিল্লী, গবর্নমেণ্ট মিউজিয়ম, মাদ্রাজ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলকাতা, রাজা লাইব্রেরি, রামপুর, কেরী লাইব্রেরি, শ্রীরামপুর, জয়কৃষ্ণ পাঠাগার, উত্তরপাড়া, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল, কলকাতা, সেণ্ট পলস কলেজ লাইব্রেরি ও কৃষ্ণনগর কলেজ লাইব্রেরি। গ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্রগুলি প্রকাশের অনুমতিদানের জন্য ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

স্বপন বসু

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'সতী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অন্তত বছরদেড়েক আগেই তা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সংযোজন ও পরিমার্জনার কাজে আমার গাফিলতিই এই বিলম্বের কারণ।

সতীপ্রথা সম্পর্কে আমার আগেকার বক্তব্য এখনও অপরিবর্তিত। তবে প্রথম সংস্করণের কিছু অপূর্ণতা এই সংস্করণে দূর করার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী সন্ধানে সতী-সম্পর্কিত অপ্রকাশিত সরকারি দলিলপত্রের মধ্যে অনেক প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পেয়েছি। সতী আন্দোলনে খ্রীস্টান মিশনরিদের ভূমিকা সম্পর্কে এই সংস্করণে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। রামমোহন রায় ও তদানীন্তন বাঙালীসমাজের সতীবিরোধী কয়েকজন মানুষ সম্পর্কেও বেশকিছু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণের ক্ষেত্রে যে-কোনো অসুবিধায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর শরণাপন্ন হয়েছি এবং শরণাগতকে সবসময়ই তিনি রক্ষা করেছেন। শ্রীঅশোক উপাধ্যায় ও শ্রীঅমিত রায়ের কাছ থেকে সতী বিষয়ে দু'একটি তথ্য পেয়েছি। শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার একটি দুষ্প্রাপ্য সতীচিত্রের সন্ধান জানিয়েছেন। নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

৫২-৩ পাতায় সতীদের বয়সের যে চার্ট মুদ্রিত হয়েছে, ছাপার গোলমালে সেই পাতা দুটির লাইন অনেকসময় মেলে নি। সহৃদয় পাঠকেরা পাতাদুটির লাইনগুলি একটু মিলিয়ে পড়বেন।

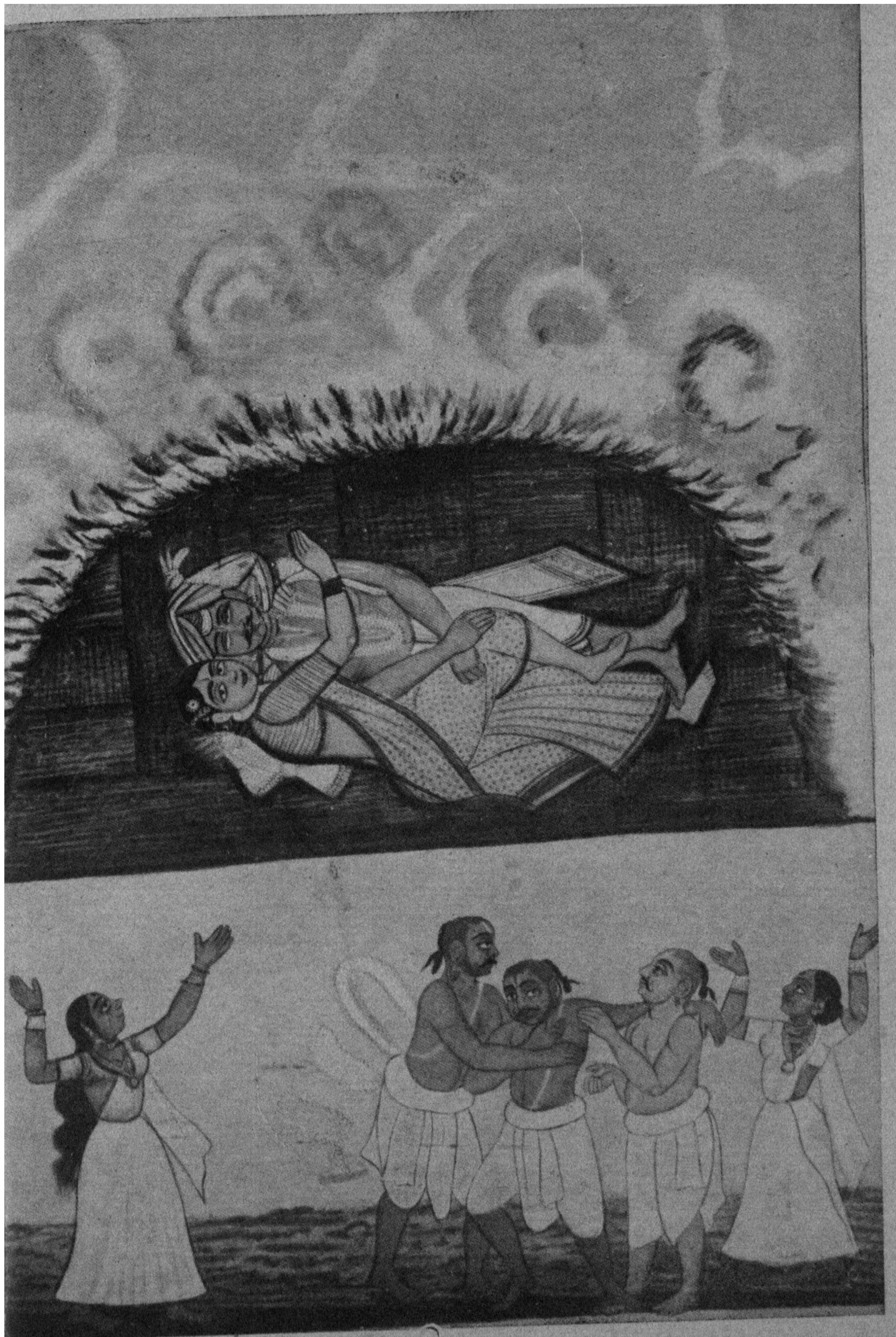
বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি নতুন চিত্র সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্রগুলি প্রকাশের অনুমতিদানের জন্য ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ম, মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৩০ জুলাই, ১৯৮২
১১৫ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস্
কলকাতা-২৯

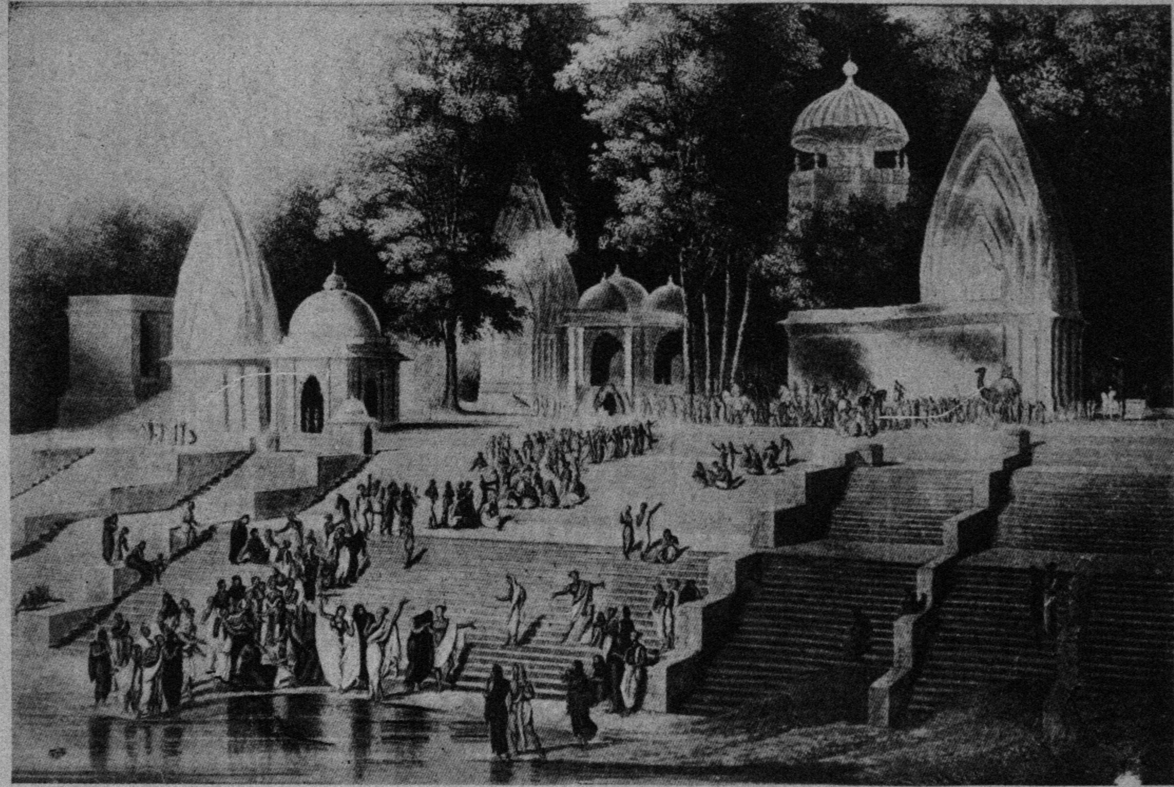
স্বপন বসু

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী



সতী—দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীর চোখে (আনু. ১৮০০ খ্রী.)



বরোদার জনৈক ব্রাহ্মণী স্নান সেরে শোভাযাত্রা করে সতী হতে চলেছেন (মেজর গ্রিণ্ডলে, ১৮৩০)



(…রে) সহমরণ—অজ্ঞাত ব্রিটিশ শিল্পীর চোখে (আনু. ১৮০০ খ্রী.)

(সতীদাহ — আন্দোলন)

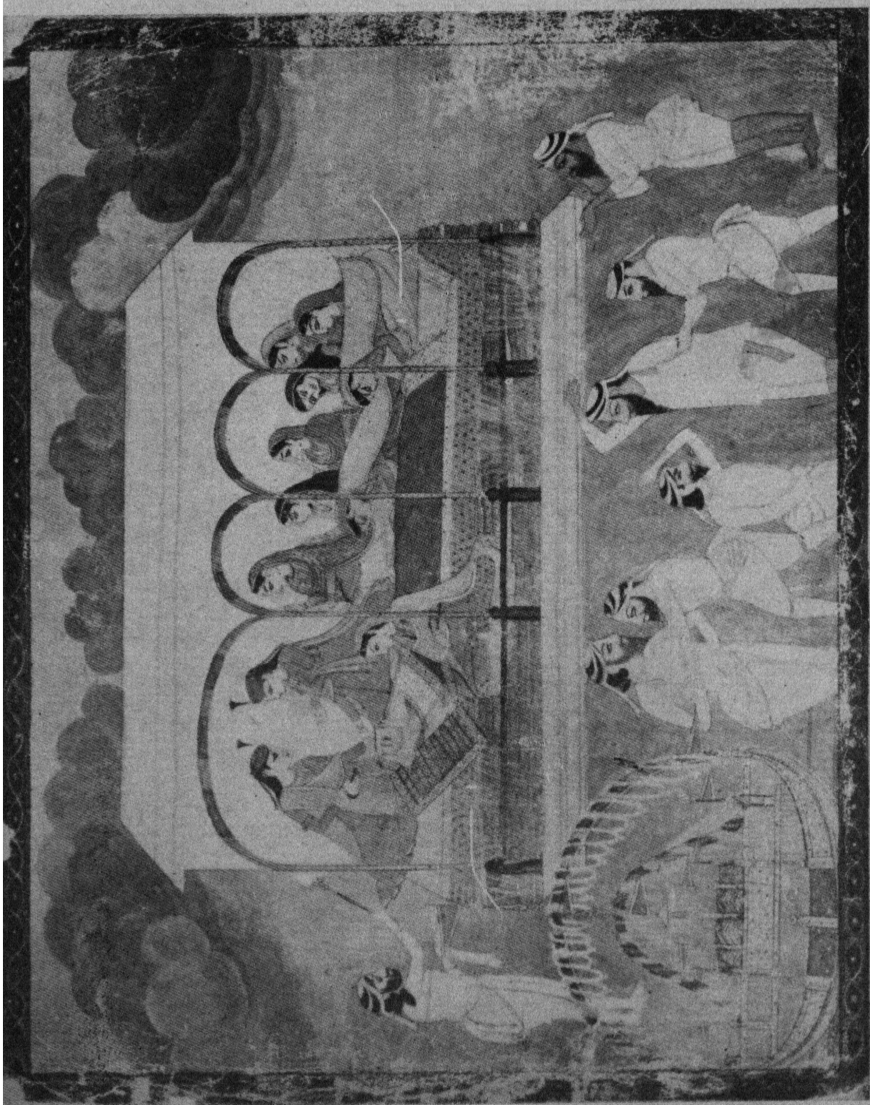
১৮৩০

দুষ্প্রাপ্য

মহামহিম শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক গবরনর
জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা নিবাসি কএক জন লোক হিন্দুরদিগের ব্যবস্থা ও বোধ বিবরন করিবার ভার লইয়া ঐ সকল ব্যবস্থা ও বোধের বিপরীত নিবেদন করিয়াছেন এবং আপনি কৌন্সলের বৈঠকে এমত মিথ্যা কথায় সতী হওনের ব্যবস্থা নিবারন করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে উদ্যত আছেন এনিমিত্তে আমরা স্বাক্ষর করিয়া সভ্রমপূর্ব্বক এই নিবেদন পত্র প্রদান করিতেছি হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্মের উপর হস্তনিঃক্ষেপ করণে আমরা তন্নিবারণে ব্যগ্রতা করিতেছি এবং অতিশয় ভীত হইয়াছি।

(…শে) সতীপ্রথা রদ করা …বে না—রক্ষণশীলদের আবেদন



১। সতী—যুগে যুগে

মাথা নীচু করে ফিরে আসছেন রামমোহন। না, পারলেন না তিনি নীলুর দুই বউকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে।

১৮১৭ খ্রী. শেষদিকের কথা। শিববাজারের কবিরাজ নীলু মারা গেলে তাঁর দুই স্ত্রীই সতী হবার সঙ্কল্প করল। বড় বউ বছর ২৩-এর যুবতী, ছোটর বয়স বছর ১৭। খবর পৌছল পুলিশের কাছে, তাদের অনুমতি ছাড়া এই সময় কেউ সতী হতে পারত না। ২৪ পরগণার স্থানীয় পুলিশ অফিসাররা খবর পেয়েই ছুটে এলেন, মেয়েদুটিকে বোঝাতে সাধ্যমতো চেষ্টাও করলেন। অন্যরাও চেষ্টার কসুর করল না। কোনোকথা শুনতেই কিন্তু বউদুটি রাজি নয়, সতী তারা হবেই।

কালীঘাটের গঙ্গাতীরে অগত্যা সহমরণের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল। সতী হবে শুনে আশপাশ থেকে লোকজন—বিশেষকরে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—চল, চল, তাড়াতাড়ি চল্, সতীমার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

একদিকে যখন এই উদ্যোগ-আয়োজন, অন্যদিকে তখন খবর গিয়ে পৌঁছেছে রামমোহনের কানে। কালীঘাটে দুটি মেয়ে সতী হচ্ছে শুনে কেমন করে তিনি ঘরে বসে থাকেন? জানি না, খবর পাবার মুহূর্তে রামমোহন কোথায় ছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁর মানিকতলার বাড়িতে। যদি মানিকতলায় থাকেন, তাহলে না জানি কি ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে মানিকতলা থেকে কালীঘাট—এই দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করেছিলেন। রাস্তাঘাট ভাল নয়। চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ চলে গেছে দক্ষিণে। দিনের বেলাও সে পথ দিয়ে যেতে পাল্কি-বেয়ারাদের পা ছমছম করে। সেই পথ ধরে পাল্কি করে ছুটে চলেছেন রামমোহন। মনে আতঙ্ক, সময়মতো পৌঁছতে পারব তো। মনের গতির সঙ্গে পাল্কি-বেয়ারাদের চলার গতি মিলছে না। অধীর হয়ে তাই মাঝে-মাঝে মুখ বাড়িয়ে বেয়ারাদের হেঁকে হয়তো বলছেন, জোরে—আরও জোরে—

কালীঘাটে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলেন—না, মেয়েদুটি তখনও চিতায় ওঠেনি। তবে চিতা প্রস্তুত, সব আয়োজন সম্পূর্ণ। দীর্ঘদেহী রাম-

মোহনকে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। সমবেত জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল কে, কে? দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল রামমোহন এসেছেন, রামমোহন। সবার চোখ পড়ল তাঁর দিকে, এই তাহলে সেই মানুষ—যিনি সতীপ্রথাকে বলেন অশাস্ত্রীয়, শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে চেষ্টা করেন মেয়েদের সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে। দেখা যাক, নীলুর দুই বউকে বাঁচাতে পারেন কিনা?

আবার একদফা বোঝানোর পালা ব্যর্থ হলে রামমোহন প্রস্তাব করলেন, ঠিক আছে ওরা সতী হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মতভাবেই তা হতে হবে। আগে থেকে মেয়েদের চিতার সঙ্গে বেঁধে তার ওপর ডালপালা চাপিয়ে তাতে আগুন ধরান চলবে না। চিতায় শায়িত শবদেহে অগ্নিসংযোগ করার পর জলন্ত চিতায় নীলুর দুই বউকে স্বেচ্ছায় প্রবেশ কবতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রাহ্মণরা রামমোহনের প্রস্তাবে রাজি হলেন। অমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে রাজি না হয়ে উপায়ই বা কি। রামমোহনের মনে তখনও আশা—আগুন দেখে ভয় পেয়ে নীলুর বউরা হয়তো শেষমুহূর্তে পেছিয়ে যাবে।

কিন্তু না, রামমোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আগুন জ্বালার সঙ্গে-সঙ্গে বড় বউটি উঠে অবিচলিতভাবে অগ্নিপ্রবেশ করল। সামান্যপরেই ছোটজন অনুসরণ করল বড়র দৃষ্টান্ত। দুচোখ তাঁর জ্বলছে, মাথায় জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর, আগুনের আঁচে মুখ রাঙা টকটকে। চিতায় ওঠার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সমবেত দর্শকদের দিকে ফিরে সে বলল, 'আপনারা এখনি আমার সতীনকে তাঁর কর্তব্যপালন করতে দেখলেন, এখন আমাকে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে দেখবেন, আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, হিন্দুমেয়েদের সতী হওয়ার পথে আপনারা বাধার সৃষ্টি করবেন না; নাহলে আমাদের অভিশাপ লাগবে আপনাদের ওপর।'[১]

সমবেত জনতা স্তব্ধ, স্তব্ধ রামমোহনও। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেলেন। কোথায়? সম্ভবত বাড়িতে। কালীঘাট থেকে মানিকতলা। অনেকটা পথ। যেতে যেতে সম্ভবত ভাবছিলেন, সতীর চিতা আর কত দন জ্বলবে—নিভতে দেরি হবে আর কতদিন···ক-ত-দি-ন···

সতীর আগুন কিন্তু রামমোহনের সময়ই প্রথম জ্বলে নি। ইতিহাসের পথ বেয়ে আমরা যদি পেছিয়ে যাই দেখব, অন্তত ২৩০০ বছর আগে থেকেই ভারতবর্ষে সতীর চিতা বহ্নিমান। খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখনই ভারতবর্ষে এই প্রথা রীতিমতো প্রচলিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে পাঞ্জাবে এ প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিডোরাস সিকুলাই-এর লেখায় তার পরিচয় পাই।

শুধু ডিডোরাস সিকুলাই বা আরিস্টোকিউলাসই নয়, প্রাচীনকালের একাধিক গ্রীক ও রোমান লেখক সতীপ্রথার উল্লেখ করেছেন। সিসেরো এ সম্পর্কে বলেছেন, 'ভারতের মেয়েরা তাদের স্বামী মারা গেলে কে স্বামীর প্রিয়তমা এই বিবাদে লিপ্ত হয়। বিজয়িনী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সহমরণে যায়, অন্য স্ত্রীরা দুঃখসাগরে ভাসে।'[২]

স্ট্রাবো ভারতের অধিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গত সতীপ্রথার কথা বলেছেন। কবি প্রোপ্রাসিয়াস হিন্দু-মেয়েদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পর সতী হবার জন্য রেষারেষির কথা বলেছেন। ভেলেরিয়াস মাক্সিমাস হিন্দু-মেয়েদের স্বামীর মৃত্যুর পর প্রিয়তমা পত্নী হিসাবে সতী হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি দেখে তাদের অতুলনীয় সাহসে মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে বলেছেন, হাসিমুখে তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে। তাদের অতুলনীয় সাহস, অবিচলিত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের কোন তুলনা নেই।

মেগাস্থিনিসের বিবরণের ওপর নির্ভরশীল আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দীর লেখক সলিনাস স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতীয় নারীদের মধ্যে সতী হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিজয়িনীর উল্লাস ও পরাজিতের বেদনার কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। পঞ্চম শতাব্দীর লেখক স্টবিয়াস এ প্রথা সম্পর্কে প্রায় ঐ একই কথা বলেছেন। সমকালীন আর এক লেখক সার্ভিয়াসও ভারতীয় রাজাদের মৃত্যুর পর তার পত্নীদের মধ্যে সতী হবার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা লিখে গেছেন।[৩]

এইসব লেখকদের লেখা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন যুগ থেকেই সহমরণ ভারতবর্ষের রাজারাজড়া ও অভিজাত পরিবারগুলিতে রীতিমতো প্রচলিত। সে কালেই সতী হবার মর্যাদাটুকুর জন্য রীতিমতো রেষারেষি চলত রানীদের

মধ্যে। তৃতীয় শতাব্দী থেকে সতীপ্রথার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মেলে। অন্ধ্র প্রদেশের গুনটুর জেলায় প্রাপ্ত তৃতীয় শতাব্দীর একটি মৃণ্ময় পাত্রের গায়ে 'আয়মণি ও পুষ্টিকা' এই নামদুটি দেখে পুরাতাত্ত্বিকরা এটিকে সতীপ্রথার সর্বপ্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে অনুমান করেছেন।[৪] ৫১০ খ্রী. হূনদের সঙ্গে যুদ্ধে গোপরাজের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন—'এরন' শিলালিপি থেকে আমরা তা জানতে পারি। ৭০৫ খ্রীস্টাব্দের নেপাল-লেখে ধর্মদেবের বিধবা রাজ্যবতী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবেন বলে তাঁর পুত্র মহাদেবকে রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। রাজেন্দ্রদেব চোলের সময়ে ৯৮৯ শকাব্দের বেলাতুরু-লেখে আছে, জনৈক শূদ্রা-স্ত্রী দেকব্বে তাঁর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে, বাবা-মার আপত্তি উপেক্ষা করে সতী হয়েছিলেন।[৫] ঐতিহাসিক সতী-ঘটনার মধ্যে হর্ষবর্ধনের মা যশোবতীর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। স্বামীর পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই জেনে ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেন। প্রায় সমকালেই রাজ্যবতী নামে নেপালের জনৈক রানীও সতী হন। অবশ্য প্রাচীনকালে সমাজের সর্বস্তরে এ প্রথার চল ছিল কিনা বলা মুশকিল। মনে হয়, ছিল না।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও সতীপ্রথার প্রচুর উল্লেখ মেলে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম—এই দুটি ঋক সহমরণ-বিষয়ক বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই ঋক দুটির অর্থ ও পাঠান্তর নিয়ে মতভেদ আছে। উইলসন, ম্যাক্সমূলার, কাউয়েল প্রমুখ উক্ত বিধির পাঠের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, সপ্তম ঋকটিতে যেখানে 'অগ্নে' আছে, সেখানে 'অগ্রে' পড়তে হবে। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত—যিনি সহমরণকে আধুনিক হিন্দু প্রথাগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর বলে মনে করতেন, তিনি ঐ বিতর্কিত অংশটি ইংরেজিতে এই-ভাবে অনুবাদ করেছেন :

'May these women not suffer the pangs of widowhood. May they who have good and desirable husbands enter the houses with collyrium and butter. Let these women without shedding tears and without any sorrow, first proceed to the house wearing invaluable ornaments' করে মন্তব্য করেছেন : 'There is not a word in the above relating to the burning of widows. But a word in it Agre was altered into Agne, and

the text was then mistranslated and misapplied in Bengal to justify the modern custom of the burning of widows.'[৬]

ঋগ্বেদে সতীপ্রথার উল্লেখ আছে কিনা তা বিতর্কের বিষয় হলেও মহাভারতে সতীপ্রথার কথা পাওয়া যায়। সতী হবার জন্ম রানীদের মধ্যে বিতর্কের একটি ঘটনা মহাকাব্যটিতে পাই। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে কে সহগামিনী হবেন, তা নিয়ে মতান্তর হয়। শেষপর্যন্ত জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী কুন্তীকে নিবৃত্ত করে 'স্বামী সহবাসে অপরিতৃপ্ত' মাদ্রীই স্বামীর সহগমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অর্চিদেবীর সহমরণ বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর রুক্মিণী প্রমুখ ৮ জন পত্নীর অগ্নিতে আত্মবিসর্জনের কাহিনীও এতে পাই। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বেদবতীর মায়ের সতী হবার বর্ণনা আছে। এ অংশটিকে অনেকে অবশ্য প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। বাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্রে' দেখিয়েছেন কেমন করে সে যুগে চটুলা নর্তকীরা সহমৃতা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেমিকদের মন জয় করত। ভাসের 'দূত ঘটোৎকচ' ও 'উরুভঙ্গে' এ প্রথার উল্লেখ পাই। নাট্যকার ভাস অভিমন্যু, জয়দ্রথ ও দুর্যোধনের সঙ্গে উত্তরা, দুঃশলা এবং কৌরবীর সহমরণ বর্ণনা করেছেন। 'কুমারসম্ভবে' রতি তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে উদ্যত, এমনসময় স্বর্গীয় এক আকাশবাণী তাকে নিবৃত্ত করে। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকে' চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা তার স্বামীর প্রত্যাশিত নিধন সংবাদ আসার আগে আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে উদ্যত দেখতে পাই।[৭] ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহারে' সতীপ্রথার উল্লেখ আছে। জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহির সতীর প্রশস্তি গেয়েছেন।[৮] প্রসিদ্ধ সন্তসাধক কবীর এর কথা বলেছেন। কবি চাঁদ বরদাইও এ প্রথার উল্লেখ করেছেন।[৯] কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে একাধিক সতীঘটনা বর্ণিত। 'কথাসরিৎসাগরে' সতীপ্রসঙ্গ আছে। কথাসরিৎসাগরকার সোমদেবের পৃষ্ঠপোষক রাজা অনন্ত আত্মহত্যা করার পর তাঁর সঙ্গে রানী সূর্যবতীর সহমৃতা হবার ঘটনাটি কলহন বর্ণনা করেছেন।[১০] হালের 'গাথাসপ্তশতী'তে একটি স্ত্রীলোকের অনুমরণ গমন-প্রস্তুতির উল্লেখ আছে। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' সতীপ্রথার উল্লেখ পাই। অন্যান্য স্মৃতিসংহিতাগুলিতেও (যেমন পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, অত্রি সংহিতা, দক্ষ সংহিতা ইত্যাদি) এর উল্লেখ আছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় সতীপ্রথার সসম্ভ্রম উল্লেখ মেলে। নারায়ণদেব ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে', দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে', কৃত্তিবাসের

'রামায়ণে', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে', 'ময়নামতীর গানে', ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' এর উল্লেখ আছে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এতবার এ প্রথার উল্লেখ-এর অতি প্রচলনেরই প্রমাণ। এমনকি পারসীয়দের ধর্মবিষয়ক পুস্তক 'দবিস্তানে' সতীপ্রথার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পর যে মেয়ে সতী হয়, সে এবং তার স্বামী সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করে।[১১] একদিকে ভারতীয়রা যেমন এর কথা বলেছেন, অন্যদিকে বিদেশি পর্যটকরাও এ প্রথার উল্লেখ না করে পারেন নি।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিদেশিকে আকৃষ্ট করেছে। এখানকার ধনরত্ন, রাজা-বাদশা, শিল্পসৌন্দর্য, প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদ পর্যটকদের মন ভুলিয়েছে। জ্ঞানের লোভে, অর্থের লোভে বা নিছক ভোগলালসায় পর্যটকরা পাড়ি জমিয়েছেন এদেশে। পুব-পশ্চিম থেকে এসেছেন গ্রীক, চীনা, মুসলিম, পর্তুগীজ, ইংরেজ. ইটালিয়ান, ফরাসী, রুশ—অসংখ্য পর্যটক। মেগাস্থিনিস, ফা হিয়েন, হিউএন চাং, আল বেরুনী, মার্কোপোলো, ইবন বতুতা, নিকোলা কন্টি, বার্নিয়ের. টাভার্নিয়ের প্রমুখরা তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে যে ভারতবর্ষকে এঁকে গেছেন ভারত-ইতিহাসেব মূল্যবান সম্পদ তা। রাজা-বাদশার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ যেমন তাঁরা পেয়েছিলেন, তেমনি দেশের মানুষদের ধ্যানধারণা, আচারবিশ্বাস, সামাজিক বিচিত্র রীতিনীতি চোখ তাঁদের এড়ায় নি। ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে সতীর চিতা জ্বলতে অনেকেই দেখেছিলেন, দেখেও কেউ হয়তো একে এড়িয়ে গেছেন, আবার বার্নিয়েরের মতো কেউ-বা ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে কোনো মেয়েকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, মাণ্ডেলস্লোর মতো কারোর-বা সতীর হাত থেকে অলঙ্কার উপহার পাবার সৌভাগ্য হয়েছে, টমাস বাউরির মতো কোনো পর্যটককে আবার সতী হতে উদ্যত দক্ষিণ ভারতীয় কোনো তরুণী খোঁপা থেকে সাদা-হলুদ ফুল উপহার দিয়েছে, উইলিয়ম হজেসের মতো কাউকে আবার সতী নিজের হাতে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছে। সতীর চিতার পাশ দিয়ে যেতে যেতে এইসব পর্যটকদের কেউ কেউ নীরব দর্শক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। আর এই দেখার অভিজ্ঞতাই ভাষা পেয়েছে তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইটালির দুঃসাহসী পর্যটক মার্কোপোলো চীন থেকে ফেরার পথে দক্ষিণ ভারতের করোমণ্ডল ও মালাবার ঘুরে গিয়েছিলেন। অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা তাঁর। রাজারাজড়ার রীতিনীতি থেকে কোনো শহরের

বেশ্যাসংখ্যা পর্যন্ত কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না। এই অঞ্চলে রাজার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে দাসদাসী ও রানীরা সহগমন করে—একথা তিনি বলেছেন। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে প্রচলিত একটি রীতির কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন:

যখন কোনো ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তখন সে কোনো দেবতার সামনে আত্মবলিদানের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। তার আত্মীয়-বন্ধুরা সঙ্গে-সঙ্গে তাকে একটি বিশেষ ধরনের চেয়ারে বসিয়ে তার হাতে ১২টি ধারাল ছুরি দিয়ে তাকে নিয়ে শহর পরিক্রমায় বেরোয়। এ সময় তারা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকে, এই সাহসী লোকটি স্বেচ্ছায় দেবপূজার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে লোকটি দুটি ছুরি বার করে চিৎকার করে ওঠে 'অমুক দেবতার সম্মানে আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি'—একথা বলার পরই সে তার দুই উরুতে দুবার, দুই বাহুতে দুবার, পেটে দুবার, বুকে দুবার ছুরি বসিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে নিজের সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করে। শেষ ছুরি দুটি হৃদয়ে বিদ্ধ করে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার জীবনাবসানের পর তার আত্মীয়বন্ধুরা উল্লাস সহকারে মৃতদেহটি পোড়াতে নিয়ে যায়, এবং তার স্ত্রী তার প্রতি সম্ভ্রমে একই চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। যে স্ত্রী এই সঙ্কল্প ঘোষণা করে, লোকের চোখে তার সম্মান যায় বেড়ে। আর যারা ভয় পেয়ে তা করেনা, তাদের কপালে জোটে নিন্দা আর অবজ্ঞা।[১২]

মার্কোপোলোর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পর্যটক ইবন বতুতা। বিশ্বপর্যটক বতুতা মহম্মদ বিন তোঘলকের রাজত্বকালে (১৩৪২-৪৭) এদেশে এসেছিলেন। হিন্দুস্থানের মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে নিক্ষেপ করলেও এ প্রথা যে আবশ্যিক নয়, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে, এসব কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নি। এক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনা অতিশয়োক্তি-বর্জিত ও সত্যনিষ্ঠ—মধ্যযুগীয় পর্যটকদের ক্ষেত্রে যা এক বিরল গুণ। মুলতান থেকে দিল্লী যাবার পথে আমঝারি শহরে বতুতা তিনটি মেয়েকে সতী হতে দেখেছিলেন।

মেয়ে তিনটি তাদের স্বামী যুদ্ধে নিহত এই খবর পেয়ে মহার্ঘসাজে সেজে সুগন্ধি মেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলল সতী হতে। ডানহাতে একটি করে নারকেল নিয়ে তারা খেলা করছে, আর বাঁ হাতের আয়নায় মাঝে-মাঝে

দেখছে নিজের মুখ। তাদের ঘিরে বামুন আর আত্মীয়স্বজনদের ভিড়, সামনে ড্রাম, ভেঁপু, বিউগল নিয়ে একদল লোক। হিন্দুমাত্রেই তাদের দেখে বলছে, স্বর্গে আমার বাবা বা মা, বা ভাই বা বন্ধুকে আমার প্রণাম বা শুভেচ্ছা জানিও। প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে তারা 'আচ্ছা' বলছে। বতুতা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাদের অনুসরণ করে মাইল তিনেক যাবার পর ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার একটা জলা জায়গায় এসে পড়লেন।... এখানে এসে স্নান সেরে মেয়ে তিনটি তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও গয়নাগাঁটি বিলিয়ে দিল। তিল তেল ঢেলে চিতার আগুনকে করে তোলা হল গনগনে। জনা ১৫ লোক সরু চেলা-কাঠ, আর জনদশেক লোক ভারী-ভারী কাঠ নিয়ে প্রস্তুত। সতীর আসার প্রতীক্ষায় বাদ্যকররা নীরবে দাঁড়িয়ে। সতী যাতে ভয় না পায়, তারজন্য কয়েকজন আগুনের সামনে একটা কম্বল টাঙিয়ে তাকে আড়াল করে রাখতে ব্যস্ত। এমনসময় সতীদের একজন এগিয়ে এসে তাদের হাত থেকে কম্বলটা টান মেরে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'তোমরা কি আমাকে আগুনের ভয় দেখাচ্ছ নাকি? আমি জানি, এটা আগুন। দোহাই তোমাদের, তোমরা আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' এরপর করযোড়ে আগুনকে প্রণতি জানিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিল সে। সঙ্গে-সঙ্গে বাজনা উঠল বেজে, কয়েকজন কাঠের টুকরো, ডালপালা আর বাকিরা ভারী কাঠগুলো তার ওপর ছুঁড়ে দিল—যাতে সে নড়াচড়া করতে না পারে। কান্নার শব্দের সঙ্গে মিলিত হল উচ্চ কোলাহল। এসব দেখে তো বতুতার প্রায় ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। তাঁর সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি জল এনে তাঁর চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবার পরে, কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে চললেন।[১৩]

ফিরে বতুতা কোথায় গেলেন, এই মুহূর্তে তা না জানলেও ক্ষতি নেই। কারণ, তিনি ফিরে যেতে না যেতেই ভেনিসের লোক নিকোলা কন্টি:কে ১৫শ শতাব্দীর প্রথমদিকে দেখতে পাচ্ছি ভারতে আসতে। বিজয়নগরে সতীপ্রথার প্রচলন তাঁর চোখে পড়েছিল। বিজয়নগরের রাজা ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী, এই খবরের সঙ্গে-সঙ্গে একথাও তিনি বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রীর সংখ্যাই হাজার বারো! এরমধ্যে হাজার ২/৩কে তাঁর অন্তঃপুরে ঠাঁই দেওয়া হয় এই শর্তে যে, রাজার মৃত্যুর পর তারা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হবে।[১৪] বিজয়নগর ছাড়া, মধ্যভারতেও এ প্রথার প্রচলন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

ভেনিসের লোক কন্টি ঘরে ফিরে গেলেন। ১৬শ শতাব্দীতে পোর্তুগালের

মানুষ ভ্যারেট বারবোসা এলেন এদেশে। ১৫০০-১৫১৬/৭ পর্যন্ত এদেশে রইলেন পর্তুগীজ সরকারের কর্মচারী হিসাবে। দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত সতীপ্রথার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। পড়ে মনে হয়, হয়তো কোনো সহমরণের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। গরিব ও বড়লোকের বাড়ির মেয়েদের সহমরণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আচরণের পার্থক্যও তাঁর চোখ এড়ায় নি। তাঁর মতে প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী বিজয়নগরের মেয়েরা স্বামীর প্রতি সম্ভ্রমবশেই সহমরণে যায়। মেয়েটি খুব গরিব হলে সে তার স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সহগমন করে। কিন্তু মেয়েটি ধনী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া হলে শোভাযাত্রা করে সে শ্মশানে যায়, সেখানে বিরাট এক গভীর কুণ্ডের মধ্যে তার স্বামীকে যখন দাহ করা হয়, তখন সে সরবে কাঁদতে থাকে। তার আত্মীয়স্বজনরা সেখানে সমবেত হয়—নাচ গান সব মিলিয়ে সে যেন একটা উৎসবের পরিবেশ। সেজেগুজে গয়নাগাঁটি পরে সে তার ছেলেপুলে, আত্মীয়বন্ধুদের ধনদৌলত বিলি করে। এরপর তাকে একটা ধূসর বা সাদাটে ঘোড়ায় চাপিয়ে উৎসাহ সহকারে সারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে শ্মশানভূমিতে ফিরিয়ে আনা হয়। আগুনের কাছে বানানো ৪/৫ পা উঁচু একটা কাঠের মাচায় উঠে তিনবার তা প্রদক্ষিণ করার পর পূর্বদিকে মুখ করে মেয়েটি প্রার্থনা করে। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার এমন দৃঢ়তা ও সাহস ফুটে ওঠে যে মনেই হয়না, সে আত্মবিসর্জন করতে যাচ্ছে। এরপর তার হাতে একটি তৈলপূর্ণ আধার দেওয়া হলে, সেটি মাথায় করে, আবার তিনবার মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করে, পূর্বদিকে সূর্যবন্দনা করার পর তৈলপূর্ণ আধারটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেই, সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার আত্মীয়রা সঙ্গে-সঙ্গে তাতে আরো তেল, ঘি, মাখন, কাঠ ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। ফলে আগুন এত বেশি তেজি হয়ে ওঠে যে অল্পক্ষণের মধ্যেই পড়ে থাকে শুধু ছাই আর ছাই। চিতাভস্ম অতঃপর নদীজলে বিসর্জিত হয়।[১৫]

শুধু সহমরণই নয়, বিজয়নগরের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মেয়েরা যে তাদের স্বামীর মৃত্যুর পর সহ-সমাধিস্থ হয়, তাও তিনি বলেছেন। এই উদ্দেশ্যে সতীর গলাসমান এক গর্ত নির্মাণ করে তাতে মেয়েটিকে নামিয়ে দেওয়া হয়। গর্তের চতুর্দিকে মাটি নিক্ষেপ করে পা দিয়ে তাকে সমান করার পর তা মেয়েটির গলা সমান হলে তার ওপর বিরাট একটা পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়, এবং এভাবে মেয়েটি তিলেতিলে মৃত্যুকে বরণ করে।[১৬] অবশ্য দক্ষিণ ভারতের

লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর এই বর্ণনা আদৌ নির্ভরযোগ্য কিনা বলা কঠিন।

একদিকে যখন পর্যটকরা একের পর এক এদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, অন্যদিকে তখন নানা ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ হয়ে উঠেছে মজবুত। রাজদরবারে শুরু হয়েছে ফন্দিবাজ বিদেশিদের আনা-গোনা। ১৬ শতকের শেষ ও ১৭ শতকের প্রথমদিকে তাই এদেশে দলেদলে বিদেশি পর্যটককে আসতে দেখি। উইলিয়ম হকিন্স (১৬০১-১২), টমাস রো (১৬১৫-১৯), টাভার্নিয়ের (১৬৪০-৬৭), নিকোলাই মানুচী (১৬৫৮-১৭০৩?), ফ্রেসোয়া বার্নিয়ের (১৬৫৯-৬৬) ইত্যাদির নাম তো বহুশোনা। আবার রালফ ফিচ (১৫৮৩-৯২), জন মিনডেনহল (১৫৯৯-১৬০৬), উইলিয়ম ফিঞ্চ (১৭০৮-১১) , নিকোলাস উইদিংটন (১৬১২-১৬), টমাস করেট (১৬১২-১৭), এডওয়ার্ড টেরি (১৬১৬-১৯) ইত্যাদিরা টি'কে আছেন ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায়। এইসব পর্যটকদের অধিকাংশই সতীপ্রথার উল্লেখ করেছেন। স্যার টমাস রো-র মতো কেউ সতী অতি পুণ্যকর্ম এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, রালফ ফিচের মতো কেউ-বা এর উল্লেখমাত্র করেছেন, নিকোলাস উইদিংটনের মতো কেউ আবার সুরাটে নিজের চোখে প্রথম দেখা একটি ১০ বছরের স্বামী-সহবাস বঞ্চিত বালিকার অবিচল চিত্তে সহমরণের বর্ণনা দিয়েছেন, পিটার ম্যাণ্ডির মতো কেউ-বা সুরাটে একটি মেয়েকে সতী হতে দেখার পর নিজের হাতে তার ছবি এঁকে দৃশ্যটিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। নিকোলাই মানুচীর মতো কেউ আবার অন্যের বর্ণিত সতীঘটনাকে নির্বিকারচিত্তে আত্মসাৎ করে তাকে নিজের চোখে দেখা বলে হাজির করেছেন, আমার বার্নিয়ের ও টাভার্নিয়েরের মতো কেউ এর বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

টাভার্নিয়ের ভারতে এসেছিলেন একাধিকবার। শাজাহান ও আরঙ্গজেব দুজনেরই সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। মণিমাণিক্য বেচে বেশ দু'পয়সা করেওছিলেন। অনেক জিনিসের মতো ভারতীয় নারীদের সহমরণ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। একাধিক সহমরণের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী টাভার্নিয়ের মেয়েরা কেন সতী হয়, তাও নির্ণয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে সহমরণের রীতির পার্থক্যও তাঁর চোখ এড়ায় নি। বাংলায় প্রচলিত সহমরণের পদ্ধতি বর্ণনা করার সময় তাঁর কলম একটু আতিশয্যের দিকে ঝুঁকেছে। তিনি বলেছেন, বাংলায় জ্বালানীর নিদারুণ অভাবের জন্য

সহমরণের ক্ষেত্রে চিতায় অগ্নি-সংযোগের পর মেয়েটির মৃত্যু হবার সঙ্গে-সঙ্গে তার ও তার স্বামীর অর্ধদগ্ধ মৃতদেহটিকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় কুমীরকে খাওয়ানোর জন্য।[১৭] যাক সে কথা। আমরা বরং তাঁর দেখা দু'একটি সতী ঘটনার মুখোমুখি হই।

পাটনায় থাকাকালীন সতী হতে কৃতসঙ্কল্প এক যুবতীর অকল্পনীয় সাহসিকতা নিজের চোখে দেখেছিলেন তিনি। শহরের ডাচ শাসনকর্তার বাইরের ঘরে বসে একদিন তিনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমনসময় সেখানে বছর বাইশের এক অনিন্দ্যকান্তি যুবতী এসে হাজির। সতী হবে সে, তাই অনুমতির জন্য এসেছে গবর্নরের কাছে। অনুমতি চাইবার সময় তার গলা একটুও কাঁপলো না, একটুও বিচলিত মনে হল না তাকে। গবর্নর মেয়েটির রূপযৌবন দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার সঙ্কল্পচ্যুত করতে চাইলেন। কিন্তু কোনো কথায় কোনো কাজ তো হলই না, উলটে মেয়েটির জেদ গেল আরো বেড়ে। মেয়েটিকে তিনি বললেন, 'আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা কি ভীষণ তা কি তুমি জান···আগুনে কি তোমার ভয় নেই ?' মেয়েটি উত্তর করল, 'না আগুনকে আমি ভয় করি না, আপনি একটা জ্বলন্ত প্রদীপ এখানে আনার আদেশ দিন, তাহলেই আমি আমার কথা প্রমাণ করে দেখাবো।' গবর্নর তাঁর কথা শুনে ভয় পেয়ে আর তার সঙ্গে কথা বাড়াতে চাইলেন না। রেগে-মেগে তাকে বললেন, 'জাহান্নমে যাও তুমি।'

কয়েকজন তরুণ অমাত্য কিন্তু মেয়েটির সাহস পরীক্ষা করে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে গবর্নরের কাছে আগুন আনার অনুমতি চাইল। গবর্নর প্রথমে অনুমতি দিতে না চাইলেও শেষপর্যন্ত তাদের পেড়াপিড়িতে একটা জ্বলন্ত মশাল সেখানে আনার আদেশ দিলেন। জ্বলন্ত মশালটি নিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি দৌড়ে তার সামনে গিয়ে আগুনের শিখায় তার হাতটি মেলে ধরল, মুখে বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই। কনুই পর্যন্ত হাতটা এগিয়ে এগিয়ে মেয়েটি আগুনে পোড়াতে লাগল, অবিলম্বে তা পুড়ে কালো হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে সমবেত সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, গবর্নরও তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে তাঁর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন।[১৮]

১৬৪৮-এ গোয়ার নিকটবর্তী ভেঙ্গারলাতে টাভার্নিয়ের ৯ দিন কাটান। সেখানে অবস্থানকালে একজন হিন্দু মারা গেলে প্রচলিত প্রথানুযায়ী এক গর্ত খুঁড়ে মৃতব্যক্তির দাহের সব আয়োজন করা হয়। মৃতের নিঃসন্তান স্ত্রী স্থানীয় শাসনকর্তার কাছ থেকে সতী হবার অনুমতি লাভ করে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দের

সঙ্গে সতী হবার জন্য যাত্রা করে। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করার সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামে, বামুনরা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে চিতাকুণ্ডে ফেলে দেয়। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরে এত মুষলধারে বৃষ্টি হয় যে আগুন যায় নিভে, মেয়েটির আর সতী হওয়া হয় না। মাঝরাত্রিতে উঠে মেয়েটি তার এক আত্মীয়ের বাড়ি যায়—সেখানে কয়েকজন ডাচ ও ফাদার জএনোন তাকে দেখতে যান। মর্মান্তিক অবস্থা তার, আগুনে পুড়ে সারা শরীর বিকৃত, যন্ত্রণাও অপরিসীম। কিন্তু এত দুঃখযন্ত্রণাও তাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। দুদিন পরে সে আবার আত্মীয়দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সতী হতে যায়।[১৯]

ভারতে অবস্থানকালে টাভার্নিয়েরের সঙ্গে একাধিকবার তাঁর স্বদেশীয় পর্যটক বার্নিয়েরের দেখাসাক্ষাৎ হয়। এইসময় তাঁদের মধ্যে নানাবিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়, এর মধ্যে সতীপ্রসঙ্গ ছিল কি? জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, টাভার্নিয়েরের মতো বার্নিয়েরও তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে সতীপ্রথার ব্যাপক ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অনেক সতী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। কোথাও দেখেছেন সতীর অতুলনীয় সাহস ও মানসিক শক্তি, কোথাও-বা ভয়ে অর্ধমৃত ১২ বছরের বালিকার সহমরণের মর্মান্তিক দৃশ্য। জনৈক বন্ধুপত্নীকে কি কৌশলে তিনি সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করেন তার বর্ণনাটি তুলে ধরছি।

দানেশমন্দ খানের হেড কেরানী বেণীদাস ছিলেন বার্নিয়েরের বন্ধু। বছর দুই ধরে ক্ষয়রোগাক্রান্ত বেণীদাসের চিকিৎসাও করেন তিনি। বেণীদাস মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। তাঁর বন্ধুদের অনেকে দানেশমন্দ খানের কর্মচারী। আগার অনুরোধে তারা বিধবাটিকে সতী হওয়া থেকে বিরত করার নানা চেষ্টা করে। তারা তাঁকে বলে, তাঁর সঙ্কল্প খুবই সাধু ও প্রশংসনীয়, এর ফলে তাঁর সম্মান ও বংশগৌরব অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু তিনি তো মা, কাজেই তাঁর ছোট ছেলেমেয়েদের কথাও তাঁকে চিন্তা করতে হবে, তাদের এভাবে পরিত্যাগ করাটা নিষ্ঠুরতার সামিল। পতিপ্রেমের চেয়ে অসহায় সন্তানের কল্যাণচিন্তা তাঁর কাছে এখন বড় হওয়া উচিত।

কোনো কথা, কোনো যুক্তিতেই বিধবাটি কর্ণপাত করে না। তখন আগার অনুরোধে পরিবারের পুরোনো বন্ধু হিসাবে বার্নিয়ের গেলেন সেখানে, ঘরে ঢুকে দেখেন বীভৎস এক দৃশ্য। বেণীদাসের মৃতদেহ ঘিরে সাত-আটটা কদাকার বুড়ি, আর চার-পাঁচটা বুড়ো বামুন উত্তেজিতভাবে মাঝেমাঝে প্রাণপণ চিৎকার করছে,

বুক চাপড়াচ্ছে। মৃত স্বামীর পায়ের কাছে বিধবাটি বসে—চুল আলুথালু, মুখ শুকনো। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, জলজল করছে তা। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও বিকটভাবে চিৎকার করে সমানে বুক চাপড়াচ্ছেন। হট্টগোল একটু থামলে বার্নিয়ের ঐ দলের কাছাকাছি গিয়ে বিধবাটিকে শান্তস্বরে বললেন, 'আগা আমাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি যদি আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি আপনার দুই ছেলের জন্য মাসিক দু'ক্রাউন করে ভাতার ব্যবস্থা করে দেবেন। ইচ্ছে করলে আমরা আপনাকে জোর করে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে ও যারা আপনাকে এ ব্যাপারে উসকানি দিচ্ছে, তাদের শাস্তি দিতেও পারি। কিন্তু তা না করে আমরা আপনার কাছেই আবেদন জানাচ্ছি। আপনার আত্মীয়পরিজনরা সবাই চান, সন্তানের মুখ চেয়ে আপনি আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। আপনি মা, কাজেই সতী না হলে কেউ আপনাকে ভীরু বলবে না, নিঃসন্তান বিধবার মতো লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও আপনাকে ভোগ করতে হবে না।' একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন বার্নিয়ের বেশ কয়েকবার। কিন্তু বিধবাটির তরফ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। শেষে বার্নিয়েরের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'যদি আমাকে সতী হতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি দেয়ালে মাথা কুটে মরবো।' মনে হল, তাঁর ওপর যেন কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছে! বার্নিয়ের তখন ক্রুদ্ধভাবে তাঁকে বললেন, 'আপনি মা না ডাইনি! বেশ আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন! কিন্তু তার আগে ছেলেদের ডেকে তাদের গলা কেটে আপনার স্বামীর চিতায় ফেলে দিন। নাহলে তারা না খেয়ে উপোস করে মরবে, আমি এখনই দানেশমন্দ খাঁর কাছে গিয়ে তাদের ভাতা নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা করছি।' এত জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলায় প্রত্যাশিত ফল ফলল। বেণীদাসের স্ত্রী আর একটি কথাও না বলে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকলেন। ঘরে উপস্থিত বৃদ্ধা ও ব্রাহ্মণেরা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বার্নিয়ের দেখলেন, বিধবাটিকে এখন তার বন্ধুবান্ধবদের হাতে অনেকটা নিশ্চিন্তমনে ছেড়ে যাওয়া যায়। তাই তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘরমুখো চললেন।

সন্ধ্যার সময় দানেশমন্দ খানের কাছে সব ঘটনা জানাবার জন্য যাবার পথে, বিধবাটির জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খবর দিলেন, বেণীদাসের সৎকার হয়ে গেছে, এবং তাঁর স্ত্রী সহমরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন।[২০]

বার্নিয়ের বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েটিকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে নয়, বলপ্রয়োগে সতী হতে উদ্যত একটি মেয়েকে চিতার সামনে থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন নিকোলাই মানুচী।

ঘটনাকাল ১৭শ শতাব্দীর ষাটের দশক। আগ্রায় থাকাকালীন একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে একজন আর্মানিয়ান যুবকের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, একটি হিন্দু মেয়ে সতী হবার জন্য চিতা প্রদক্ষিণ করছে। ঘোড়ার শব্দ শুনে মেয়েটি তাদের পানে চোখ তুলে তাকাল—সে কি আর্তি তার চোখে মুখে—যেন বলছে, বাঁচাও, আমাকে তোমরা বাঁচাও। সঙ্গী যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তাকে আমি সাহায্য করব কিনা। তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়াল বার করে আমরা আমাদের অনুচরদের নিয়ে 'মার মার' করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে বামুনরা মেয়েটিকে অরক্ষিত রেখেই পালাল। আর্মানিয়ান যুবকটি গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসাল! খ্রীস্টান করে পরে সে মেয়েটিকে বিয়েও করে। পরবর্তীকালে মানুচী যখন সুরাট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন, মেয়েটি তার ছেলেকে নিয়ে সেখানে ঘরকন্না করছে। তাকে বাঁচানোর জন্য সে মানুচীকে অনেক ধন্যবাদও দেয়।[২১]

ভেনিসের লোক মানুচী, দীর্ঘদিন এদেশে থেকে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ভারতে তাঁকে কখনও দেখি দারার সৈন্যবাহিনীতে ৮০ টাকা বেতনভোগী সৈনিক হিসাবে, আবার কখনও চিকিৎসকের বেশে। মোগল সাম্রাজ্যের যে বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তা থেকে বুঝতে পারি ইতিহাসের ফাঁকে-ফাঁকে গালগল্প মেশাতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ, আর মাঝে-মাঝেই অন্যের বর্ণিত বিষয়কে বেমালুম নিজের চোখে দেখা বলে চালিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর লেখায় তিনি একটি অদ্ভুত সতী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি আগে বলে নিই, মন্তব্য পরে।

ঘুরতে-ঘুরতে কাশিমবাজার থেকে মানুচী রাজমহলের পথ ধরেন, সেখানে অনেকবার দেখা সত্ত্বেও একটি হিন্দু মেয়ের সতী হওয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করেন।

ঘটনাটি বিচিত্র, মেয়েটি তার প্রতিবেশি এক [মুসলমান] যুবকের প্রেমে পড়ে। যুবকটি পেশায় দরজি, সেতার বাজায় ভাল। স্বামীকে সরিয়ে দিলে

তারা বিয়ে করে ঘর বাঁধতে পারবে, এই ভরসায়, মেয়েটি তার স্বামীকে বিষপ্রয়োগ করে। বিষপ্রয়োগ করেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি তার প্রেমিকের কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলে, তাকে বিয়ে করার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেয়েটি বলে, 'চল, এখনই এই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে পালাই, সামান্য দেরি করলে সাধারণ সৌজন্যবশত আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে।' যুবকটি দেখল মহা বিপদ। এর সঙ্গে নিজেকে জড়ালে অনর্থক ঝামেলা, বিপদও ঘটতে পারে। তাই সাত-পাঁচ বলে মানেমানে সে সরে পড়ল। যুবকটির বিশ্বাসঘাতকতায় একটুও বিচলিত না হয়ে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে বলল, স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সে গভীর শোকাহত, সতী হবে সে।

শুনে তো তারা মহা খুশি, হবারই কথা—কারণ এর ফলে তাদের বংশমর্যাদা যাবে বেড়ে। উৎসাহ সহকারে তাড়াতাড়ি একটি কুণ্ড প্রস্তুত করে, কাঠ দিয়ে তা পূর্ণ করে মৃতদেহটি তাতে স্থাপন করে অগ্নিসংযোগ করা হল। এসব আয়োজন শেষ হলে মেয়েটি কুণ্ডের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে তার আত্মীয়বন্ধুদের আলিঙ্গন করে শেষ বিদায় নিতে লাগল। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে সমবেত দর্শকদের মধ্যে সেই যুবকটিও ছিল। মেয়েটি কুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে তার কাছাকাছি গিয়ে গলা থেকে সোনার শেকলের মতো একটি গয়না খুলে যুবকটির গলায় পরিয়ে অমানুষিক শক্তিতে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে সুদ্ধ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়।[২২]

এখন প্রশ্ন, সত্যিই কি এমন কোনো ঘটনা মানুচী রাজমহলে নিজের চোখে দেখেছিলেন? আমাদের উত্তর—না। আসলে ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন বার্নিয়ের।[২৩] ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী তিনি না হলেও, বহুল প্রচলিত এই সতী-ঘটনাটি সেকালে ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপেও প্রচারিত হওয়ায় ও সেকালে লোকে ঘটনাটি সত্য বলেই মনে করায় তিনি এটিকে তাঁর বইতে স্থান দেন। বার্নিয়ের বর্ণিত ঘটনাটিই মানুচী নিজের চোখে দেখা বলে চালিয়েছেন। এ অভ্যাস মানুচীর ভালোরকম ছিল। মানুচীর বই-এর ইংরেজি অনুবাদক ও সম্পাদক উইলিয়ম আরভিন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতি মূল্যবান ভূমিকায় জানিয়েছেন, মানুচী বার্নিয়েরকে অনেক জায়গায় আক্ষরিকভাবে কপি করেছেন: 'Evidently he possessed Bernier's book, and I think where the two deal with the same

events, Manucci took the order of his subjects from Bernier. Even then the topics are used chiefly as suggesting to him his own reminicences.'[২৪]

আলোচ্য ঘটনাটি তারই একটি প্রমাণ। তবে এই ঘটনাটি সেযুগে মুখেমুখে যে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী লোকমুখে শুনে তাঁর বই-এ স্থান দিয়েছেন। তবে হ্যামিল্টন বর্ণিত কাহিনীটিতে যুবকটি প্রাক্‌বিবাহ জীবনেই মেয়েটিকে বঞ্চনা করে, এরপর মেয়েটির স্বামীর স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়, চিতারোহনের সময় শেষবিদায়ের ছলে মেয়েটি তার পূর্ববঞ্চনার শোধ নেয়।[২৫]

॥ ৩ ॥

খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকেই ভারতবর্ষের মেয়েরা দলেদলে গিয়ে সতী হয়েছে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যে প্রথা, যার শিকার হয়েছে অসংখ্য নারী—এর জন্ম হল কেন, ভারতবর্ষে তার মূলই বা কেন এত বিস্তৃত হল। উত্তরটা সহজ নয় জানি, তবু চেষ্টা করলে আলোর সন্ধান হয়তো মিলতে পারে।

সতীপ্রথার উৎসসন্ধানে যাত্রা করে কেউ কেউ (যেমন ডিডোরাস সিকুলাই, সামুয়েল পারচেস বা আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন) ভারতীয় নারীদের ওপর অকারণ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছেন। এইসব লেখকদের মতে সতীপ্রথার জন্মের পেছনে আছে নারীর বিশ্বাসঘাতকতা। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা বিষপ্রয়োগে স্বামীকে হত্যা করত বলে, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হবে - এই বিধান প্রচলিত হয়। কারণ, এরফলে নিজেদের স্বার্থেই নারীরা পুরুষকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ভারতীয় নারীদের পতিপ্রেম, বিশ্বস্ততা প্রবাদবাক্যের মতো। তারা হামেশা বিষপ্রয়োগে স্বামীকে হত্যা করত বলে সহমরণের রীতি প্রচলিত হয়, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এরকম ধারণার কোনো ভিত্তি আছে বলে ফ্রেঞ্চ মিশনরি জে. এ. দুবাস মনে করতেন না। সতীপ্রথার জন্মের এই ব্যাখ্যার অবাস্তবতাও সহজেই চোখে পড়ে। বরাবরই সতীপ্রথা ছিল ঐচ্ছিক। স্বামীর মৃত্যুর পর সতী হওয়া না হওয়া ছিল মেয়েদের ইচ্ছাধীন। বিষপ্রয়োগের

হাত থেকে অসহায় (!) স্বামীদের রক্ষা করার জন্য সত্যই যদি এই প্রথার জন্ম হয়ে থাকত, তাহলে এ প্রথা ঐচ্ছিক হতে পারত কি?[২৬]

ভিন্নরূপ অনুমান করেছেন জেমস টড। দক্ষগৃহে স্বামীর অপমানে ক্ষুব্ধ সতীর দেহত্যাগের মধ্যে এই প্রথার আদিরূপ লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 'Female immolation, therefore, -originated with the sun-worshipping *Saivas*, and was common to all those nations who adored this the most splendid object of the visible creation'[২৭] তাঁর এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

আসলে পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে সেবাদাসীর বেশি কিছু ভাবতে পারে নি। তাই কলঙ্ক আরোপ করে বলেছে, বিশ্বাস করো না নারীকে, তারা কামনার দাস, মিথ্যার অবতার, হৃদয় তাদের নেকড়ে বাঘের মতো, আত্মা বলে তাদের কিছু নেই, কাজেই ভালো চাও তো নারীকে শ্মশানঘটের ন্যায় পরিত্যাগ কর। শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নারীর মূল্য নামমাত্র। তাই স্ত্রী-হত্যা একসময় সারা পৃথিবীতেই পুরুষের সৎ-কীর্তির নিদর্শন হিসাবে বর্তমান ছিল! স্কাণ্ডিনেভিয়ায়, প্রাচীন মিশরে, টঙ্গো, ফিজি, মাওরিও এবং অন্যান্য আফ্রিকান সম্প্রদায়ে, রেড ইণ্ডিয়ান এবং স্লাবদের মধ্যে এ-প্রথা অপরিচিত ছিল না। হেরোডোটাস-এর লেখা থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন গ্রীসেও এ-ধরনের প্রথার প্রচলন ছিল। চীনেও এ-প্রথা ছিল বহুল প্রচলিত। চীনাসমাজে বিধবাবিবাহ মোটেই সমাদৃত ছিল না, বরং স্বামীর মৃত্যুর পর যেসব মেয়ে আত্মবিসর্জন দিত, রাজাদেশে তাদের সম্মানে তোরণদ্বার (পাই লাউ বা পাই ফাং) নির্মিত হত। চীনদেশে সাধারণত বিষপানে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে, ছুরিকাঘাতে বা জলে ডুবে বিধবারা আত্মবিসর্জন দিত, কম হলেও দু'চারজন সহমৃতাও হত।[২৮] জাপানেও এ প্রথা একেবারে অপরিচিত ছিল না। চতুর্দশ-পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ডাইনি অপবাদ দিয়ে স্ত্রী-হত্যা ইউরোপে ব্যাপক আকার নেয়। জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স—সর্বত্র মেয়েরা এর শিকার হয়। ডাইনি অপবাদ মাথায় নিয়ে কত অসহায় মেয়েকে যে পুড়ে মরতে হয়েছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। হাত-পা বেঁধে ডাইনি বলে মেয়েদের জলে ফেলে দেওয়া হত। ১৮৩৬-এও ডানজিগের কাছে এ ধরনের ঘটনা ঘটে।[২৯] বালি, সুমাত্রা, কম্বোজ, জাভা, নেপাল ইত্যাদি অঞ্চলেও স্ত্রীর আত্মবিসর্জন হামেশা ঘটত। ভারতেও কোনো রাজা বা

রাজপুরুষের মৃত্যু হলে শয়ে-শয়ে নারীকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত। নারীর মূল্য সমাজে কত কম ছিল তারই প্রমাণ বীভৎস—অকল্পনীয় এইসব কাণ্ড।

আমাদের মনে হয়, সতীপ্রথার জন্মের পেছনে আছে পুরুষাধিকারের ঘোষণা—'নারী পুরুষের সম্পত্তি'—তাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, সকল বিষয়েই তারা পুরুষের অধীন, কাজেই তাকে যথেচ্ছ ভোগদখল করার অধিকার আছে পুরুষের। চিরজীবন নারী তারই থাকবে, শুধু তাই নয়, পরলোকেও তাকে তার সঙ্গী হতে হবে। জীবনে-মরণে নারী শুধু দাসী। যে কোনো মূল্যে তাই তাকে শারীরিক-শুচিতা রক্ষা করে চলতে হবে। আর এই শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নারীকে চিতায় গিয়ে উঠতে হবে। বলা যায়, 'it is the consequence of an unpararelled sexual slavery imposed on women by men and society.'[৩০] নারী সম্পর্কে এবংবিধ মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আদিমসমাজের পরলোক-বিষয়ক ধারণা। আদিম সামাজিক মানুষ বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পরও জীবনের সুখভোগ থাকে অব্যাহত, এবং সেই কারণে মানুষের স্ত্রী ও অন্যান্য বস্তুগত প্রয়োজন কোনোদিনই ফুরোয় না। তাই দেখতে পাই, যখন কোনো হিন্দু রাজা মারা যেত, তখন পরলোকে তার সুখের খোরাক জোগানোর জন্য তার সঙ্গে পুড়ে মরতে বাধ্য হত অসংখ্য স্ত্রী, রক্ষিতা, দাসদাসী, খোজা ও অন্যান্য জীবজন্তু। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাদের পত্নীদের সহমরণে যেতেই হয়, এক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই—একথা একাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক আল বেরুনী লিখে গেছেন। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও অভিজাত পরিবারে কোনো-না-কোনোরূপে এ-প্রথা ছিল। তবে প্রাচীন যুগে নিছক অভিজাত পরিবারেই এ প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়।[৩১] স্বামীর চিতায় বিবাহিতা পত্নীর আত্মবিসর্জন কালক্রমে ভারতীয়সমাজে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পায় ভিন্নকারণে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলে বিদেশিদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ভারতবর্ষের দিকে। শুরু হয় একের পর এক বিদেশি আক্রমণ। ভারতের ধনমান সম্পদ লুণ্ঠিত ও অসহায় নারীদের অত্যাচারিত হওয়া হয়ে পড়ে নিত্যকার ব্যাপার। বিশেষকরে, যারা বিধবা, অসহায়, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। সম্ভবত তখন থেকেই অত্যাচারীর হাত থেকে নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় তাদের আত্মাহুতি সমাজের সর্বস্তরে

প্রচলিত হয়। সামাজিক প্রয়োজনে সমাজপতিরা একে স্বীকার করে নেয় স্বামীর মৃত্যুর পর শোকবিহ্বল অসহায় রমণী অনেকসময়ই ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনা ও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে অব্যহতি পাবার জন্যই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে লাগল। এমনকি প্রবাসে স্বামীর মৃত্যু হলে মেয়েরা স্বামীর ব্যবহৃত কোনো দ্রব্যাদি নিয়ে অনুমৃতা হতে লাগল। লোকে সম্ভ্রমের সঙ্গে মেয়েদের এই স্বেচ্ছামৃত্যু দেখত, দেখে অভিভূত হত, রাতারাতি তাদের দেবীর আসনে বসাত। কালক্রমে এই প্রথা সমাজে গভীর ছাপ ফেলে, ভারতীয় নারীদের মধ্যে সতীসংস্কার গড়ে ওঠে, অনেকক্ষেত্রে এই প্রথা হয়ে ওঠে বংশানুক্রমিক। অর্বাচীন শাস্ত্রকাররা তখন সামাজিক প্রয়োজনে উদ্ভূত এই প্রথার ওপর ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্য আরোপ করে এর উচ্চ মহিমা কীর্তন করতে থাকেন। পুরোহিত-তন্ত্র নিজেদের স্বার্থে স্বামী-স্ত্রীর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক এই ধারণাকে ধর্মীয় আবরণে ধীরে ধীরে নারীর মধ্যে সঞ্চারিত করার ফলে এর প্রচলনও হয়ে ওঠে ব্যাপক। কালক্রমে এই প্রথার মধ্যে নানারকম বিকৃতি প্রবেশ করে। এই প্রথার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দু'চারটি ক্ষেত্রে মেয়েদের ওপর বলপ্রয়োগ পর্যন্ত করা হতে থাকে।

সামাজিক প্রয়োজনে যে প্রথার জন্ম, তার রূপের মধ্যেও ছিল বিভিন্নতা। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী একচিতায় পুড়ে মরলে তার নাম সহমরণ। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রী যদি কাছে না থাকে বা তার সতী হবার কোনো বাধা থাকে (গর্ভ, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে), তাহলে পরে সে আলাদা চিতায় স্বামীর ব্যবহৃত কোনো জিনিস নিয়ে সতী হত। এর নাম অনুমরণ। কত বিচিত্র জিনিস নিয়েই যে মেয়েরা অনুমৃতা হত তার ঠিক নেই—চটি জুতো, কাপড়, হুঁকো, স্বামীর লেখা চিঠি, কুষ্ঠি, স্বামীর ব্যবহৃত ধর্মগ্রন্থ, বাঁধানো দাঁত, ভাত খাবার থালা, দোয়াতদান, বটুয়া, ছাতা, লাঠি—কত নাম করব। স্বপ্নে স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করেও কোনো কোনো মেয়ে সতী হত। স্বামীর ভূত দেখে সতী হবার ঘটনাও বিরল নয়। ১৮২৩-এ জৌনপুরে গণেশিয়া নামে এক ব্রাহ্মণ মহিলা তার অনুপস্থিত স্বামীর ভূত দেখে সে মৃত এই বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করে সতী হয়।[৩২] গাজিপুর জেলায় অনেক মেয়ে সিঁদুর কৌটো নিয়ে অনুমরণে যেত। মারাঠী মেয়েদের মধ্যে আবার মৃত স্বামীর অস্থি নিয়ে অনুমরণে যাবার রেওয়াজ ছিল। বোম্বাই-এ দক্ষিণ কোঙ্কন অঞ্চলের মেয়েরা অনুমরণে যাবার সময় অনেকসময় মৃত স্বামীর অনুরূপ একটি চালের মূর্তি গঠন করে তার সঙ্গে

পুড়ে মরত। এই প্রথার নাম 'পলাশবুদি।'[৩৩] ব্রাহ্মণ মেয়েরা অবশ্য এই প্রথা পালন করতে পারত না। বলে রাখি, শতকরা ৯৮ জন মেয়েই সহমৃতা হত, একজন কি দুজন হত অনুমৃতা। শাস্ত্রমতেই ব্রাহ্মণীর অনুমরণ আবার নিষিদ্ধ।

শুধু সহমরণ বা অনুমরণই নয়, সতীপ্রথারই আর একটি রূপান্তর সহসমাধি। এই প্রথামতো মৃত স্বামীর সঙ্গে তাদের জীবিত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করা হত। দক্ষিণ ভারতে একটি কুণ্ড খনন করে তাতে মৃত স্বামীর সঙ্গে মেয়েরা সহসমাধিস্থ হত। বাংলাদেশেও যোগী সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই প্রথা পালন করত। ত্রিপুরা অঞ্চলে এই প্রথার বেশ চল ছিল।

সতীপ্রথা ভারতের অঞ্চলবিশেষে অল্পবিস্তর প্রচলিত হলেও ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলের মেযেরা সতী হবার সময় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অনুসরণ করত। বাংলার মেয়েরা সতী হবার জন্য যে অনুষ্ঠান পালন করত সেটা একনজবে দেখে নেওয়া যাক ঃ

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে একটা ছোট আমের ডাল হাতে নিয়ে শবের কাছে গিয়ে বসে পড়ে। নাপিত এসে তখন তার হাত-পা দেয় আলতায় রাঙিয়ে। স্নান করে মেয়েটি নতুন কাপড পরে। মাথার চুল এলো করে দুটো চিরুণী দিয়ে তাকে সামনের দিক দিয়ে দুপাশে বিছিয়ে দেয়। এইসব প্রস্তুতির মধ্যে বিচিত্র সুরে অবিরাম বাদ্য বাজে। যা শুনে লোকে বোঝে কেউ সতী হতে যাচ্ছে—সারা গ্রামেব মানুষ সেখানে জমায়েত হতে থাকে। সতীর ছেলে অনুষ্ঠানের সব জিনিসপত্র একত্রিত করে। ছেলে না থাকলে তার কোনো আত্মীয়, তাও না থাকলে এসবের ভার পড়ে গ্রামের মাতব্বরের ওপর। অতিমাত্রায় দাহ্য পদার্থের সাহায্যে চিতা প্রস্তুত হলে অনুষ্ঠানের ব্রাহ্মণ সতীর কাছে গিয়ে তাকে নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ করায়। হাতে জল নিয়ে সে আচমন করে, সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করে সতী প্রার্থনা করে, চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বের সমান বা তার মাথায় যত চুল, ততদিন সে যেন স্বর্গে স্বামীসুখ ভোগ করতে পারে ; স্বর্গের নর্তকীরা তার ও তার স্বামীর জন্য চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করে, এবং তার এই পুণ্যকর্মের জন্য তার পিতামাতা ও স্বামীর পূর্বপুরুষরা যেন স্বর্গে যায়। মন্ত্রোচ্চারণের পর সে গায়ের অলঙ্কার এক এক করে খুলে তার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে দু'হাতে বাঁধে লাল সুতো, চুলে দেয় নতুন চিরুণী, কপালে পরে সিঁদুরের টিপ। বসন-প্রান্তে বেঁধে নেয় কিছু খই আর কড়ি। একদিকে যখন সতী প্রস্তুত হচ্ছে

চিতারোহণের জন্য, অন্যদিকে তখন শবদেহটিকে স্নান করিয়ে তা ঘৃতচর্চিত করে মন্ত্রোচ্চারণ করার পর তাকে নতুন বস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। মৃতের পুত্র তার পিতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করে একমুঠো খই উৎসর্গ করে। চিতায় শবদেহটি স্থাপন করার পর সতী সাতবার (বা তিনবার) চিতা প্রদক্ষিণ করে। করার সময় সমবেত দর্শকদের মধ্যে বসনপ্রান্তের খই ও কড়িগুলি ছড়িয়ে দেয়। লোকে কাড়াকাড়ি করে তা সংগ্রহ করে এই আশা নিয়ে যে তা রোগ সারাবে (মায়েরা তাদের রুগ্ন ছেলের গলায় এই কড়ির মালা ঝুলিয়ে দিতেন), সাতবার (বা তিনবার) চিতা প্রদক্ষিণ করার পর সতী চিতারোহণ করে—একটি ছোট বাক্সে আলতা ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস তার পাশে রাখা হয়। ছেলে তার বাবার মুখাগ্নি করার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি চিতার বিভিন্ন অংশে অগ্নিসংযোগ করে। ধ্বনি ওঠে 'হরিবোল'। ভস্মাবশেষ গঙ্গায় বিসর্জিত হয়। দাহস্থান প্রচুর জলে ধোবার পর মৃতের সন্তান তার বাবা-মার নামে পিণ্ডদান করে। স্ত্রী স্বামীর সহমৃতা হলেও তাদের শ্রাদ্ধ কিন্তু হত পৃথকভাবে।[৩৪]

উড়িষ্যায় এই উপলক্ষে একটি গর্ত খনন করে মৃতদেহটি সেখানে রেখে অগ্নিসংযোগ করার পর স্ত্রী এতে ঝাঁপ দিত। উড়িষ্যার পুরী জেলায় আবার বিচিত্র এক রীতি অনুসৃত হত। অগ্নিকুণ্ডে স্ত্রী ঝাঁপ দেবার পর দেহদুটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হবার আগে (তাদের সনাক্ত করা যায় এমন অবস্থায়) তা প্রজ্বলিত কুণ্ড থেকে তুলে কুণ্ডের ধারে দুটি পৃথক চিতায় দাহকার্য সম্পন্ন করা হত। কোনটি বাবা আর কোনটি মার ভস্মাবশেষ ছেলে যাতে তা চিনতে পারে, এবং তার সামান্য অংশ রক্ষা করে যথাসময়ে যাতে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারে—সেজন্যই নাকি এই রীতি।[৩৫]

সতীপ্রথাকে ভারতীয় সমাজ যে সম্ভ্রমের চোখে দেখত তা নিয়ে বিশেষ মতভেদ নেই। সতীর আশীর্বাদের জন্য মানুষ থাকত উদগ্রীব, তার নিক্ষিপ্ত কড়িকে মনে করত পরম পবিত্র। কিন্তু এমনও হয়েছে, লোকের পাওনা মাত্র চার আনা পয়সা না মিটিয়ে কারোর পক্ষে সতী হওয়া আটকে যাচ্ছিল। বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনুন তবে—

[১৮১৯-এ] 'এক স্ত্রী সহমরণ করিতে উদ্যতা হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়াছিল তাহার জ্বালানের কাষ্ঠ এক দোকান হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিল সে দোকানীর কাষ্ঠের দরুণ চারি আনা বাকী ছিল তৎপ্রযুক্ত সে দোকানী আসিয়া কহিল যাবৎ চারি আনা না দিবা তাবৎ আমি সহমরণে যাইতে দিব না।

এই বিরোধে আধঘণ্টা কালক্ষেপণ হইল। সে স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল ও কহিল যে আমাকে তলোয়ার দিয়া খুন কর কিংবা অন্য প্রকারে মারিয়া ফেল কিন্তু বিলম্ব করিও না। পরে ঐ চারি আনা তাহাকে দিয়া ঐ বিবাদ মিটাইলে সে স্ত্রীকে চিতারোহণ করাইল ও সে অনায়াসে সতী হইল।'[৩৬]

দোকানীকে তার পাওনা চার আনা পয়সা যিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বদান্যতা সন্দেহাতীত! কিন্তু এই 'বদান্য ব্যক্তিটি' যদি সেই মুহূর্তে এই বদান্যতাটুকু না দেখাতেন, তাহলে একটা জীবন হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারত।

একটি মেয়ের জীবনের দাম কত? জানি না। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন, যুগে যুগে যেসব মেয়ে সহমৃতা হয়েছে—তারা কি সবাই আক্ষরিক অর্থে 'সতী', — সবাই কি পতিব্রতা, একনিষ্ঠ, তাদের স্বামী-প্রেম কি সত্যই ছিল দৃষ্টান্তস্থল?

২। 'সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত'

১৮০২-এর কাছাকাছি সময়ে এক সম্পন্ন কায়স্থ মারা গেলে শেষকৃত্যের জন্য তাকে কাশীপুরের গঙ্গাতীরে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে সতী হবার দাবিদার দুটি মেয়ে—একজন মৃতের স্ত্রী, অন্যজন রক্ষিতা।

বউটির বয়স বছর ১৪। স্বামী তার অন্যের প্রতি আসক্ত, একথা এতদিন লোকমুখে সে শুনে আসছিল। শ্মশানে এসে জীবনে প্রথমবার সে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে দেখল। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে মৃদুস্বরে সে সেই ভিন্নজাতীয়া মেয়েটিকে বলল, 'তুমি এখানে কি করতে এসেছ? তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে তা জানি, কিন্তু তবু স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে বাস করার সৌভাগ্য আমারই প্রাপ্য। যদিও তিনি একদিনের জন্যও আমার সঙ্গে থাকেন নি, আমাকে ভালোওবাসতেন না—তবু আমি তাঁকে ভালোবাসতাম গভীরভাবে।' মেয়েটিকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বউটি বলেই চলল, 'যদি তুমি তাঁর সহগমন করতে চাও—এসো তাহলে একসঙ্গে আমরা সতী হই, নাহলে তুমি ফিরে যাও, আমাকে সতী হতে দাও।'

কৌতূহল—বিশেষকরে মেয়েদের মধ্যে বড় প্রবল। তাই শ্মশানের সেই পরিবেশে দাঁড়িয়েও বউটি মেয়েটির কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা উনি তোমাকে কি-কি দিয়ে গেছেন?'

'তেমন আর কি, নগদ ২৫টা টাকা আর কিছু কাপড়চোপড়।'

'মাত্র এই, এইমাত্র!' বউটি তো অবাক। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সে তাকে আরও ২৫টাকা আর কাপড়চোপড় দিল। ভাবটা—এসব তো পেলে, এখন বিদায় হও। সারাজীবন তো কিছুই পাই নি—এখন আমার সতী হবার শেষ সাধটুকুতে বাদ সেধো না।

বউটির পানে চেয়ে মেয়েটির কি মনে হল জানি না। কিন্তু সে তার পথ থেকে সরে দাঁড়াল।

এইসব কথা চলার পর বামুনরা অনুষ্ঠানের আয়োজন সারতে লাগল

তাড়াতাড়ি। বউটিকে কিছু মিষ্টি খেতে দিলে সে তা খেতে অস্বীকার করে বলে, 'আগুন ছাড়া আর কিছুই আমি খাব না, আর তাই খেতেই তো আমি এখানে এসেছি।' বলে রাখা ভালো, বাংলায় সতীর প্রচলিত আর এক নাম 'আগুনখাকী।'

এসময় ঘনমেঘে আকাশ হল কালো, সেইসঙ্গে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। কয়েকজন বলল, বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু বউটি অতসময় অপেক্ষা কবতে রাজি নয়, সে তাদের তাড়াতাড়ি করতে বলল।

এরমধ্যে এক বামুন এসে বউটির কাছে কেঁদে পড়ল, 'মা তুমি আমার ভাইকে দয়া কর।' কি ব্যাপার? জানা গেল, বউটির স্বামীর কাছে ঋণের দায়ে বামুনের এক ভাই জেলে গেছে, তাই সে ছুটে এসেছে—যদি সতী-মা তার ভাইকে দয়া করেন। বউটি তাকে নিরাশ করল না। লিখিত আদেশের নীচে টিপছাপ দিয়ে সব ব্যবস্থাকে পাকা করে দিল।

নদীতীর আর চিতার কাছের অনুষ্ঠান শেষ হলে, বউটি চিতার ওপর শুয়ে স্বামীর মাথার নীচে একহাত আর বুকের ওপর আর একহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল—এই অবস্থায় তাদের দুজনকে বাঁধা হল। চিতা জ্বালানোর সময়ে আবার বৃষ্টি এল মুষলধারে। চিতায় আগুন প্রায় ছিল না বললেই হয়, তা শুধু বউটির কাপড় আর চুল স্পর্শ করেছিল, আধঘণ্টা ধরে এইরকম ধিকিধিকি করে আগুন জ্বলল—বউটি কিন্তু একইভাবে চিতায় শুয়ে রইল—যেন পরমনিশ্চিন্তে সে ঘুমোচ্ছে। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি থামলে কয়েক লহমায় আগুন তাকে গ্রাস করল।

সমবেত লোকজন সতী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ধন্য-ধন্য করতে লাগল। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বউটির সহৃদয়তা, ঋণবদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া, অকৃতজ্ঞ স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা, আর তার শান্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশের কথা সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। মেয়েটি অন্যের সঙ্গে সহবাস করত এমন কানাঘুষো শোনা যায়—কিন্তু চিতার ওঠার আগে বউটি দৃঢ়তার সঙ্গে তা অস্বীকার করে।[১]

এক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত অবশ্য রক্ষিতাকে সরিয়ে স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা স্ত্রীই চিতায় উঠে সতীর গৌরব অর্জন করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগ থেকেই রক্ষিতারাও নির্বিবাদে সতী হত। 'কুট্টনীমতম'-এ একাধিক পণ্যা নারীর সহমৃতা হবার বিবরণ আছে। মধ্যযুগে রক্ষিতার সতী হওয়া এতই সাধারণ ব্যাপার

ছিল যে 'আইন-ই আকবরী'তেও এর উল্লেখ পাই। এতে বলা হয়েছে পূর্বজন্মে অন্যকোনো মেয়ের স্বামীর সঙ্গে সহবাস করলে এবং তার সঙ্গে সহমৃতা হলে শাস্তিস্বরূপ তাকে পরজন্মে দাসী হয়ে কাল কাটাতে হবে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাকে সারাজীবন পালাক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করতে হবে।[২] উনিশ শতকেও রক্ষিতার সতী হওয়া এতই প্রচলিত ছিল যে ১৮১৭-তে সরকারিভাবে ঘোষণা করতে হয়, একমাত্র পতিব্রতা ধর্মপত্নীই সতী হবার অধিকারী, রক্ষিতা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সে অধিকার নেই। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের অগস্ট মাস নাগাদ কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষ থেকে গবর্নর জেনারেলকে অমানবিক সতীপ্রথার বিরুদ্ধে যে আবেদনপত্র দেওয়া হয়, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রক্ষিতার সতী হবার প্রসঙ্গটিও উল্লিখিত হয়: 'Your Petitioners further beg leave to state to your lordship that women have been permitted to burn themselves on the funeral piles of men who were not their husbands; ···and women who have been unfaithful to their husbands, have burnt with their funeral piles';[৩] অবশ্য সরকারি বিধিনিষেধের পরেও রক্ষিতার সতী হওয়া বন্ধ হয় নি। মানকুমারের ঘটনাটির দিকেই একবার তাকানো যাক।

বেনারস বিভাগের বুন্দেলখণ্ডের জসপুরা থানায় বংশীধর নামে জনৈক কায়স্থের সঙ্গে তার প্রণয়িনী মানকুমার ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮-তে সহমৃতা হয়। মানকুমারের বয়স ৫০, বংশীধরের বিয়ে করা বউ নয় সে—৪ বছর তারা একসঙ্গে ছিল এইমাত্র। খবর পেয়ে থানাদার প্রথমে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য একজন বরকন্দাজ পাঠান, পরে নিজেও সেখানে যান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মানকুমার বংশীধরের চিতায় উঠে সহমরণে যায়। এই ধরনের সহমরণ একে অশাস্ত্রীয়, তার ওপর বেআইনী—কাজেই সব দোষ পড়ল থানাদারের ঘাড়ে। চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হল। শুধু তাই নয়, কোর্ট তাঁর অপরাধ বিচার করে তাঁকে ৫০ টাকা জরিমানা করল। বেচারা থানাদার।[৪] শাহাবাদ জেলায় ১৬ জুন, ১৮২২-এ বছর ৫০-এর এক মহিলা তার ভালোবাসার মানুষের মৃত্যুতে সতী হয়। বিয়ে না করেও তারা ২৫ বছর একত্রে ছিল, বছর দশেকের একটি ছেলেও আছে তাদের। তার ভালোবাসার মানুষকে যেখানে দাহ করা হয়, সেখানেই সবাই চলে গেলে সে পুড়ে মরে।[৫]

কথায় বলে বড় ঘরের বড় কথা। তাদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। অনেক অভিজাত পরিবারে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সহমরণে যাক বা না-যাক, তার রক্ষিতাদের যেতে হত। না হলে অভিজাত্য বজায় থাকবে কেমন করে। উড়িষ্যায় কোনো অভিজাত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার রক্ষিতাদের তার সঙ্গে সহমৃতা হতেই হত।[৬] গুজরাটেও তাই। রাজার সঙ্গে শয়ে-শয়ে মেয়ের পুড়ে মরার ঘটনা ১৫শ শতাব্দীর পর্যটক নিকোলা কন্টি লক্ষ্য করেছিলেন। ১৬শ শতাব্দীর পর্যটক বারবোসা বিজয়নগরের এক একজন রাজার সঙ্গে ৪০০/৫০০ জনের পুড়ে মরার কথা লিখে গেছেন।[৭] ১৮১৭-য় নেপালের এক রাজার সঙ্গে তাঁর ১৬ বছরের সুন্দরী রানী, একজন রক্ষিতা ও পাঁচজন দাসী সহগমন করে।[৮]

ব্যাপারটা মাঝেমাঝে বীভৎসতার চরমে পৌছত। ১৮৪৪-এ রাজা সুচেত সিং-এর মৃত্যুতে ৩১০ জন মেয়েকে (এদের মধ্যে ১০ জন তাঁর স্ত্রী, বাকি ৩০০ জন হারেমের রক্ষিতা) পুড়ে মরতে হয়। এদের মধ্যে ১৫০ জন রামনগরে, কয়েকজন লাহোরে, আর কয়েকজন জম্মুতে পুড়ে মরে।[৯] এইসব নরপতিদের পাশব ক্ষুধা যেন মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থেকে দলেদলে অসহায় মেয়েকে চিতায় পুড়িয়ে মারত।

অনেকক্ষেত্রে আবার রক্ষিতা ও দাসীরা প্রভুর সঙ্গে একচিতায় মরার 'সৌভাগ্যটুকুও' পেত না। তাদের পুড়ে মরতে হত অন্যচিতায়।

দাসদেরও অনেকসময় প্রভুর সহমরণে যেতে হত। সতীর পুরুষসংস্করণ আর কি! এমনকি খোজারাও রেহাই পেত না। কলহন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে একটি বেড়ালের কথা লিখেছেন যে তার প্রভু রাজা সুশলার বিয়োগব্যথা সহ্য করতে না পেরে অগ্নিপ্রবেশ করে।

শুধু রক্ষিতাই নয়, যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে অন্যপুরুষের প্রমোদসঙ্গিনী হয়েছে, এমন মেয়েও অনেকসময় স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সতী হত! স্বামীর মৃত্যুর পর যে মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বসবাস করেছে, কখনো-কখনো পরে হঠাৎ স্বামীপ্রেমে ডগমগ হয়ে সেও অনুমৃতা হয়ে বসত। জৌনপুরের উদাসীয়ার কথাই ধরা যাক।

ভোলা চামারের বউ উদাসীয়া। স্বামী মারা যাবার বছর সাতেক পরে ৫মে, ১৮২২-এ ভোলার ব্যবহৃত একটা থালা বুকে নিয়ে হঠাৎ সে সতী হল। কিন্তু উদাসীয়া কি সত্যিই সতী? কোথায়? ভোলার মৃত্যুর বছর দুই পর

থেকে সে অন্য একজনের সঙ্গে বসবাস করেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর। কিন্তু সে হঠাৎ সতীই বা হল কেন? উদাসীয়ার মনে কি অনুশোচনা জেগেছিল, নাকি ঝোঁকের মাথায় সে আত্মাহুতি দেয়?[১০]

উদাসীয়ার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায়, বেরিলি বিভাগের হিমনীর কথা। ১৮২৫-এর ৩০ অগস্ট হিমনী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী সেথুল হাজামের সঙ্গে সতী হয়। ১৭৯৫-এ তার প্রথম স্বামী জয়কিষণ যখন মারা যায় তখন ১ ছেলে, ১ মেয়ে তার। এর বছর তিনেক পরে সে তার দেওর সেথুলকে বিয়ে করে—পাঁচটি ছেলেমেয়েও হয় তাদের। তার মুখাগ্নি করে তার প্রথম স্বামীর ছেলে পরমা।[১১] হিমনী কি—সতী না অসতী? নাকি দ্বিজ-সতী?

এতো মন্দের ভালো। কিন্তু একবার ভাবুন তো সেই স্বামীর কথা, যাকে নিজের চোখে দেখতে হয়েছে তার স্ত্রী উপপতির গলা জড়িয়ে সহমৃতা হচ্ছে! বেরিলির জালালাবাদ থানার শিবনিয়ার কথা প্রসঙ্গত এসে যায়।

শিবনিয়া তার জীবনের ৩০টি বছর পার করে অবশেষে সতী হল। বিয়ে তার অনেকদিন আগেই হয়েছিল, কিন্তু স্বামীর ঘর না করে সে অন্য একজনের সঙ্গে বসবাস করত। তার ভালোবাসার লোকটি মারা গেলে, সে তার সঙ্গে সহমরণে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু গ্রামের জমিদার তার সঙ্কল্পে বাদ সেধে চৌকিদারকে দিয়ে স্থানীয় থানায় খবর পাঠায়। শিবনিয়া সহমৃতা হবার আগেই চৌকিদার ফিরে এসে জানায়, খবর সে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। দারোগাবাবু থানায় নেই, অন্যত্র গেছেন তদন্তের ব্যাপারে। মোহরার আছে—খবর পেয়ে সেই আসছে। কিন্তু সে এসে পৌঁছনোর আগেই শিবনিয়া আত্মবিসর্জন দেয়। মোহরার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায়নি—এই কর্তব্যচ্যুতির জন্য তাকে ডিসমিস করা হয়।[১২]

এর চেয়েও চাঞ্চল্যকর একটি খবর প্রকাশ করে কলকাতার কাগজ 'জন বুল'। খবরটি স্বামীর হাতে নিহত উপপতির সঙ্গে নেপালের জনৈক মহিলার সহমৃতা হবার।[১৩]

কেউ-কেউ আবার ভালোবাসার লোকের মৃত্যুতে অনুমৃতা হত। যেমনটি হয়েছিল কানপুর জেলার বিঠুরের মানকোড়িয়া। মানকোড়িয়া পুরুম আহীরের ধর্মপত্নী। কিন্তু তার চালচলন মনোমত না হওয়ায়, পুরুম তাকে ত্যাগ করে। সে তখন লায়েক সিং নামে এক রাজপুতের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। ১৮১৯-এ লায়েক সিং যখন মারা যায়, মানকোড়িয়া তখন যৌবনের শেষপ্রান্তে। শোকস্তব্ধ

মানকোড়িয়া এ ঘটনাব বছরখানেক পরে ১৫ অগস্ট, ১৮২০-তে তার ভালবাসার মানুষ লায়েক সিং-এব অনুগমন করে।[১৪] যাকে ভালোবেসে স্বামীর ঘর সে ছেড়েছিল, ৩৫ বছব বয়সে তাবই স্মৃতিতে নিজেকে উৎসর্গ করল সে।

এ পর্যন্ত যাদেব কথা বললাম, তাদেব সম্পর্ক মূলত 'প্রেম-ভালোবাসার।' সে প্রেম কখনও বৈধ, কখনও অবৈধ। কখনও তা সমাজের চোখে প্রশংসনীয়, কখনও নিন্দনীয়। কিন্তু সম্পর্ক যেখানে নিছক 'টান-ভালোবাসার,' সেখানেও মেয়েরা সতী হয়েছে—কখনও ছেলের চিতায় মা, কখনও ভাই-এর চিতায় বোন।

পাঞ্জাব আর রাজস্থানে যেসব মা ছেলের সঙ্গে পুড়ে মরতেন, তাঁদের বলা হত 'মা-সতী'। সমাজে এঁদের আসন ছিল খুব উঁচুতে। ভট্টনারায়ণ তাঁর 'বেণীসংহাবে' জনৈক বীবমাতার কথা বলেছেন, যিনি পুত্র যুদ্ধে হত হয়েছে শুনে রক্তবস্ত্র পবিধান করে পুত্রেব সঙ্গে চিতারোহন কবেন। ছেলের চিতায় মায়ের আত্মবিসর্জনের একটি ঘটনা ১৮২২-এর গাজিপুর জেলার সেকেন্দরাপুর থানায় ঘটেছিল। নিমধুব তেওয়ারির স্ত্রী হোলাসী তাঁর স্বামী মারা যাবার ১৬ বছর পরে ৭০ বছর বয়সে ১৩ নভেম্বর, ১৮২২-এ ছেলের সঙ্গে সহমৃতা হন। হোলাসীর ভাই তাঁকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ঘটনাটি সম্পর্কে নিজামৎ আদালত মন্তব্য করে, 'সতীর চেযে এটাকে শোকজনিত সাধাবণ আত্মহত্যার ঘটনা বলাই শ্রেয়।'[১৫] এই জেলাতেই ২৮.৯.১৮২৬-এ অসুনাসী নামে ৩৫ বছরেব এক বাজপুত মহিলা তাঁব ৯ বছরের ছেলের সঙ্গে সহমৃতা হন।

বোনেবা যে অনেকসময় ভায়ের সঙ্গে সহমরণে যেত—আগেই তা বলে এসেছি। ভাই-এর চিতায় বোনেব আত্মবিসর্জনেব একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ১৮২২-এ পাটনা বিভাগের সারনে ঘটেছিল। ঘটনাটা খুলেই বলি।

জগমোহন পাণ্ডে নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার বাবা দিগম্বর পুত্রবধূ নসিবাকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে যায়। আনার পথে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ তাকে জানিয়ে, পথের মাঝে হঠাৎ দিগম্বর তাকে বলে, 'তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, একঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে আসছি।' এই অবকাশে নসিবা কিছু শুকনো ডালপালা যোগাড় করে আত্মবিসর্জন দেয়। থানাদার আর কি করবে, সে তো কোনো খবরই পায় নি। খবর নিয়ে দেখা যায়, নসিবার স্বামী জগমোহন গোরক্ষপুরে মারা গেছে, তাদের কোনো ছেলেপুলে

নেই, নসিবা গর্ভবতীও নয়। নসিবার আত্মবিসর্জনের পেছনে দিগম্বরের হাত আছে সন্দেহে তার ওপর সমনজারি করা হয়। তদন্তের পর এই অভিযোগ থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, অন্য একটি বিচিত্র অভিযোগে তাকে গোরক্ষ-পুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান দেওয়া হয়।

জানা যায়, অচ্ছার্যি নামে জগমোহনের এক বোন গোরক্ষপুরের পুরসানি গ্রামে তার ভাই-এর চিতায় সহগমন করেছে। আর এ ঘটনার নাটের গুরু তাদের বাবা দিগম্বর!

ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারি-ভাষ্যে বলা হয়, অচ্ছার্যির আত্মবিসর্জন আইনত সতী-ঘটনা নয়, আত্মহত্যার ঘটনামাত্র। তবে এক্ষেত্রে আত্মহত্যার ধরণটা অভিনব। জগমোহনের সঙ্গে তার স্ত্রীর বদলে বোন সহমৃতা হয়। জগমোহন-অচ্ছার্যির বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে সে নিজহাতে নিজের ছেলে-মেয়ের চিতা প্রস্তুত করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। বিচারে তার ৭ বছর জেল হয়।[১৬]

দিগম্বরের কি শাস্তি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকবেশি উল্লেখযোগ্য জগ-মোহনের বোনই নয়, আরও অনেক বোনই ভায়ের চিতায় পুড়ে মরত— ঘটনাটা মনে রাখার মতো। ভায়ের সঙ্গে সহমৃতা হবার অনুমতি না পেয়ে ১৩.৮.১৮২৪-এ বেরিলির সাহারানপুরে গুর্জা নামে একটি বছর ৩০-এর মেয়ে স্বামী মারা যাবার ১২ বছর পরে অনুমৃতা হয়। ঘটনাটি বিচিত্র। অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে সাহারানপুরে তার ভাই সদাসুখ অসুস্থ খবর পেয়ে গুর্জা তাকে দেখতে যায়। সেখানে অবস্থানকালে সদাসুখ মারা গেলে সে তার ভাই-এর সঙ্গে সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে সাহারানপুরের কোটালকে তাকে নিবৃত্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। ঘটনার দিন দশেক পরে গুর্জার শ্বশুর নাথুয়া কোর্টে এক আবেদন করে বলেন, তার পুত্রবধূ ১০ দিন ধরে অনশনে—সে তার স্বামীর কিছু স্মৃতি বুকে নিয়ে সতী হতে চায় তারই অনুমতি চেয়ে এই আবেদন। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের পণ্ডিতদের নিয়ে মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তাকে নিবৃত্ত করার সবরকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সঙ্কল্পে সে অবিচল দেখে পণ্ডিত বলেন, এতে শাস্ত্রে কোনো নিষেধ নেই। তখন তাকে জাওলাপুর থানার কনখল শহরে তার স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সতী হতে অনুমতি দেওয়া হয়—ঘটনাকালে থানার মোহরার উপস্থিত ছিল।[১৭] কার জন্য গুর্জা সতী হল—স্বামী না ভাই?

মা-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক তো গভীর ভালোবাসার। কিন্তু যার সঙ্গে কোনো

সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি, আলাপ-পরিচয় তো দূরের কথা, এমন লোকের সঙ্গেও মেয়েরা সহমৃতা হত। আর এ ধরনের একটি ঘটনা আমাদের কাছের শহর চন্দননগরেই ঘটেছিল। ১৮১৮-র শেষদিকে এখানে একটি তরুণী তার ভাবী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়।

চন্দননগরেরই একটি তরুণের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক। বিয়ের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় তরুণটি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। মেয়েটি এই খবর পেয়েই ঘোষণা করল, সে তার ভাবী-স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবে! শুরু হল ব্যাপারটির শাস্ত্রীয়তা নিয়ে মেয়েটির আত্মীয়স্বজন ও বামুনদের মধ্যে দীর্ঘ বাদানুবাদ।

বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে শাঁখ বাজল না, কেউ উলুও দিল না, মেয়েটির সিঁথিও উঠল না রাঙা হয়ে। আত্মীয়বন্ধুদের নীরব বেদনার মধ্যে মেয়েটি গঙ্গার তীরে গেল। ইহজীবনে যার ঘর সে করতে পারল না, পরজীবনে তার ঘর করার বাসনা নিয়েই হয়তো সে তার ভাবী-স্বামীর চিতায় উঠে সহমৃতা হল।[১৮] কিংবা হয়তো বিয়ের ঠিক আগের দিন তার ভাবী বর মারা যাওয়ায়, লোকের চোখে অপয়া হয়ে ওঠার লজ্জা থেকে বাঁচার জন্যই সে সতী হয়। সতী না হয়ে মেয়েটি আর কি করতে পারত—আর কোনোদিনই তার বিয়ে হওয়া তখনকার বাঙালিসমাজে সম্ভব ছিল না। আর তাই না-সধবা, না-বিধবা, না-কুমারী হয়ে চিরদিন বাপ-ভায়ের গলগ্রহ হতে না চাওয়ার জন্যই, সে বোধহয় ভাবী-স্বামীর চিতায় গিয়ে ওঠে। এই একটি ক্ষেত্রে নয়, আরো অনেকক্ষেত্রেই ভাবী-স্বামীর মৃত্যুতে মেয়েরা সহমরণে যেত। ১৮২১-এ শাহাবাদ জেলায় রাটচিলি নামে ১২ বছরের একটি মেয়েকে তার ভাবী-স্বামীর সহগমন করতে দেখি।[১৯] শাহাবাদের ধলগাঁ থানায় ১৪.৫.১৮২৬-এ লখিয়া নামে একটি ৯ বছরের মেয়ে তার ভাবী-স্বামীর মৃত্যুতে সতী হয়। মেয়েটির কাকা চিতায় অগ্নিসংযোগ করায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়—বিচারে তাকে ৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[২০]

কেবল কি হিন্দু মেয়েরা, মুসলমান মেয়েরাও অনেকসময় সতী হত। মুসলমান রমণী স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্থ হয়েছে, এমন ঘটনার কথা শোনা যায়।[২১] এমনকি মুসলমানকে পোড়ানো হয়েছে, আর তার স্ত্রী তার সঙ্গে সতী হয়েছে, এমন ঘটনাও নাকি ঘটত। একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা প্রসঙ্গত বলে নিই। বেনারস বিভাগের বুন্দেলখণ্ডে ১৮২৮-এর নভেম্বর মাসে

একজন হিন্দু কয়েদী জেল হাসপাতালে মারা গেলে একজন মুসলমান রমণী তার সঙ্গে সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে 'but was prevented by order of the acting Magistrate on account of her religion & her not having been legally married to the deceased'.[২২] প্রসঙ্গত বলে রাখি, বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে সতীপ্রথাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত, কেউ-কেউ 'সতীদাহে' সক্রিয় অংশ পর্যন্ত গ্রহণ করত। সতী-অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে যোগ দেয়, তা চতুর্দশ শতাব্দীর পর্যটক ইবন বতুতাও লক্ষ্য করেছিলেন।

সতী যারা হত, তারা সতী না অসতী এ প্রশ্ন এখনকার মতো তোলা থাক। আমরা বরং দেখি, সতী হতে কারা আসত, কি অবস্থায়? আমাদের আবার ঘটনাস্থলে হাজির হতে হয়—

৩। সতীর জাতি ও বিত্ত

আলিগড় জেলার সোমনায় অনেকেই রামভোলকে চিনত। কখনো-সখনো মজুরের কাজ করলেও, আসলে ভিক্ষাই তার পেশা। ১৮২৪-এর মে মাসে রামভোল মারা গেলে তার বউ ভক্ত বলে বসল, 'আমি সতী হব।' ভিখারির বউ ভিখারিনী—তারও সতী হবার সখ। থানায় খবর পৌঁছলে কি হবে, দারোগা বাবু তো ছুটিতে, অগত্যা জমাদার দু'জন বরকন্দাজকে পাঠাল। ঘটনাস্থলে তারা সতী না হবার জন্য ভক্তকে বোঝাচ্ছে, এমনসময় স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার ঠাকুর জয়রাম সিং সদলবলে সেখানে এসে হাজির। সবাই তটস্থ।

মেয়েটির কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'কেন তুমি সতী হচ্ছ? তোমার দিন কেমন করে চলবে এই ভেবে তো? আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যদি সতী হবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর, আমি তোমাকে টাকা দেব, তোমার নামে জমি লিখে দেব—যাতে তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য ভাবতে না হয়।'

ভক্তর বয়স ৬০-এর ওপর, তার মেয়ের বয়সই ৩০। সারাজীবন সে পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। বিদায়বেলায় এই পৃথিবী ছেড়ে সে যেতে চায় সকলের সম্ভ্রম কুড়িয়ে। জীবনে অন্তত একবার সে জয়রাম সিংকে গ্রাহ্য করবে না। কোনো কথায় কান না দিয়ে, নিজের হাতে আগুন জ্বেলে চিতায় প্রবেশ করল ভক্ত।

ভিখারিনী সতী হচ্ছে, জমিদারবাবু অসহায় দর্শক।[১]

না, একটিক্ষেত্রে কেন, অনেক-অনেকক্ষেত্রেই ভিখারিনী সতী হয়েছে, জমিদারের সব অনুরোধ-উপরোধ-প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে।

আবার ঠিক উল্টোরকম ঘটনারও অভাব ছিল না। জমিদারের বউ সতী হচ্ছে মহা-ধুমধামে। অগণিত মানুষের ভিড়—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গ্রামের সব লোক, ঘরের বউ-ঝি সবাই এসেছে সতী দেখতে। সতীমার দর্শন নিয়ে ও তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে এই মানবজন্মকে সার্থক করতে।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে বসেন, কোন শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সতী হবার প্রবণতা বেশি, তাহলে তার উত্তর এককথায় দেওয়া শক্ত। ভিখারিনী থেকে জমিদার-পত্নী, নিরক্ষর কৃষকের স্ত্রী থেকে মধ্যবিত্ত অধ্যাপক-গৃহিণী পর্যন্ত সবাই সতী হয়েছে। অর্থাৎ সতীদের ক্ষেত্রে বয়সের যেমন বাছ-বিচার ছিল না, অবস্থারও তেমনি। তবে মোটামুটিভাবে শহরাঞ্চলের সতীদের অনেকের অবস্থা ভালো হলেও, গ্রামাঞ্চলেব অধিকাংশই দরিদ্র।

কারণটা স্পষ্ট। ইংরেজ আমলের আগে ভারতের গ্রামগুলি ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লী ও নগরের জনসংখ্যার একটা ভারসাম্যও বজায় ছিল। জনসংখ্যার প্রায় ৪০% লোক বাস করত নগরে, ৬০% গ্রামে।[২] ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এদেশে লাগার পরে অবস্থাটা দাঁড়ায় অন্যরকম। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্যের কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজ দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংসসাধন করে। বৃত্তিচ্যুত কারুজীবীরা তখন জীবিকার জন্য কৃষিকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। ফলে গ্রামের ভিড় বাড়ে, গ্রাম ও নগরের জনসংখ্যায় দেখা দেয় ভারসাম্যের অভাব– অবস্থাটা চরমে ওঠে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ১৮৭১-এ বাংলায় নগরবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪.৭৬%। এখানেই শেষ নয়। হাজার-হাজার বৃত্তিচ্যুত কারিগর গ্রামাশ্রয়ী হওয়ায় একদিকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য যেমন বিচলিত হল, অন্যদিকে জীবন-যাত্রার মান হল অবনমিত। ভারতবর্ষ হয়ে উঠল কৃষিপ্রধান দেশ। জমির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় গ্রামগুলি দরিদ্র নিরন্নের ভিড়ে ভরে উঠল। দেশের সম্পদের বৃহত্তর অংশ শহরাঞ্চলের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হল—সেখানে চলতে লাগল 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান', গ্রাম থেকে ভেসে আসা নিরন্ন মানুষের আর্তনাদ তার তালভঙ্গ করতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রের সংখ্যাধিক্যের জন্যই শহরাঞ্চলের সতীদের অনেকের অবস্থা ভালো হলেও, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশই দরিদ্র। দু'একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে।

ঢাকায় ১৮২২-২৪—এই ৩ বছরে যে ৪৬ জন সতী হয়, তাদের মধ্যে ১৩ জন ছাড়া বাকি সবাই উচ্চ বা মধ্যবিত্ত ঘরের। পক্ষান্তরে একান্তভাবে কৃষিপ্রধান অঞ্চল বাখেরগঞ্জে ১৮২২-২৩-এ যে ২৯ জন সতী হয়, তার বেশিরভাগই নিঃস্ব। ১৮২২-২৩-এ হুগলিতে যে ১৬০ জন মেয়ে সতী হয়, তারমধ্যে ধনীর সংখ্যা ৪৯, মধ্যবিত্ত ২৯ আর দরিদ্রের সংখ্যা ৭৮। ১৮২৩-এ কলকাতার

শহরতলী অঞ্চলে যে ৪৬ জন সতী হয় তাদের স্বামীদের মাসিক আয়ের যদি একটা হিসাব নিই দেখব :

২ জনের মাসিক আয়	২০০ টাকা বা তার বেশি,
৭ জনের মাসিক আয় -	১০০ টাকা বা তার বেশি,
৫ জনের মাসিক আয়	৫০ টাকা বা তার বেশি,
৪ জনের মাসিক আয়	২৫ টাকা বা তার বেশি,
২০ জনেব মাসিক আয	১০ টাকা বা তার বেশি,
৮ জনের মাসিক আয়	১০ টাকার নীচে।

এই বছরই গাজিপুরে যে ৫৫ জন সতী হয়, তাদের অধিকাংশই দরিদ্র। নিজামৎ আদালত এ সম্পর্কে মন্তব্য করে 'the greater part of the husbands appear to have died in poor circumstances'[৩] বেনারসে ১৮২২-২৪ এই ৩ বছরে যে ৫১ জন সতী হয়, তার মধ্যে ধনীর সংখ্যা ১৪, মধ্যবিত্ত ২১ জন, বাকি ১৬ জন দরিদ্র। এর পাশাপাশি পাটনা বিভাগের দরিদ্র গ্রামপ্রধান শাহাবাদ জেলার (১৮৮১-র সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী শাহাবাদের ৯৩.৫৪% লোক গ্রামবাসী) হিসাব নিলে দেখব, ১৮২৫-এ শাহাবাদে যে ২০ জন সতী হয়, তার মধ্যে ১৯ জনই গরীব।[৪] শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলেব সতীদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত বেশি তা দেখাই যাচ্ছে। ১৮২২-এ সরকার সতীপ্রথা ধনী ও শিক্ষিতদের মধ্যে কতখানি আছে, অথবা শুধু অজ্ঞ ও দরিদ্রদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ জানার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতিটি সতীর স্বামীর পেশা ও আর্থিক অবস্থা উল্লেখ করতে বলে। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করায় ১৩.৭.১৮২৪-এ এক সার্কুলারে তাঁদের আবার তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

সরকারি-ভাষ্য অনুযায়ী দরিদ্র-অজ্ঞরাই বেশি সতী হত। ১৮২৭-এ জন পয়েণ্ডার তাঁর বক্তৃতায় দেখান, সতীপ্রথা দরিদ্র ও অজ্ঞদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে, অবস্থাপন্ন পরিবারের চেয়ে নিম্নবিত্তদেব মধ্যেই যেন এর প্রবণতা বেশি। কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখলে দেখব, ধনীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশই দরিদ্র। গ্রামগুলি চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, অশিক্ষায় সারা দেশ আচ্ছন্ন – দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি লোক নিরক্ষর, ইংরেজ শোষণে গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত। বক্তব্য আমাদের একটাই। দেশের বৃহত্তর অংশই দরিদ্র ও নিরক্ষর, শিক্ষিত-

সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সেই আনুপাতিক বিচারে আমরা বলব, শুধু অজ্ঞ এবং দরিদ্রদের মধ্যেই নয়, শিক্ষিত-সম্পন্ন আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত পরিবারেও সতীপ্রথার রীতিমতো চল ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই মেয়েরা সতী হত সবচেয়ে বেশি, এই অঞ্চলে শিক্ষিতের হারও তুলনামূলকভাবে বেশি (১৮৮১-র সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মধ্যে কলকাতা, কলকাতার শহরতলী, হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগণাতেই শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি), এবং স্বীকার করতেই হবে, ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূচনা দেখা দিয়েছিল শহর কলকাতা আর তার আশপাশের অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করেই।

অবস্থা ছেড়ে যদি সতীর জাতের বিচার করতে যাই, অনেকেই হয়তো চমকে উঠে প্রশ্ন করবেন—সতীর আবার জাত? ডোমের মেয়ে সতী হচ্ছে, আর বামুনরা তার পায়ের ধুলোর জন্য কাড়াকাড়ি করছে—এমন ঘটনা গল্পকথা নয়। যে মুহূর্তে একজন সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করত, সেই মুহূর্ত থেকে লোকের চোখে সে দেবী, ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত তার আশীর্বাদভিক্ষু। সতীদের জাত নেই মানি, কিন্তু সতী হবার আগে তাদের তো একটা জাত ছিল, তারই হিসাব নেওয়া যাক্।

১৮২৩-এ বাংলায় যে ৫৭৫ জন সতী হয়, তারমধ্যে—

ব্রাহ্মণ	—	২৩৪	জন,
ক্ষত্রিয়	—	৩৫	জন,
বৈশ্য	—	১৪	জন,
শূদ্র	—	২৯২	জন।[৫]

হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য এইভাবে দেখলে ১৮২৬-এ বাংলার মোট ৬৩৯ জন সতীর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২৫৩, কায়স্থের ৮৮, বৈদ্যের ৩৪, অন্যান্যের ২৬৪। এই ৬৩৯ জনের মধ্যে শুধু কলকাতা বিভাগেই ৩৬৮ জন সতী হয়। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ১৫৮ জন, কায়স্থ ৫২ জন, বৈদ্য ৯ জন, এ ছাড়া অন্যান্য জাতের মেয়ের সংখ্যা ১৪৯। এই ১৪৯ জনের মধ্যে আগুরী, বাগদী, কুমোর, তেলি, ডোম, কৈবর্ত, গোয়ালা, চাষা, তাম্বুলী, তাঁতী, সোনার, কামার, চণ্ডাল, সদ্‌গোপ, নাপিত, ছুতোর, কেওরা, গন্ধবেনে, মালী, ধোপা, বেনে, বারুই, মুচি, যোগী, মালাকার, হাড়ি, জেলে, ময়রা, লোহার, পোদ প্রভৃতি

বিভিন্ন জাতের মেয়ে আছে। এদের সবাইকে এককথায় শূদ্র বলা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে নিম্নবর্ণের মেয়েরা বেশি সতী হলেও, একক জাত হিসাবে ব্রাহ্মণ মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি সতী হত, এরপরেই কায়স্থের স্থান। প্রসঙ্গত মনে রাখব, বাংলা দেশে উচ্চবর্ণের চেয়ে তথাকথিত নিম্নবর্ণের সংখ্যাধিক্য (১৮৮১-র সেন্সাস-রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা ১৬.৮৭%, জনসংখ্যার বাকি বৃহত্তর অংশই তথাকথিত নিম্নবর্ণভুক্ত)[৬] সেই আনুপাতিক বিচারে উচ্চবর্ণের মেয়েদের সতী হওয়ার সংখ্যাটা মোটেই কম নয়। জাতের ব্যাপারটা আবার অনেকটা অঞ্চলের ওপর নির্ভর করত। যেসব অঞ্চলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের বাস তুলনা-মূলকভাবে বেশি, সেসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মেয়েরাই বেশি সতী হত। যেমন ১৮২৫-এ নদীয়ায় যে ৬০ জন সতী হয়, তারমধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৩৭, কায়স্থের ৮, বৈদ্যের ২। এছাড়া তাঁতী, বেনে, গোয়ালা, তেলি, সদগোপ, নাপিত, সেকরা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের আরো ১৩ জন মেয়ে সতী হয়। ২৪ পরগণা ও বারাসাতে এই বছর যে ৪৬ জন সতী হয়, তার মধ্যে ২৮ জনই ব্রাহ্মণ, কায়স্থের সংখ্যা ১২, বৈদ্যের মাত্র ১। অন্যান্য জাতের সতীর সংখ্যা ৫টি। এই বছর বেনারসের ১৭ জন সতীর ১৪ জনই বামুন। ঢাকা, বাখেরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বেশকিছু বৈদ্যের বাস। এই অঞ্চলে প্রতিবছরই কিছু বৈদ্যমেয়ে সতী হত। ঢাকা শহরে এই বছরে অনুষ্ঠিত ১৮টি সতী ঘটনার মধ্যে ৮ জন ব্রাহ্মণ, ৭ জন বৈদ্য, ৩ জন কায়স্থ। ১৮২৫-এ বাখেরগঞ্জের ৬৩ জন সতীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ১২ জন, কায়স্থ ২২ জন, বৈদ্য ১৫ জন, অন্যান্য বিভিন্ন জাতের মেয়ের সংখ্যা ১৪।[৭]

আবার বাংলাদেশের যে অঞ্চলে শুধু শূদ্র আর শূদ্র—সেখানে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মেয়েরাই বেশি সংখ্যায় সতী হতে এগিয়ে আসত। জঙ্গলমহলের কথাই ধরা যাক। ১৮২৫-এ এখানে যে ৯ জন সতী হয়, তারমধ্যে ১ জন ব্রাহ্মণের কথা বাদ দিলে বাকি ৮ জনই শূদ্র।

আসলে সতী হওয়াটা কোনো বিশেষ জাতের একচেটিয়া ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রধান চারটি বর্ণের হিন্দু মেয়েরা সতী হতে পারত, এক্ষেত্রে অন্তত জাতের প্রশ্নটা খুব একটা গুরুত্ব পেত না। জাতবিচারে অনেকসময়ে আবার গোলমালও দেখা দিত।

১৮২৮ সালের কথা। ঢাকার অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট তখন মিঃ মরিসন। সতীপ্রথার ঘোর বিরোধী তিনি। এইসময় বিক্রমপুরের রামকিশোর সাঁই-এর বিধবা তাঁর কাছে সতী হবার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি সাঁই হিন্দুদের প্রধান চার বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে, তাকে সতী হবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন; এবং তাঁর এলাকায় হিন্দুদের প্রধান চারবর্ণ ছাড়া অন্যদের সতী হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। ঢাকা সার্কিট কোর্টের দ্বিতীয় জজ ডাবলিউ ক্রক্রফট্ তাঁর আচরণকে সমর্থন জানান। রামকিশোরের আত্মীয়রা বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, বিষয়টি সম্পর্কে নিজামতের পণ্ডিতদের মতামত চাওয়া হয়। পণ্ডিতরা জানান, সাঁই শূদ্র—হিন্দুদের প্রধান ৪ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই এক্ষেত্রে মেয়েটি সতী হতে পারে। সিদ্ধান্ত মিঃ মরিসনকে জানানো হয়। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আবার লেখালিখি শুরু করেন, তাঁকে মদত দিতে থাকেন মিঃ ক্রক্রফট্। ইতিমধ্যে মেয়েটি অবশ্য তার সতী হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে নিজেদের অধিকারসীমা লঙ্ঘন করায় মিঃ মরিসন ও মিঃ ক্রক্রফট্ ভৎর্সিত ও সতর্কিত হন।[৮]

ব্রাহ্মণ অথবা বাগদী, কায়স্থ অথবা কৈবর্ত—যে জাতের মেয়েই সতী হোক না কেন, তারা তো শুধু সতীই নয়, তাদের আর একটি পরিচয়—তারা মা। কিন্তু কেমন মা?

৪। 'সতী' তুমি—'মাতা' নহ?

যশোরের এক থানায় দারোগাবাবুর কাছে খবর এসে পৌছয় যে, তাঁর এলাকায় এক বৃদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রী সহমৃতা হতে চলেছেন। দারোগাবাবু নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন, স্বেচ্ছায় তিনি সতী হচ্ছেন। গর্বের সঙ্গে মহিলাটি তাঁকে জানান, এবারই তাঁর প্রথম সতী হওয়া নয়, পূর্বের ৬ জন্মেও তিনি সতী হয়েছেন, এবং এবারও ভাগ্যবলে তা হতে চলেছেন।

চিতা প্রস্তুত। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চিতার দিকে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু কে যেন পিছু ডাকছে 'মা-মা' বলে—গলার স্বর কান্নায় বিকৃত। মা জেগে উঠলেন, কে, কে আমায় এমন করে পিছু ডাকে? চোখ ফেরালেন তিনি! দেখলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের—জলে ভরা চোখ, চোখের তারায় কী আকুতি। মা তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না! মহিলাটির হঠাৎ মনে হল, 'সত্যিই তো, আমি যদি সতী হই, তাহলে এদের দেখবে কে? স্ত্রীর কর্তব্যের চেয়ে মার কর্তব্য তো কম নয়।' সঙ্কল্প পালটালেন তিনি। কোলে টেনে নিলেন আত্মজদের। তাদের ছেড়ে কোথাও যেতে, কিছু করতে অস্বীকার করলেন। মায়ের কোলে ছেলে—দুজনেরই মুখে হাসি, চোখে জল—দেবী হতে তিনি আর চান না। মা হয়েই থাকবেন।[১]

যশোরের এই নাম-না-জানা মা সন্তানের টানে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশই ফিরে আসত না। কারণ সতী যারা হত, তাদের বেশির-ভাগই এক বা একাধিক সন্তানের জননী। তিনদিনের ছেলের মা থেকে ৮০ বছরের ছেলের মা পর্যন্ত সবাই অম্লানমুখে চিতায় উঠত। দুধের ছেলের দিকে না তাকিয়ে মা চিতায় গিয়ে উঠলে, শিশুটিও অযত্নে অবহেলায় অনেকসময় অকালমৃত্যুর শিকার হত। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সতী সম্পর্কে প্রচারিত সরকারি বিধিনিষেধের অন্যতম এইকারণে ছিল শিশুসন্তানের জননীর সতী হওয়া সম্পর্কিত।

নির্দেশ জারি করা হল, কিন্তু ঠিক ক'বছরের শিশুসন্তান থাকলে এই নির্দেশ কার্যকরী হবে, সরকারি ঘোষণায় তা রইল অনুল্লেখিত।[১] এই নির্দেশজারির পর সরকারি ঘোষণামতো নিষ্ঠাভরে যারা কর্তব্যপালন করতে চাইল, তাদের ভাগ্যে জুটল সরকারি সতর্কবাণী। বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার দারোগা বাবুর কথাই ধরা যাক।

খণ্ডঘোষের অছুব সিং মারা যাবার পর তার স্ত্রী সহমরণের সঙ্কল্প ঘোষণা করলে যথারীতি স্থানীয় দারোগা তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন, অছুবের ছোট ছেলেটির বয়স মাত্র আড়াই বছর হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী চলেছে সতী হতে। দারোগা মেয়েটিকে সতী হবার অনুমতি তো দিলেনই না, উপরন্তু সে যাতে কোনোক্রমেই সতী হতে না পারে, তারজন্য সেখানে দুজন হিন্দু বরকন্দাজ মোতায়েন করলেন। দারোগার কথা না শুনে এবং বরকন্দাজদের নিষেধ না মেনে মেয়েটি তার আত্মীয়স্বজন ও সমবেত অন্যান্য দর্শকদের সাহায্যে চিতারোহণ করে সতী হয়। যারা বরকন্দাজ দুজনকে বাধা দিয়েছিল এবং মহিলাটির সতী হবার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, তার মধ্যে ১০ জন পালের গোদাকে ম্যাজিস্ট্রেট আটক করেন। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ডাবলিউ. বি. বেলি ২৮.১০. ১৮১৩-তে নিজামৎ আদালতের কাছে জানতে চান, অভিযুক্তদের কি তিনি সার্কিট কোর্টে বিচারের জন্য চালান দেবেন, নাকি তিনি নিজেই তাদের শাস্তিবিধান করবেন? এইসঙ্গে তিনি আরো জানতে চান, কোনো মেয়ের ঠিক ক'বছরের শিশুসন্তান থাকলে তার সতী হবার বিরুদ্ধে আইনসম্মত আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে।[২] ৯. ১২. ১৮১৩-তে নিজামৎ আদালতের তরফ থেকে মিঃ বেলিকে জানানো হল, ২৯ ৪. ১৮১৩-তে যে সার্কুলার প্রচারিত হয়, তার দ্বারা তাঁকে শিশুসন্তান আছে এই অজুহাতে কাউকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার দেওয়া হয় নি। তাই তিনি যেন তাঁর পুলিশ অফিসারদের এরকমক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার জন্য কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেন।[৩]

বেলি সাহেব কিন্তু এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে ১৮. ১২. ১৮১৩-তে নিজামৎ আদালতে একটি চিঠি লিখে এক্ষেত্রে নিজের ও পুলিশের আচরণের যৌক্তিকতা সমর্থন করে জানালেন, অন্তত ৪টি ক্ষেত্রে কোলের ছেলে থাকার দরুণ তিনি সতী হতে দেননি। খণ্ডঘোষের সতী ঘটনাটি সম্পর্কে যাদের তিনি ধরেছিলেন, তাদের জামিনে মুক্তি দিলেও দারোগাদের হুঁশিয়ার করে দিতে অস্বীকার করে শিশু-

সন্তানের মার সতী হওয়া সম্পর্কিত বিধিনিষেধের আরও বিস্তৃত ও স্পষ্ট বিশ্লেষণ চান।[৪]

সরকার অগত্যা বিষয়টি নিয়ে নিজামৎ আদালতের শরণাপন্ন হলেন। অল্পদিনের মধ্যে নিজামৎ সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বললেন, যে মায়েদের ৩ বছরের কমবয়সী শিশুসন্তান আছে এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া যেসব বাচ্চার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তাদের মায়ের সতী হওয়া চলবে না। ১৮১৫-তে এ-বিষয়ক এক সরকারি আদেশে বলা হল, যাদের ৩ বছরের কমবয়সী শিশুসন্তান আছে, তাদের শিশুসন্তানকে ভরণপোষণের দায়িত্ব যদি কেউ নেয়, তবেই সে সতী হতে পারবে। দায়িত্ব নেব—মুখে এ কথা বললেই হবে না, স্ট্যাম্প কাগজে রীতিমতো তা লিখে দিতে হবে। এ বিষয়ক 'ফর্ম অব এনগেজমেন্ট' কেমন হবে, তারও নমুনা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে পাঠানো হয়।

এরপর শিশুসন্তানকে রেখে যারা সতী হত, তাদের আত্মীয়দের কেউ না কেউ রীতিসম্মতভাবে শিশুর দায়িত্ব নিত—পুলিশ রিপোর্ট থেকে তা দেখা যায়।

অবশ্য এরপরেও কোলের ছেলে রেখে অনেকেই বিধিনিষেধের ধার না ধেরে সতী হত। যেমনটি হয়েছিল গাজিপুরের কামালপুর থানার ভাগীরথী।

গর্ভবতী থাকার জন্য ভাগীরথী তার স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে পারে নি। স্বামী মারা যাবার মাস তিনেক বাদে একটি সন্তান প্রসব করার ৩ দিন পরেই সে গিয়ে সতী হয়। ছেলেমেয়ে তার ৩টি। বড়টি ৮ বছরের, মেজোটি ৫ বছরের, কোলেরটি ৩ দিনের। অবতার দাস নামে তার এক আত্মীয় তাকে সতী হতে সাহায্য করায়, তার ওপর কোর্ট থেকে সমনজারি করা হয়। অবশ্য ১০০ টাকা জামিনে সে ছাড়া পায়। ভাগীরথীর ভাই-বউ বণ্ডে সই করে তার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়। জানি না, ভাগীরথী কেমন মা, সতী হবার উত্তেজনায় ৩ দিনের শিশুসন্তানের মুখ পর্যন্ত সে চায়নি। ভাগীরথীর মতো মা কম হলেও বিরল নয়। ২৬. ৬. ১৮২৪-এ কটক বিভাগের তাহেজপুরে সুদেবী নামে ৩০ বছরের জনৈক মহিলা তার ২১ দিনের শিশু সন্তানকে রেখে সতী হয়। ২/৪ মাসের বাচ্চাকে রেখে অনেক মা-ই সতী হত। এইসব দুধের শিশুকে রেখে যেসব মা সতী হত, তাদের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যাটাও কম মানবিক ছিল না। অনেকক্ষেত্রে মা সতী হবার পর, দুধের ছেলে অযত্নে অবহেলায় মারা পর্যন্ত যেত। ১৮২২-এ গোরক্ষপুর জেলার পরোয়ানা থানায় এ ধরনের একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

সুনা নামে বছর পঁচিশের এক ব্রাহ্মণী ৬ মাসের এক সন্তানকে রেখে ৮. ৬. ১৮২২-এ সতী হয়। মা সতী হবার অল্পদিনের মধ্যে মা-হারা ছেলেটি অযত্নে-অনাহারে মারা যায়। সুনার সতী হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করে কোর্ট অব সার্কিটে চালান দেওয়া হয়। লোকটি অবশ্য বিচার শেষ হবার আগে জেলখানাতেই মারা যায়।[৫] গোরক্ষপুরে এক মা তার ৫/৬ বছরের ছেলের ভার কোনো আত্মীয় নিতে না চাওয়ায়, ছেলেটিকে কোলে নিয়ে জলন্ত চিতায় পুড়ে মরে বলে বুকানন হামিলটন জানিয়েছেন। আমাদের কাছে ঘটনাটি অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। গর্ভবতী মহিলারাও অনেকসময় অনাগত সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ না দিয়ে চিতায় গিয়ে উঠতেন। গাজিপুরে ২৫. ৬. ১৮২২-এ মুনিয়া নামে ২ মাসের গর্ভবতী একটি মেয়ে সতী হয়। সংশ্লিষ্ট থানার দারোগাকে এজন্য ১২ টাকা ও জমাদারকে ৩ টাকা জরিমানা করা হয়। নিজামতের মতে এটা গুরুপাপে নিতান্তই লঘুদণ্ড।[৬]

যেসব মেয়ে সতী হত, তাদের অধিকাংশই যে মা তা বলে এসেছি। ১৮১৫-তে বর্ধমানে যে ৫০ জন সতী হয়, তার মধ্যে ২৯ জনই সন্তানবতী। এদের সন্তান সংখ্যা ১ থেকে ৭-এর মধ্যে। এই ২৯ জনের মোট সন্তানসংখ্যা ৯৮। ১৮২২-এ কলকাতার শহরতলীতে যে ৪৩ জন সতী হয়, তারমধ্যে মাত্র ৯ জন নিঃসন্তান। বাকি সকলেই এক বা একাধিক সন্তানের জননী। এদেরও সন্তানসংখ্যা ১ থেকে ৭-এর মধ্যে। ৭টি সন্তান ১ জনের, ৬টি ৪ জনের, ৫টি ২ জনের, ৪টি ৬ জনের, ৩টি ৬ জনের, ২টি ৯ জনের, ১টি ৬ জনের। এইসব সন্তানদের বয়স ৮ মাস থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

সতী-মায়েদের শিশুসন্তানদের করুণ অবস্থার দিকে মিঃ পয়েণ্ডার ১৮২৭-এর মার্চে ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার সময় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮১৫-২৩—এই ৯ বছরে বাংলায় মোট ৫,৪২৫ জন সতী হয়, এবং সেইসঙ্গে ৫,১২৮ জন * হয় মাতৃহীন।[৭] এদের অনেকে যে নিতান্ত অসহায় দুগ্ধপোষ্য তা সহজেই অনুমেয়। মা সতী হবার পর অসহায় শিশু-সন্তানদের করুণ অবস্থাটা 'দি ইনফ্যাণ্ট মোরনার' কবিতায় সুন্দর ফুটে উঠেছে। কবিতাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করছি :

'Upon a woody bank I roamed at eve
Close to the Ganges gliding stilly on,

* যেসব ক্ষেত্রে পুলিশি রিটার্নে সন্তানসংখ্যা অনুল্লেখিত, সেখানে সন্তানসংখ্যা ১ ধরে নিয়ে।

And through a glade the Sun's last beams I saw
As O'er the golden tide their rediance stream'd.
... ...
I heard a fitful cry of infant wail
Tremulous floting on the breese of eve,
And paus'd to listen—when words I caught,
"Mother ! Mother ! O my dearest Mother !"
I hurri'd onward on the sandy waste
That edg'd the water. On the ground there sat
Near a heap of ashes smouldering drear
Weary and desolate, a little child.
One tiny hand a drooping flow'r held fast
(Emblem most meet of that unhappy child)
The other wip'd a way the scalding tears
That from her dim black orbs came rolling down
As on that ashy heap she gaz'd intent
Repeating still her cry of infant wail,
"Mother ! Mother ! O my dearest mother !"[৮]

অনুষ্ঠানশেষে সবাই ঘরে ফিরে গেছে ; কিন্তু শিশুটি তখনও সেই পরিত্যক্ত শ্মশানভূমিতে মায়ের জন্য বসে 'মা, তুমি ফিরে এসো, মা—মা !'

কিন্তু তাই বলে কি একথা ধরে নেব, যেসব মায়েরা সতী হতেন, তাঁদের সন্তানস্নেহ ছিল না। সন্তানস্নেহ মাকে জ্বলন্ত চিতার সামনে থেকে ফিরিয়ে এনেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ১৮১৫-তে পদ্মা নামে একটি স্ত্রীলোক তাঁর ১০ বছরের মেয়ের টানে স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতার সামনে থেকে ঘরে ফিরে আসেন। ১৮১৬-তে মহামায়া নামে একটি মেয়ে তাঁর ৫ বছরের একমাত্র মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সতী হবার সঙ্কল্প করেও পেছিয়ে আসেন।[৯]

কিন্তু সেই মাকে কি আমরা ভুলতে পারি—সতী হবার সময় যিনি ভুলেও একবার ছেলেদের মুখপানে তাকান নি, পাছে সন্তানস্নেহ তাঁকে সতী হতে না দেয়। ঘটনাটি পুনার। এক প্রত্যক্ষদর্শী সাহেব তা বর্ণনা করেছেন।

নদীতীরে পৌঁছে তিনি দেখেন, বছর ৪০ বয়সের গরিব ঘরের একটি মেয়েছেলে বাড়িতে কাচা শাদা কাপড় পরে নদীতীরে বসে, কয়েক-গজ দূরেই হলুদ ফুলে-ফুলে ঢাকা তাঁর বৃদ্ধ স্বামীর শব একটি খাটিয়ায় শোয়ানো। মেয়েটির মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল থেকে উৎফুল্ল

মুখেই তিনি বেশ কথাবার্তা বলছিলেন। মহিলাটির দুই ছেলেকে নিয়ে তাঁর বোন একপাশে দাঁড়িয়ে। ছেলে দুজনের বয়স ৫ আর ৭—ব্যাপারটা যে কি ঘটতে যাচ্ছে, তা তাদের মাথাতেই ঢুকছিল না। তাদের মাসিকেও অবিচলিত মনে হল, সে একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে আর একজনের হাত ধরে বোনের কাছেই দাঁড়িয়েছিল ; কিন্তু তারা যে পরস্পরকে চেনে এমন কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। বিধবাটি তাঁর ছেলেদের লক্ষ্য করলেও, গ্রাহ্য করেন নি। চিতা প্রস্তুত হলে তিনি উঠে দৃঢ় পদক্ষেপে চিতার পানে গেলেন। নদীতীরে ও সেখানে যথারীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করলেন। চিতায় ওঠার আগে চারিদিকে চেয়ে সাহেবকে, ব্রাহ্মণদের ও সমবেত অন্যান্য দর্শকদের অভিবাদন জানালেন—কিন্তু তখনও তিনি নিজের বোন বা সন্তানদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এসময়ও তাঁর মুখভাব ও আচরণ সম্পূর্ণ অবিচলিত। চিতায় উঠে শান্তভাবে শবের বাঁপাশে আসন গ্রহণ করে, নিজেই তাতে আগুন ধরিয়ে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে আগুনে নিজেকে সমর্পণ করলেন। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে—মা পুড়ছে, ছেলে দাঁড়িয়ে দেখছে।[১০]

মহিলাটির কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা অপরিসীম বলে বর্ণনাদাতা সাহেব মন্তব্য করেছেন। দৈহিক কষ্ট পুনার মহিলাটির মতো অনেক সতীই অবিচলিত মুখে সহ্য করত। কিন্তু মহিলাটির মানসিক শক্তি এককথায় অতুলনীয়। পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছেন তিনি, সন্তানদের আর কখনও দেখতে পাবেন না। তবু তিনি তাদের পানে চাইছেন না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছু তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু পাছে ছেলেদের চোখে চোখ পড়লে বুক কেঁপে ওঠে, হৃদয় ভরে ওঠে স্নেহে—তাই তিনি তাদের দিকে চাইছেন না, জোর করে অন্যদিকে চেয়ে আছেন, অন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন হেসে হেসে। কিন্তু বুক যে তাঁর ফেটে যাচ্ছে, হৃদয় উঠছে রক্তাক্ত হয়ে, তবু তিনি অভিনয় করে যাচ্ছেন স্বাভাবিক থাকার। ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত, পাছে শেষ মুহূর্তে তাঁর অভিনয় ভেঙে যায় চোখের জলে। মা যে তিনি।

কিন্তু যেসব মেয়েরা সতী হত, তারা তো সবাই মা নয়। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, সতী যারা হত, জীবনকে তারা কতটুকু দেখেছিল—বা কোন বয়সের মেয়েদের মধ্যে সতী হবার প্রবণতা ছিল বেশি ?

৫। সতী—তোমার বয়স কত ?

বরানগরের গঙ্গার ধাবে একটি পালকি এসে থামল। তা থেকে নামলেন একজন অতিবৃদ্ধা। নামলেন বললে ভুল হবে, তাঁকে ধরে নামান হল। মাথার চুল ধবধবে শাদা। বয়সের ভাবে নুয়ে পড়েছেন, চলতে ফিরতেও পারেন না। তাঁর স্বামী কামারহাটির কৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায় দেহ রেখেছেন খবর পেয়েই, তিনি পালকি চেপে চলে এসেছেন সতী হতে। মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া জীবনে আর কিছুই যখন অবশিষ্ট নেই, তখন লোকেব শেষ শ্রদ্ধা কুড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চান তিনি। ঘটনাটা সেপ্টেম্বর, ১৮০৭-এর।

প্রস্তুত চিতায় মৃত স্বামীর একপাশে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে —অন্যপাশে তাঁর আর দুই সতীন। চিতার লেলিহান শিখা বৃদ্ধাকে যখন গ্রাস করছে—মুখে তখনও তাঁর শেষবিদায়ের আলো।[১]

কৃষ্ণদেবের স্ত্রী-ই শুধু নয়, শতাধিক বছরের বৃদ্ধারাও সতী হতেন একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে ধবে নেন না নিই, সতী হতেন শুধু বৃদ্ধারাই। জীবন যার আরম্ভই হয় নি, ধুলোখেলা করার বয়সও যার পার হয় নি, এমন মেয়েও গিয়ে সতী হত। আর এ ধরনেব একটি ঘটনা ১৮০৪-এ দমদমের কাছে আলোতে ঘটেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমদিকেও বাঙালিসমাজে গৌরীদান অতি পুণ্যকর্ম। ১০ বছর বয়স হতে না হতেই বেশিরভাগ মেয়ের সিঁথি হয়ে উঠত রাঙা টুকটুকে। বিয়ে জিনিসটা কি. ঠিক না বুঝলেও, তারা জানত মাথায় সিঁদুর দিতে হয়, পায়ে পরতে হয় আলতা, আর বরকে করতে হয় ভক্তিশ্রদ্ধা। হরিহর নামে এক ব্রাহ্মণ এরকমই একটি বালিকাবধূ পেয়েছিল। বিয়ের সময় হরিহরের বউ ক'বছরের ছিল জানি না, কিন্তু সে যখন মারা যায়, তার বউ-এর বয়স তখন ৮।

হরিহরের মৃত্যুসংবাদ যখন দমদমে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছয়, তার বউ তখন পাড়ার অন্যমেয়েদের সঙ্গে খেলায় মত্ত। খানিক আগেই তার খুড়ি তাকে কষে

ঠেঙিয়েছে, গালমন্দও করেছে। চোখদুটো তাই তার ফোলা-ফোলা; চোখের কোলে চিকচিকে জল। খবর পাওয়ামাত্র সে সঙ্কল্প করে বসল, সে সতী হবে। রোজরোজ খুড়ির মুখঝামটা খাওয়ার চেয়ে আগুনে পুড়ে মরা ভালো। তার আত্মীয়স্বজন তো অবাক—এইটুকু মেয়ে, তুই সতী হবি কিরে! অনুনয়-বিনয় কিছুতেই কর্ণপাত করল না সে। এক কথা তার—'আমি সতী হব।' ৮ বছরের মেয়ে, কিন্তু কি তার জেদ। সতী সে হবেই, হলও তাই।[২]

এ মেয়েটির তবু তো ৮ বছর বয়স। ৪, ৫, ৬ বছরের মেয়ে সতী হয়েছে—এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ১০/১২ বছরের মেয়েরা তো হুদোহুদো সতী হত। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সতী হবার অনুমতি দিতেন না। ১৭৯৭-এ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস র‍্যাট্রে কমলি নামে ৯ বছরের একটি মেয়েকে সতী হবার অনুমতি দেন নি। কাউন্সিল তাঁর আচরণ সমর্থন করে। ১৮০৫-এ বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এলফিনস্টোন ১২ বছরের একটি মেয়েকে সতী হবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন; এবং বলতে গেলে তাঁর লেখালেখির ফলেই ওয়েলেসলি এদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হন। নিজামৎ আদালতের কাছে জানতে চাওয়া হয়, সতী কতদূর শাস্ত্রসম্মত, একে নিষিদ্ধ করা সম্ভব কিনা? শেষপর্যন্ত লর্ড মিণ্টোর আমলে ১৮১৩-তে সতীর ওপর যে সমস্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়, তাতে ১৬ বছরের কমবয়সী মেয়েরা সতী হতে পারবে না বলে উল্লিখিত হয়। এই বিধিনিষেধ জারি হবার পর ১৬ বছরের কমবয়সী মেয়েদের সতী হবার অনুমতি দেওয়া হত না—এমনকি সতী হবার জন্য শহরত্যাগের অনুমতি পর্যন্ত না। ১৮১৯-এ মিঃ ব্লাকিয়ার ও উইলিয়ম মুর—কলকাতার এই দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট সতী হতে ইচ্ছুক একটি ১৬ বছরের কমবয়সী মেয়েকে ঐ উদ্দেশ্যে শহরত্যাগের অনুমতি দেন নি। সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ বেলি তাঁদের এ কাজকে অনুমোদন করেন।[৩] অবশ্য সরকারি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে এরপরেও ১৬ বছরের কমবয়সী কম মেয়ে সতী হয়নি।

১৮১৫ থেকে ১৮২০—এই ৬ বছরে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে যে ৩৬১৩ জন মেয়ে সতী হয়, তারমধ্যে ৪৭ জনের বয়স ১৬ বছর বা তার নীচে। এই ৪৭ জনের মধ্যে:

২২	জনের	বয়স	১৬
৬	জনের	বয়স	১৫

২	জনের	বয়স	১৪
২	জনের	বয়স	১৩
১০	জনের	বয়স	১২
১	জনের	বয়স	১০
৩	জনের	বয়স	৮
১	জনের	বয়স	৪।[৪]

এছাড়া বয়স ভাঁড়ানোর ব্যাপার তো ছিলই। ১৪ বছরের মেয়েকে ১৬ বছরের বলে চালালে ধরার সাধ্যি কার।

এটা ঠিক, শতাধিক বছরের মহিলার সতী হওয়ার মতোই বিরল ছিল ৬/৮ বছরের মেয়ের সতী হওয়া। মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, কোন বয়সের মেয়েরা বেশি সতী হত। তাই চট করে সতীদের বয়সের গড় হিসাবের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। তার আগে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, বয়স্কা নারীদের মধ্যেই সতী হবার প্রবণতা ছিল বেশি। কেন, সে প্রশ্নে পরে আসব।

সরকারি নির্দেশানুযায়ী ১৮১৫ থেকে পুলিশ-দারোগাদের প্রত্যেকটি সতীর নাম-ধাম-বয়স ইত্যাদির বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেটদের জানাতে হত। ম্যাজিস্ট্রেটরা আবার তাঁদের জেলার সতীর বাৎসরিক বিবরণ দাখিল করতেন নিজামৎ আদালতের কাছে। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত সতীর বাৎসরিক যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে এই ১৪ বছরের মধ্যে ১৮১৮-তেই সতী ঘটনা ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি। এই বছর বাংলায় যে ৮৩৯ জন মেয়ে সতী হয় তার মধ্যে :

২ জনেব	বয়স	১০০ বা তার বেশি,
৮ জনের	বয়স	৯০ বা তার বেশি,
৪৪ জনের	বয়স	৮০ বা তার বেশি,
৬৯ জনের	বয়স	৭০ বা তার বেশি,
১৪৯ জনের	বয়স	৬০ বা তার বেশি,
১২৬ জনের	বয়স	৫০ বা তার বেশি,
১৫৩ জনের	বয়স	৪০ বা তার বেশি,
১২৭ জনের	বয়স	৩০ বা তার বেশি,
১২২ জনের	বয়স	২০ বা তার বেশি,
৪৯ জনের	বয়স	২০-র নীচে।[৫]

দেখতে পাচ্ছি, ৮৩৯ জনের মধ্যে মাত্র ৫৪ জন মহিলার বয়স ৮০ বা তারবেশি—এদের অতিবৃদ্ধা বলা চলে। অন্যদিকে ১৭১ জনকে পাচ্ছি, যাদের

বয়স ৩০-এর নীচে—যুবতী বা কিশোরী এরা। মোটামুটি হিসাবে ১৮১৮-য় যে ৮৩৯ জন মেয়ে সতী হয়, তাদের মধ্যে ২২৫ জনকে বাদ দিলে বাকি ৬১৪ জন বা শতকরা ৭৩ জনের কিছু বেশি সতীই প্রান্ত যৌবনা, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা—এদের বয়স ৩০ থেকে ৭৯-র মধ্যে। দেখাই যাচ্ছে, মাঝবয়সী মেয়েদের মধ্যেই সতী হবার প্রবণতাটা একটু বেশি। ফোর্ট উইলিয়মের বিস্তৃত সীমানা ছেড়ে একটি নির্দিষ্ট জেলার দিকে চোখ ফেরাই।

পুণ্যক্ষেত্র কাশী। ধর্মভীরু হিন্দুদের বিশ্বাস এখানে দেহত্যাগ করলেই মুক্তি। যেসব মেয়েরা সতী হত, তাদের কাছে কাশীধামের বাড়তি আকর্ষণ তাই প্রবল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা বিভাগের পরই বেনারস বিভাগে সবচেয়ে বেশি মেয়ে সতী হত (১৮১৫-২৮-এই ১২ বছরে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে যে ৭,১৫৪ জন সতী হয়, তারমধ্যে কলকাতা বিভাগে (কটক কমিশনকে ধরে) সতীর সংখ্যা ৪৪৭৪, বেনারস বিভাগে ১০৭১, ঢাকা বিভাগে ৬১৪, পাটনা বিভাগে ৫৭৯, মুর্শিদাবাদ বিভাগে ২৪১ ও বেরিলি বিভাগে ১৭৫)।

প্রতিবছরই বেনারস শহরের সীমানার মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়ে সতী হত, আবার প্রায় প্রতিবছরই দু'চারজন পুলিশি তৎপরতায় রক্ষাও পেত। এই বেনারস শহরেও যেসব মেয়ে সতী হত, তাদের মধ্যে মাঝবয়সী মেয়েরাই দলে ভারী। ১৮২০ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে কাশীতে যারা সতী হয়েছিল, তাদের গড় বয়সের দিকে একবার তাকানো যাক :

	অনুমতিপ্রাপ্ত সতীর সংখ্যা	নিবৃত্ত সতীর সংখ্যা	সতীদের গড় বয়স	সবচেয়ে বয়স্কা সতী	সর্বকনিষ্ঠ সতী
১৮২০	১১	৩	৪৪	৭০	২০
১৮২১	১২	×	৫৫	৮৫	২০
১৮২২	১০	৪	৪৯	৮০	৩৮
১৮২৩	১৮	২	৫৬	৮৫	২২
১৮২৪	১৩	২	৫১	৮০	২৪
১৮২৫	১৭	৫	৪৪	৩১	২৫।

কাশী, গয়া অনেকদূর। বাংলার কবি লিখেছেন, তাঁর মায়ের পায়ের তলায় পড়ে আছে গয়া, গঙ্গা, বারানসী। আমাদের কাছে এই মায়ের নাম কলকাতা। কলির তীর্থ কলকাতা। নবচেতনার পীঠস্থান। মানি, সেখানে বাবু আর বাইজির ভিড়, হঠাৎ নবাব প্যালারাম বাবুদের রাজত্ব, দুর্গাপুজোর সাহেব-

আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত ভোঁতা বড়মানুষরা মধ্যযুগীয় উল্লাসে প্রমত্ত। অন্যদিকে আবার এই শহরই বাঙালির ঘুম ভাঙিয়েছে, কানে কানে বলেছে, ওঠো, জাগো —ভোর হয়েছে।

কিন্তু শুধু কলকাতাকে নিয়েই তো বাংলা নয়। তবু তখনকার দিনে বিরাট অঞ্চলকে নিয়েই কলকাতা বিভাগ। বর্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গলমহল, যশোর, নদীয়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, বারাসত আর কলকাতার শহরতলী —এই ৯টি অঞ্চল তাব অন্তর্ভুক্ত। উনিশ শতকের প্রথমদিকে অনেকদিন পর্যন্ত উড়িষ্যাও এই বিভাগে বর্তমান। কলকাতা বিভাগের অন্য কি গুণ ছিল জানি না, তবে এখানকার মেয়েদের মধ্যে সতী-সংস্কার ছিল প্রবল। গোটা ব্রিটিশ-ভারতে সারা বছরে যত মেয়ে সতী হত, তার অর্ধেকের বেশি এই অঞ্চলের মেয়ে। এই ৯টি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সতী হত কলকাতার আশপাশের জেলাগুলো —হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণা আর কলকাতার শহরতলীতে।

কোনো-কোনো অঞ্চলের কোনো-কোনো জায়গা আবার সতীস্থান হিসাবে খ্যাত ছিল। ২৪ পরগণার আড়িয়াদহ ও নৈহাটি, বর্ধমানের কালনা-কাটোয়া, জঙ্গলমহলের বিষ্ণুপুর, নদীয়ার শান্তিপুর, অগ্রদ্বীপ, সুখসাগর, হুগলির বৈদ্যবাটি, হরিপাল ও বাঁশবেড়িয়া, হাওড়ার সালকে, কলকাতার চিৎপুর আর তৌজিরহাট—এইসব জায়গায় প্রায়ই সতীর চিতা জ্বলতে দেখা যেত। এইসূত্রেই একটি প্রশ্ন মনে আসে, কলকাতার আশপাশের অঞ্চলে সতীপ্রথার এত চল হল কেন?

প্রশ্নটা নিয়ে অনেকেই চিন্তাভাবনা করেছেন। হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওকালি সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা অঞ্চলে সতীর প্রাদুর্ভাবের পেছনে কালী-উপাসনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।[৭] তাঁর মত গ্রহণ করা শক্ত। কারণ তন্ত্রে সতীপ্রথা সমর্থিত নয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে এর বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, যে স্ত্রী ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সহমরণে যায়, সে নরকে গমন করে।[৮] কেউ আবার অনুমান করেছেন, স্মার্তরাজ রঘুনন্দন এর উচ্চমহিমা কীর্তন করে একে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলেছেন, তাই অন্য দেশের চেয়ে বাঙালির কাছে এ প্রথার এত আদর।[৯] রঘুনন্দন আদৌ এর কথা বলেছেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। যদি বলেও থাকেন, তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলার 'আদরের' এই প্রথাটির চল বাংলার সর্বত্র নেই কেন? কেন পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট ইত্যাদি

অঞ্চলের মেয়েরা সতী হত না (দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা মনে রেখেই বলছি), কেনই বা মুর্শিদাবাদ, মালদা ইত্যাদি অঞ্চলে এ প্রথার চল থাকলেও সারা বছরে দু'চারজনের বেশি সতী হতে এগিয়ে আসত না ? হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া—এই স্থানগুলি নদীতীরবর্তী হওয়ার দরুন এইসব অঞ্চলে সতীপ্রথার এত আধিক্য—এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে (গঙ্গার পূর্বতীরের চেয়ে পশ্চিমতীর বেশি পবিত্র বলে বিবেচিত হত) শেষ নিঃশ্বাস ফেলার বাসনা নিয়ে অনেক মুমূর্ষু ব্যক্তি মেদিনীপুর, জঙ্গল মহল, বর্ধমানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে হুগলিতে আসত, সঙ্গে আসত তাদের স্ত্রী। স্বামীর দেহাবসানের পর অনেকসময়ই তারা সহমরণে যেত। হুগলিতে সতীর সংখ্যাধিক্যের এটাও একটা কারণ। গঙ্গাতীরে শেষকৃত্য করার জন্য অনেকে দূর থেকে শবদেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে আসত—অনেকসময় সঙ্গে আসত সহমরণে ইচ্ছুক কোনো রমণী। সে কারণে যশোরের সতী হতে ইচ্ছুক অনেক মেয়েকেই গঙ্গাতীরবর্তী নদীয়ার চাকদা, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে নিয়ে আসা হত—জঙ্গল-মহলের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রাসেলের বিবৃতি থেকে এ তথ্য আমরা জানতে পারি।[১০] কৌলীন্যপ্রথার ব্যাপক প্রভাবের জন্য এ অঞ্চলে সতীপ্রথার কতটা প্রসার ঘটেছিল—তা হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ ৫. ২. ১৮২৯-এ সরকারের কাছে প্রদত্ত বিবরণীতে তথ্যসহযোগে দেখান। হুগলি, বর্ধমান ও নদীয়া—এই ৩টি জেলায় ৪,৫০০০০ ব্রাহ্মণ ও ৩,০০০০০ কায়স্থ পরিবারের বাস। এদের মধ্যে ১,২০০০০ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ৬০,০০০ কুলীন কায়স্থ। কৌলীন্যপ্রথা এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এইসব কুলীন ব্রাহ্মণদের কারোকারো ১০০টি পর্যন্ত স্ত্রী আছে, ৪/৫টির কম কারোরই নেই। এইসব কুলীনদের কারো মৃত্যু হলে তার বহুপত্নীর মধ্যে কেউ না কেউ সতী হতই, ক্ষেত্রবিশেষে ৪ জন বা তারও বেশি পুড়ে মরত।[১১] কৌলীন্যপ্রথা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব, গঙ্গা ও হিন্দুদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত অন্যান্য নদীর (যেমন সরস্বতী, দামোদর, শিলাই ইত্যাদি) অবস্থিতি—এইসব নানাকারণে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সতীপ্রথার এত আধিক্য।

সতী সর্বভারতীয় প্রথা নয়, অঞ্চলবিশেষে তা সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণেই ভারতের অনেক অঞ্চলেই এ প্রথা একরকম অপরিচিত। পশ্চিম ভারতের কথাই ধরা যাক। এখানে সতীর সংখ্যা এমনিতেই অনেক কম, দক্ষিণ কোঙ্কনকে বাদ দিলে বোম্বায়ের অন্যত্র এ প্রথার অস্তিত্ব নামমাত্র। ১৮২৪-২৭

এই ৪ বছরে বোম্বাই প্রদেশে যে ১৫৮টি মেয়ে সতী হয়, তারমধ্যে ১১৪ জনই দক্ষিণ কোঙ্কনে। বোম্বায়ের বাকি ৯টি জেলায় এই ৪ বছরে মোট ৪৪ জন সতী হয়—অর্থাৎ গড়ে জেলাপ্রতি বছরে একজনেরও কম। ১৮২৪-২৭-এই ৪ বছরে বোম্বায়ের ১০টি জেলার সতী সংখ্যাটা এক নজরে দেখে নি :

সুরাট	১
কয়রা	১
ব্রোচ	×
আমেদাবাদ	×
ক্যাণ্ডিশ	১০
পুনা	১১
আহমেদনগর	১
ধারওয়ার	১৭
উত্তর কোঙ্কন	৩
দক্ষিণ কোঙ্কন	১১৪।[১২]

উত্তর কোঙ্কন আর দক্ষিণ কোঙ্কন পাশাপাশি জেলা। কিন্তু সামাজিক ধারণার মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য। তাই দক্ষিণ কোঙ্কনে যখন একের পর এক মেয়ে গিয়ে স্বামীর চিতায় উঠেছে, উত্তর কোঙ্কনে দীর্ঘ ৪ বছরে তখন মাত্র ৩টি মেয়ে এগিয়ে এসেছে সতী হতে।

অনুরূপ চিত্র বেনারস বিভাগের পাশাপাশি দুই জেলা গাজিপুর আর জৌনপুরের। গাজিপুরে প্রতিবছরই সতী হত বেশ কিছু মেয়ে ; অথচ পার্শ্ববর্তী জেলা জৌনপুরে তা একরকম অপ্রচলিত। তাই ১৮২৩-২৬—এই ৪ বছরে গাজিপুরে যেখানে ১৩২ জন সতী হয়েছে, সেখানে জৌনপুরে হয়েছে মাত্র ৫ জন। আসলে সংস্কার, সংস্কারই সব। সংস্কারের বশেই কোথাও মেয়েরা স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছে, কোথাও অন্য পুরুষের গলায় মালা পরিয়েছে। অঞ্চলবিশেষে সতী-সংস্কার গড়ে ওঠার পেছনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ভারতের যেসব অঞ্চলে মুসলমান প্রভাব বেশি (যেমন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বেরিলি) সেখানে এ প্রথার প্রচলন তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। পক্ষান্তরে যেসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্য (যেমন হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া বেনারস) সেখানেই সতীপ্রথার প্রচলন বেশি—এটা লক্ষ্য করার মতো। যাক্, এসব কথা ছেড়ে আমরা আবার সতীদের বয়সের হিসাবটা মিলিয়ে নি।

অন্য ব্যাপারে যাইহোক, সতীর ব্যাপারে অন্তত কলকাতা বিভাগের জুড়ি

.য় নেই—তা তো বলেইছি। ১৮১৫-২৪—এই ১০ বছরে বাংলায় যে ৫৯৯৬ জন সতী হয়, তারমধ্যে এক কলকাতা বিভাগেই (কটক কমিশনকে বাদ দিয়ে) ৩৫৩১ জন। শুনতে কেমন কেমন লাগে না! এখন এই কলকাতা বিভাগে কোন বয়সের মেয়েরা বেশি সতী হত? দীর্ঘ তালিকা দিয়ে ধৈর্যচ্যুতি ·টাব না। ১৮২৩-২৪—এই ২ বছরে কলকাতা বিভাগের ৯টি জেলায় যে ৬৫৭ জন সতী হয়, তারমধ্যে :

১৭৪	জনের	বয়স	৫০-এর বেশি,
১০৪	জনের	বয়স	৫০
১২০	জনের	বয়স	৪০ বা তার বেশি,
৭১	জনের	বয়স	৩০ বা তার বেশি,
৭৯	জনের	বয়স	২০ বা তার বেশি
৯	জনের	বয়স	২০-র নীচে।

অর্থাৎ এই ৬৫৭ জনের মধ্যে ৪৯৮ জন—মানে শতকরা ৭৬ জনই ৪০ বা তারবেশি বয়সের মহিলা। কলকাতা বিভাগের অন্তর্গত ৯টি জেলার কথা যদি পৃথকভাবে দেখি, তাহলেও দেখব প্রতিটি জেলাতেই বয়স্কা নারীদের মধ্যেই সতী হবার প্রবণতা বেশি। ১৮২৩-এ কলকাতা বিভাগের অন্তর্গত ৯টি জেলায় যে ৩০৯ জন সতী হয়, জেলাভিত্তিক তাদের বয়সের একটা তালিকা করলে দেখব :

	৫০-এর বেশি	৫০	৪০ ও তার বেশি	৩০ ও তার বেশি	২০ ও তার বেশি	২০-র নীচে
বর্ধমান	২২	৪	৮	৫	৬	×
জঙ্গল মহল	১৪	৪	৩	৪	২	×
মেদিনীপুর	৪	৩	৫	×	৩	×
যশোর	৩	৩	২	৪	২	×
নদীয়া	২২	৮	১৫	৭	৭	×
হুগলি	৩৮	১৮	১১	৬	৬	২
২৪ পরগণা	১১	৩	৪	১	২	×
বারাসাত	×	×	×	×	১	×
কলকাতার শহরতলী	২৫	৫	৬	৫	৪	১
মোট	১৩৯	৪৮	৫৪	৩২	৩৩	৩

১৩

দৃষ্টিটাকে যদি একটু প্রসারিত করি, তাহলেও দেখব, সর্বত্রই একটু বয়স্কা মেয়েরাই সতী হবার দিকে ঝুঁকেছে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের কথাই ধরা যাক। এই বছর যে ৫১৮টি মেয়ে সতী হয়, তাদের বয়সের একটা চার্ট করলে কেমন হয়?

১৮২৬-এর সতীদের বয়স

	১০০ বা তার বেশি	৯০ বা তার বেশি	৮০ বা তার বেশি	৭০ বা তার বেশি
কলকাতা বিভাগ মোট সতী সংখ্যা = ২৭৯	×	১	১৪	৩৫
কটক কমিশন মোট সতী সংখ্যা = ৪৫	×	×	১	২
ঢাকা বিভাগ মোট সতী সংখ্যা = ৬৫	×	×	৩	৭
মুর্শিদাবাদ বিভাগ মোট সতী সংখ্যা = ৮	×	×	১	×
বেরিলি বিভাগ মোট সতী সংখ্যা = ৮	×	×	×	×
পাটনা বিভাগ মোট সতী সংখ্যা = ৬৫	২	২	৫	৮
বেনারস বিভাগ মোট সতী সংখ্যা = ৪৮	×	×	×	৪
মোট সতী সংখ্যা = ৫১৮	২	৩	২৪	৫৩

৬০ বা তার বেশি	৫০ বা তার বেশি	৪০ বা তার বেশি	৩০ বা তার বেশি	২০ বা তার বেশি	২০-র নীচে
৫০	৫৪	৪৭	৩৮	৩২	৮
×	৬	৬	৮	২১	১
৮	১১	৮	১২	১৮	১
১	×	২	৩	১	×
২	২	১	১	১	১
৯	৭	৯	৩	১৬	৪
১১	৪	৪	৫	১৫	৫
৮১	৮৪	৭৭	৭০	১০৪	২০

১৪

দেখা যাচ্ছে, ৫১৮ জনের মধ্যে ৩২৪ জন—মানে শতকরা প্রায় ৬৪ জনেরই বয়স ৪০ বা তার বেশি। এর আগের বছর ১৮২৫-এও যে ৬৩৯ জন সতী হয়, তাদেরও শতকরা ৬৫ জনেরও বেশি ৪০ বা তার বেশি বয়সী।

অর্থাৎ একটু বয়স্কা—জীবনের বেশ কিছুটাই যাদের কেটে গেছে সুখেদুঃখে, অনেক পোড় খেয়ে জগৎটাকে যারা হাড়ে-হাড়ে চিনেছে, একটি মানুষের অঙ্গ হিসাবে নিজেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে—এমন মেয়েদের মধ্যেই সতী হবার প্রবণতা বেশি। তাছাড়া এটাই তো স্বাভাবিক। বেশির ভাগ মেয়ে বিয়ের দু'চার বছরের মধ্যে কিছু বিধবা হত না (১৮৮১-র সেন্সাস অনুযায়ী বাংলায় ১০-২৯ বছর বয়সী হিন্দু বিধবা ১৫·১২ জন, ৩০-৪৯ বছরের বিধবা ৪০·০৯ জন, ৫০ ও তদূর্ধ্ব বয়সী বিধবা ৪৪·৭৪ জন),[১৫] বেশ কিছুকাল ঘর করার পর স্বামীর মৃত্যু হলে অধিকাংশ সতী হত। তখন কারো বয়স ৪০, কারো ৫০, কারো ৬০। আর যে মানুষটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হয়তো ৬ বছর বয়সে, ৪০/৪৫ বছর তার সঙ্গে ঘর করার পর কি করবে সে? যুবতীর মনে আশা থাকে, স্বপ্ন থাকে, প্রৌঢ়ার মনে কি থাকে? তাই দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে অনেকেই তাকে একা যেতে দিত না—যদি পরলোকে স্বামীর কষ্ট হয়, তাই আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। দাম্পত্যপ্রেমের এরকম একটি ঘটনার পরিচয় নিয়েই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। ঘটনাটি কলকাতার উপকণ্ঠ কাশীপুর অঞ্চলের।

১৮১১-র জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে নিধিরাম দত্ত মারা গেলেন ৮১ বছর বয়সে। তাঁর স্ত্রীর বয়স তখন ৭১। বিয়ে হয়েছিল ১০ বছর বয়সে। মনে কি পড়ে সেই দূর অতীতের কথা? কিন্তু ৬০ বছর যে মানুষটার ঘর সে করল, সে যখন স্বার্থপরের মতো তাকে ফাঁকি দিয়ে আগেই চলে গেল, তখন সে কাকে নিয়ে, কি নিয়ে থাকবে? ৬০টা বছর যে মানুষটার সঙ্গে সে ছিল ছায়ার মতো, চাইলেই সে তাকে একা যেতে দেব কেন। সে সতী হবে—সতী। দেখবে কেমন করে তাকে ফাঁকি দিয়ে একলা সে যেতে পারে। তাকে তার স্বামীর শবদেহের সঙ্গে কাশীপুরে নিয়ে আসা হল। স্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে জলন্ত চিতায় বসে তার চোখমুখে সে কি আশ্চর্য স্নিগ্ধ শান্ত কোমলতা।[১৬]

কিন্তু সব মেয়েই কি এমন প্রশান্তির সঙ্গে, হাসিমুখে চিতায় গিয়ে উঠত, কেউ কি ভয়ে শিউরে উঠত না, জীবনের প্রতি অপার মমতায় চিতায় ওঠার পরও বাঁচার চেষ্টা করত না?

৬। হাঁ, জোর করে সতী করা হত

'না-না, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, চাই না, চাই না আমি সতী হতে। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি ভিক্ষে করে খাব, বাড়ি ফিরে আর তোমাদের গলগ্রহ হব না, শুধু তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও—বাঁচতে দাও।' চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখে হুমালিয়া তার আত্মীয়বন্ধুদের কাছে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল, তা সে পেল না। চিতায় তাকে পুড়ে মরতে হল, সতী তাকে হতেই হল।

চলুন, হুমালিয়ার কাহিনী জানার জন্য কিছুক্ষণ আমরা গোরক্ষপুর জেলায় পাড়ি জমাই।

সেথলু নামে এক বামুন প্রবাসে মারা যাবার দিন পনেরো পরে তার বছর কুড়ি বয়সের যুবতী বউ হুমালিয়া বলে বসল, সে সতী হবে। তার বাবা পুতন তেওয়ারি দূরে থাকে বলে, তাকে কিছু না জানিয়েই হুমালিয়ার আত্মীয়বন্ধুরা চিতা প্রস্তুত করে। উল্লাস তাদের চোখেমুখে।

২০ নভেম্বর, ১৮২০। পড়ন্ত বেলায় শনিচেরা থানা এলাকায় শ'দুয়েক লোকের সামনে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের সূচনা হল।

হুমালিয়া চিতায় ওঠার পর তার কাকা শিওলাল তাতে আগুন দিল। একটু পরেই অসহ্য যন্ত্রণায় হুমালিয়া চিতা থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করলে শিওলাল, বিচুক ও অন্যান্যরা তাকে ধরে এনে আবার চিতায় তোলে। অবস্থা তখন তার শোচনীয়—হাত-পা পুড়ে দগদগে, কাপড়-চোপড় আগুনে ছাই। এই অবস্থাতেও বাঁচার জন্য সে আবারও চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ে কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে পাশের ছোট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় করুণ স্বরে শুধু কান্না আর কান্না।

শিকার ফসকে যাচ্ছে দেখে তার কাকা শিওলাল আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির। মাটিতে একটা চাদর পেতে কাকা ভাইঝিকে

মিনতি করে, 'লক্ষ্মী মেয়ে, জল থেকে উঠে এটার ওপর বসো।' 'না-না, তাহলে তোমরা আমাকে আবার চিতায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে—আমাকে তোমরা দয়া কর, ছেড়ে দাও আমাকে।'

শিওলাল দেখল ব্যাপার গোলমেলে। নিপুণ অভিনেতা সে, কিছুতেই ঘাবড়ায় না। সঙ্গে-সঙ্গে চোখমুখের ভঙ্গি পালটে হাতে খানিক গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করে বলল, 'লক্ষ্মী মা আমার, তুমি চাদরের ওপর এসে বসো, আমি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।'

হাজার হোক কাকা তো। তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে হুমালিয়া যেই না জল থেকে উঠে চাদরের ওপর বসেছে, অমনি তাইতে তাকে আচ্ছা করে বেঁধে, সেটার মাঝখানে একটা বাঁশ ঢুকিয়ে সবসুদ্ধ আবার জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দেওয়া হল। বীভৎসভাবে পুড়তে লাগল সে। আগুনে সব বাঁধন অল্পক্ষণে পুড়ে গেলে শেষবারের মতো সে আবার পালাতে চেষ্টা করল।

সবাই দেখল সতী হতে এসে হুমালিয়া বাঁচার জন্য বড্ড ছটফট করছে। অন্যদের প্ররোচনায় তখন বুরাচ্চি নামে একজন মুসলমান তরোয়াল বার করে ধড় থেকে তার মাথাটা আলাদা করে দিল। না, বাঁচবার জন্য হুমালিয়াকে আর কোনো চেষ্টা করতে হল না, নির্বিঘ্নে চিতার আগুন তাকে গ্রাস করল।[১]

ঘটনাটির একটু পরিশিষ্ট আছে। হুমালিয়াকে সতী করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নেওয়ায় কয়েকজনকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়। ৭. ৮. ১৮২১-এ এস. টি গুড ও ডাবলিউ ডোরিন—নিজামৎ আদালতের এই দুই বিচারপতি সবদিক বিচার করে তাঁদের রায়ে বলেন, অভিযুক্তদের সবাই দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের ও মুসলমানদের অজ্ঞতার কথা স্মরণ করে, কোর্ট তাদের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করতে চায় না—কোর্টের মতে একটি 'Culpable homicide' এর কেস। আদালত আজকের তারিখ থেকে আসামী বুরাচ্চীকে ৫ বছর ও রসাকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং শিওলাল, বিচুক, হরিপাল ও ইজরায়েল—এই ৪ জনের প্রত্যেককে ২ বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে।

নিজামতের প্রধান বিচারপতি ডাবলিউ. লেসেস্টার এই বিচারে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বললেন, বুরাচ্চি আর শিওলালকে মৃত্যুদণ্ডে আর বাকিদের

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত ছিল। অবশ্য এখন শাস্ত্র, কেসটি এখন অন্য কোনো বিচারপতির কাছে দেওয়া যেতে পারে। আদালতের দ্বিতীয় জজ মিঃ কর্টেনী স্মিথ কিন্তু প্রধান বিচারপতির সঙ্গে একেবারেই একমত হতে না পেরে বিস্তৃতভাবে সব সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বললেন, আমি যদি বিচারক হতাম তাহলে বুরাচ্চিকে ৫ বছর আর রসাকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেও, শিওলাল, বিচুক আর রাজপুত দুজনকে খালাস দিতাম।[২]

হুমালিয়ার ঘটনাই একমাত্র ঘটনা নয়। হুমালিয়ার মতো আরো অনেক মেয়েকেই পাশবিকতার শিকার হতে হয়েছিল। অসহায় মেয়েদের এরকম অমানবিকভাবে পুড়িয়ে মারতে দেখে রামমোহনের মতো সচেতন মানুষ যে একে 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা' বলবেন আশ্চর্য কি। কটকের নামকরা খ্রীস্টান মিশনরি পেগস তাঁর সতী-সম্পর্কিত পুস্তকে বললেন, ৪টির মধ্যে ৩টি সতীর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয়।[৩] হিন্দুদের কাছে এটা একটা নিছক তামাসার ব্যাপার। বাংলার পুলিশ-সুপার ডাবলিউ. এওয়ার ১৮.১১ ১৮১৮-তে সরকারের বিচার বিভাগের সচিব মিঃ বেলিকে জানালেন, ১০টির মধ্যে ৯টি মেয়েকে সতী হতে বাধ্য করা হয়।[৪] বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মলোনী আর একটু গলা চড়িয়ে ডিসেম্বর ১৮১৮-তে জানান দিলেন, ১০০টির মধ্যে ৯৯টি সতীই জবরদস্তিমূলক। ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে বসে ২০.৬.১৮২১-এ উইলবারফোর্স মন্তব্য করলেন, সতী সাধারণত মেয়েরা স্বেচ্ছায় হয়—এমন কথা ভাবা ভুল; খুব কম ক্ষেত্রেই মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হয়।[৫] এর কিছুদিন পরে ৬ জুন, ১৮২৫-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে স্যার সি ফরবেস বললেন, হাজারে একজন মেয়েও স্বেচ্ছায় সতী হয় কিনা সন্দেহ।[৬] মির্জাপুর থেকে ১৮২৮-এ সতী ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী এক ব্যক্তি 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' লেখেন, ১০টির মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে মেয়েদের এই বীভৎস প্রথাপালনে বাধ্য করা হয়।[৭] শ্রীরামপুর মিশনরিদের পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মতে সতীপ্রথা নিছক হত্যাকাণ্ড, বাঁশের সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে মেয়েদের জোর করে সতী করা হয়। উইলিয়ম ওয়ার্ডের মতে সতীর ক্ষেত্রে মানুষের নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনা নেই।[৮]

সতীপ্রথা যে নিষ্ঠুর অমানবিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক মেয়েকে সতী হতে বাধ্য করা হত, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য লোকে তাদের পুড়িয়ে মারত। যেমনটি মারা হয়েছিল পুনার রাধাবাইকে।

রাধাবাই-এর স্বামী বালাজী রামচন্দ্র তখন আপ্তেতে, সঙ্গে তার দুই ভাইও আছে। সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮২৩। সারাদিন খাটাখাটুনির পর তিন ভাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাঝরাতে হঠাৎ বালাজীর চিৎকারে সবই জেগে উঠল। কি সর্বনাশ, সাপে কেটেছে যে বালাজীকে। খোঁজ খোঁজ—কোথায় ওঝা। ওঝা মিলল, ঝাড়ফুঁকও করা হল। কিন্তু হল না কিছুই। পরের দিন মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ সকলের চোখের সামনে আস্তে-আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল বালাজী। সজল চোখে দাহকার্য শেষ করে মৃতের অস্থি ও চিতাভস্ম নিয়ে বালাজীর দুই ভাই আপাজি রামচন্দ্র আর চিন্তু রামচন্দ্র ঐদিনই পুনার দিকে যাত্রা করল। শনিবার ২৬.৯.১৮২৩-এ রাতের বেলা তারা সেখানে পৌঁছল।

পরদিন সকালে দু'ভাই রাধাবাই-এর কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালে সে সঙ্গে-সঙ্গে সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। অনেক বুঝিয়েও তার মত পাল্টানো গেল না, সতী হবার অনুমতি তাকে দিতেই হল। ভুল করেই হোক বা ভুল বোঝাবুঝির জন্যই হোক, সতী হবার ঘটনাস্থলে কোনো পুলিশ উপস্থিত ছিল না। যে জমাদারের এ ব্যাপারে উপস্থিত থাকার কথা, সে তখন অন্য একজনকে ফাঁসিতে ঝোলানোর তোড়জোড়ে ব্যস্ত। পাশের চৌকির কয়েকজন বরকন্দাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও, তাদের ভূমিকাটা ঢাল-তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সেরে রাধাবাই স্বেচ্ছায় কারো সাহায্য না নিয়ে প্রশান্তচিত্তে চিতায় ওঠে। কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যে যন্ত্রণাকাতরভাবে সে তা থেকে লাফিয়ে পড়ে। মিঃ সোয়ানসন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা তখন তার কাপড়ের আগুন নেভানোর জন্য নদীজলে নিয়ে যান। রাধাবাই অভিযোগ করে চিতাটা ভালোভাবে প্রস্তুত হয়নি, এত আস্তে-আস্তে জ্বলছিল যে লাফ দিতে সে বাধ্য হয়। আবারও সে চিতারোহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। মিঃ টেলর তাকে বারবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেও, সে একই উত্তর দেয়। তখন আবার তাকে চিতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জ্বলন্ত চিতার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে, ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখমুখে—'না-না, সতী হব না আমি'—পেছিয়ে যেতে চাইল সে। কিন্তু পেছিয়ে যেতে চাইলেই বামুনরা তাকে যেতে দেবে কেন। কজন বামুন জোর করে তাকে তুলে ধরে চিতায় ফেলে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কজন তার ওপর ভারি-ভারি কিছু কাঠের বোঝা চাপিয়ে দিল, কোনোভাবেই যাতে পালাতে সে না পারে।

ছটফট করছে রাধাবাই, বাঁচতে চাইছে। অসহ্য উত্তাপ—সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টায় আবারও চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ল সে। সামনেই নদী। চিতা থেকে একটা জ্বলন্ত শরীর বেরিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাতের মুঠো থেকে শিকার ফসকে যাচ্ছে দেখে বামুনরা তখন উন্মত্ত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। রাধার পেছন পেছন ক'জন ছুটে গেল। জনাতিনেক কোনোদিকে না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ঐতো—ঐতো রাধাকে ধরে ফেলেছে তারা, বুকে হাঁটু দিয়ে দু'হাত জোর করে চেপে ধরে চেষ্টা করছে রাধাকে ডুবিয়ে মারতে। সতী হতে এসে পালানো—ক্ষেপে গেছে তারা, নররক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো।

হঠাৎ মিঃ টেলারের চোখে পড়ল এদিকে, কিন্তু তিনি যে অনেকটা দূরে, যেতে যেতে মেয়েটাকে না ওরা শেষ করে দেয়। চেঁচিয়ে তাই মিঃ এপথ্রোপ ও মিঃ মলিকে বললেন, 'বাঁচাও তোমরা, মেয়েটাকে বাঁচাও।' জোরকদমে তাঁরা এগিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে দুজন রাধাকে ছেড়ে দিলেও তৃতীয়জন ধরে রইল। মিঃ মলি তার কাছাকাছি পৌঁছলে তবেই সে তাকে ছাড়ে। দুচোখে তার আপশোষ—এঃ, শেষ করে দিতে পারলাম না।

মেয়েটি তখন শ্রান্ত—অবসন্ন—চোখের সামনে তাকে মারার এত আয়োজন দেখে ভয়চকিত। আর পারছে না সে, আর সহ্য করতে পারছে না। এলিয়ে পড়ল সে মলির বাহুতে, আশ্রয়—একটা আশ্রয়।

হাসপাতালে যখন তাকে পাঠান হল, শেষ অবস্থা তার তখন। পেছনের দিক থেকে পা পর্যন্ত গায়ের সমস্ত চামড়া সম্পূর্ণ পুড়ে ঝলসে গেছে, হাতদুটোরও একই অবস্থা। বুক-পেট ছাড়া সারা শরীরই অগ্নিদগ্ধ। মাথার সব চুল ঝরে গেছে, তাকানো পর্যন্ত যায় না তার দিকে। জীবনের প্রতি ভীরু মমতা তখনও কিন্তু তার মুছে যায় নি। পুনা সিভিল হাসপাতালের মুখ্য দেশীয় চিকিৎসক ডাঃ গণেশ পন্থের কাছে রাধাবাই শেষবারের মতো করুণভাবে তাকে বাঁচিয়ে তোলার আবেদন জানায়। চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয় নি। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণে ২০ ঘণ্টা লড়াই করেও শেষপর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল রাধাবাইকে।[৯]

শেষ একটু আছে। ঘটনাচক্রের নাটের গুরুদের মিঃ টেলার ও মিঃ আরবার্থনট দেখিয়ে দিলে, পুনার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রবার্টসন তাদের গ্রেপ্তার করে

চালান দেন। কিন্তু রামচন্দ্র, আপাজি রামচন্দ্র ও রাওজীবিন চন্দ্রজী ভোরে এই তিনজনকে অভিযুক্ত করে বিচারও করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোর্ট পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে তাদের মুক্তি দেয়।

বাধাবাই-এব ঘটনাটি সরকারি মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঘটনাটির পর পুনার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রবার্টসন সতীবিষয়ে কয়েকটি বিধিনিষেধ জারি করেন। 'বোম্বে কুরিয়রে' 'A Decided Enemy to Suttees' নামান্তরালে জনৈক পত্রলেখক এই নৃশংস ঘটনাটিব বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইনের সাহায্যে এই বীভৎস প্রথা বন্ধের সুপারিশ কবেন। কলকাতাব কাগজ 'জন বুল' লেখে, এই অতি বীভৎস সতীঘটনাটি বর্বর ও অস্বাভাবিক এই প্রথা নিবারণেব পথে আমাদেব আর এক পা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে না পারলেও, এ ধবনেব বীভৎস ঘটনার উল্লেখ করতে বক্ত যে তাদেব হিম হযে আসে—একথা পত্রিকাটি স্বীকাব কবে।[১০]

'জন বুল' সাহেবী কাগজ। বাংলাব তদানীন্তন পুলিশ সুপার ডাবলিউ. এওয়ারও খাস সাহেব। সতীপ্রথাব ঘোব বিরোধী তিনি, আইন কবে এ প্রথা নিবাবণেব উৎসাহী সমর্থক। তিনি মনে করতেন, স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে—এবকম একটা ভান বাইরে থাকলেও সতী আসলে স্ত্রীহত্যা ছাড়া আব কিছু নয়।

এওয়াবেব কথা কতখানি সত্য জানতে হলে, আবার একবাব আমাদেব বাঙালিসমাজের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। তাকালে দেখব, সেখানে শুধু সতীব চিতাই জ্বলত না, সাবাজীবন ধবে জ্বলত অনেক মেযে। তাবা কুলীনের মেয়ে, কুলীনেব বউ। এক বব অনেক কনেব বাজত্ব সেখানে। একগাছি পৈতের জোরে বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন বামুনরা অসংখ্য মেয়েব জীবন-যৌবন নিয়ে খেলায় মত্ত। নিতান্ত অখ্যাত, অজ্ঞাত লোকবাও ৫০, ৬০, ৭০, ৮০টি বিয়ে কবত। সংখ্যাটা অনেক সময় ১০০ ছাড়িয়ে যেত। ১৫০, ১৬০, ১৮০টি বিয়েও কেউ কেউ কবত বৈকি। গ্রামাঞ্চলে কেন, শহর কলকাতাতেই শতাধিক বিবাহকারী মহাপুরুষেব সাক্ষাৎ উনিশ শতকেও মিলত। অবশ্য বিয়ের পর বউ বাঁচল কি মরল সে খোঁজ তারা রাখত না, বউদের নামধাম মনে রাখতে অনেকে নাকি ডাইরি রাখত। অনেক কুলীন মেয়ে বিয়ের রাতেই প্রথম ও শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখত। ভুল বললাম, ভাগ্যবতী যারা, তাদের দ্বিতীয়বার সে সুযোগ আসত সহমরণে যাবার সময়!

কুলীনের যে বউটি বিয়ের পর স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখেনি, বাপ-ভায়ের সংসারে বাসন মেজে, জল তুলে, ভাত সেদ্ধ করে, আর সেইসঙ্গে ভাজের মুখঝামটা খেতে খেতে স্বামীর মুখের আদলটুকু পর্যন্ত যে মেয়ে ভুলে গেছে, তার কাছে হঠাৎ একদিন খবর এসে পৌঁছত সে বিধবা হয়েছে। মনে পড়ত তখন মেয়েটির, হঁ্যা তাইতো, এতদিন তাহলে আমি সধবা ছিলাম। স্বামী মারা গেছে অথচ চোখে জল নেই, লোকে দেখে বলবে কি—ছিঃ ছিঃ! প্রাণ-পণে তাই সে তখন চোখে জল আনার চেষ্টা করত। তারই মধ্যে কেউ কেউ সারাজীবনের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে সঙ্কল্প করে বসত সতী হবার।

ভৈরবী, ভারতী, শ্রীমতী আর দাসী এই চারজনের কথাই ধরা যাক। বৈদ্যবাটির কমল চাটুজ্যের বউ তারা। তাদের স্বামী কমল চাটুজ্যের পেশা বিবাহ। অর্থের বিনিময়ে লোকের কন্যাদায় উদ্ধারের মহৎ ব্রত নিয়েছিল সে! দুজন বাদে তাদের সবাইকে অবশ্য থাকতে হত বাপের বাড়িতে। বিয়েও করবো, আবার বউকে এনে ঘরে পুষবো—এমন কাঁচা লোক চাটুয্যে নয়! এহেন কৃতী পুরুষটি ৫ নভেম্বর, ১৮২৩-এর সন্ধ্যায় দেহ রাখলো। তার ২১/২২টি বউ এসময় বেঁচে। তাদের কাছে খবর পাঠান হল। খবর পেয়ে ভৈরবী, ভারতী, শ্রীমতী আর দাসী এই চারজন এগিয়ে এল সতী হতে। এদের মধ্যে দুজন স্বামীর সঙ্গেই থাকত, তৃতীয়জন কলকাতায় আর চতুর্থজন বাঁশবেড়িয়ায়।

কমল চাটুজ্যে মারা গেছে, কোন্নগর ঘাটে তার সঙ্গে তার একাধিক স্ত্রী সহমরণে যাবে। খবর পেয়ে আশপাশের গাঁ থেকে কয়েকশ লোক—বিশেষ করে মেয়েরা এসে জমায়েত হল। কজন সহমৃতা হবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও চলতে লাগল। যাইহোক, সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৭.১১.১৮২৩-এ কমল চাটুজ্যের মৃতদেহের সঙ্গে তার চারজন স্ত্রী কোন্নগরের ঘাটে এসে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি এসে গেছে, চিতাও প্রস্তুত, বাঁশ নিয়ে ক'জন তৈরী হচ্ছে সতীদের পালানোর পথ বন্ধ করতে। কোর্টের নাজির, ৪ জন বরকন্দাজ ও পুলিশও এসে হাজির। কিন্তু অনেকে ঠিক খুশি হতে পারছে না যেন। কুলীন হিসাবে চাটুজ্যের এত হাঁকডাক। আর তার সঙ্গে কিনা মাত্র ৪ জন সহমরণে যাবে! এর আগে ১৮১২-তে চুণাখালির এক বামুনের সঙ্গে ১২ জন মেয়ের সতী হবার গল্প ওয়ার্ড সাহেবের বইতে পড়েছে কেউ-কেউ। সমবেত দর্শকদের মধ্যে কেউ হয়তো বলেও থাকতে পারে,

'ওহে ওয়ার্ড সাহেবের সেই গল্পটার কথা জান তো। শ্রীরামপুরের তিন মাইল পুবে সুখচর, সেখানে নাকি একবার একটা দেখবার মতো 'সতীদাহ' হয়েছিল। এক কুলীন, ৪০ টা তার বউ। তার মধ্যে ১৮ জন তার সঙ্গে সতী হল। আর সে চিতাই কত বড়, দৈর্ঘ্যে ১০/১২ গজ তো বটেই![১১] সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, ওয়ার্ড সাহেব কিন্তু গল্প বানাতে পারতেন খাসা! এর তুলনায় চাটুজ্যের ব্যাপারটা নেহাৎই ছেলেখেলা। না, না, আর কয়েকজনের চাটুজ্যের সঙ্গে সহমরণে যাওয়া উচিত ছিল। আজকালকার মেয়েগুলো মানী লোকের মান রাখতেও জানে না!'

এদিকে ৪টি মেয়েকে নিয়ে চিতা তখন জ্বলে উঠেছে। যন্ত্রণা বেশি পোহাতে হয়নি তাদের, আগুন দেবার মিনিটখানেকের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই তারা মারা যায়। আগুনের আঁচও হয়েছিল ভীষণ, দশ মিনিটেরও কম সময়ে সব শরীরকটাই পুড়ে কয়লার মতো।[১২]

প্রসঙ্গত একটা তথ্য জানিয়ে রাখি। হুগলি এবং নদীয়ায় এক ব্যক্তির সঙ্গে একাধিকজনের সতী হওয়া নতুন কিছু ছিল না। যেমন ১৮২৪-এ নদীয়া আর হুগলিতে অন্তত ৬টি ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে একাধিক স্ত্রী সহমরণে যায়—৫টি ক্ষেত্রে ২জন করে এবং শান্তিপুরের ধনী গৃহস্থ বিশ্বনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে ৩ জন। এর পরের বছর ২০.১১ ১৮২৫-এ হুগলির ধনেখালিতে স্থানীয় জমিদার রামলোচন মুখার্জির সঙ্গে তাঁর ৪ স্ত্রী—পার্বতী, হরপার্বতী, রওয়ারি ও চিত্রা সহমরণে যায়।[১৩] এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, এ অঞ্চলে কৌলীন্যের প্রভাব কতখানি প্রবল ছিল।

কোন্নগরের কমল চাটুজ্যে বা ধনেখালির রামলোচন মুখুজ্যে যতই কৃতী পুরুষ হোক, নদীয়ার বাঘনাপাড়ার অনন্তরামের তুলনায় তারা শিশু। অনন্ত-রাম শ'খানেকেরও বেশি মেয়েকে মাথায় সিঁদুর পরার সুযোগ করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে তিনজনকে কাছেই রেখেছিল, বাকিরা দূরে-দূরে। পয়সাকড়ির দরকার না পড়লে অনন্তরামের পায়ের ধুলো সেসব জায়গায় পড়ত না। সেরকম দক্ষিণা পেলে গৃহস্থের সবকটি কন্যাদায়ই সে উদ্ধার করে দিত, এক পরিবারের ৪ বোনকে সে রাতারাতি সধবা বানিয়ে দিয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে এহেন ব্যক্তিটি দেহরক্ষা করলে ঘটা করে তার চিতা সাজান হল। তার সাহচর্যধন্য তিন স্ত্রী আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সেরে প্রস্তুত হল সহমরণে যাবার জন্য। চারজনকে নিয়ে চিতা জ্বলে উঠল। কিন্তু তাকে নিভে যেতে দেওয়া হল না। কারণ?—

কুলীন বামুন অনন্তরামের বউদের এক একজনের বাস এক এক প্রান্তে। তাদের কাছে খবর পেঁ ৗছে দিতে হবে। আর, খবর পেয়ে যারা সতী হতে আসবে, তাদের জন্য চিতা জ্বালিয়ে রাখা হল তিনদিন ধরে। খবর গিয়ে পেঁ ৗচচ্ছে অনন্তরামের বিভিন্ন শ্বশুরবাড়িতে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার বউরা এসে হাজির হচ্ছে বাঘনাপাড়ায়। চিতা তো জ্বলছেই, কাজেই চট করে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সেরে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয়। অনন্তরামের চিতায় প্রথমদিন ৩ জন, দ্বিতীয় দিন ১৫ জন, ৩য় দিন ১৯ জন—মোট ৩৭ জন পুড়ে মরে! এদের মধ্যে কেউ-বা চল্লিশোত্তীর্ণ, আবার কেউ-বা ১৬ বছরের কিশোরী।[১৪] বাহাদুর বলতে হবে সেই বামুনকে, যিনি তিনদিন ধরে অনন্তরামের বউদের শাস্ত্রীয় আচার পালন করানোর জন্য জ্বলন্ত চিতার কাছে বসেছিলেন। নাকি, এ ব্যাপারে বামুনদের ডিউটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল!

ঘটনাটা কি সত্যই ঘটেছিল? গোপীনাথ নামে শ্রীরামপুর ছাপাখানার জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্মচারী তাঁর ভাইপোর কাছে শোনা এই ঘটনাটি ওয়ার্ডকে বলেন। জানি না, গোপীনাথ অথবা তাঁর ভাইপো অথবা ওয়ার্ড-সাহেব স্বয়ং ঘটনাটিতে রঙ চড়িয়েছিলেন কিনা। আমাদের কাছে ১৭৯৯-এ ইংরেজ শাসনে ৩ দিন ধরে চিতা জ্বালিয়ে রেখে ৩৭ জনের তাতে আত্মাহুতিদান—কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে! গোটা নদীয়া জেলাতে যেখানে বছরে গড়ে ৬০ জনের মতো মেয়ে সতী হত (১৮১৭-২৬-এই ১০ বছরে নদীয়ায় মোট ৬১৯ জন সতী হয়, গড়ে বছরে ৬১.৯ জন), সেখানে ঘটনাটা তো আরো অবিশ্বাস্য। মনে হচ্ছে, অনন্তরামের ঘটনাটি গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। হ্যাঁ, তার প্রমাণও আছে। কটকের নামকরা মিশনরি পেগস সতীপ্রথার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা লেখেন, এতে অন্য একটি সূত্র থেকে অনন্তরামের ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন তিনি। একই ঘটনা। কিন্তু এখানে দেখি অনন্তরামের সঙ্গে ১ম দিন ৩ জন ও বাকি ২ দিনে ১৯ জন—মোট ২২ জন সহমরণে যায়।[১৫] একলাফে সংখ্যাটা নেমে এল ৩৭ থেকে ২২-এ! সত্যদেব আর একটু চাপাচাপি করলে সংখ্যাটা কোথায় নামত জানি না!

অনন্তরামের স্ত্রীরা আত্মাহুতি দিয়ে (যদি আদৌ কেউ দিয়ে থাকে) সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল। যারা আত্মাহুতি দেয় নি, তারা হয়তো তাদের সন্তানের মুখ চেয়েই বাকি জীবন কাটানোর সঙ্কল্প

করেছিল। সন্তানের মুখ চেয়ে অনেক মা যে সতী হতে গিয়েও হতেন না, তার পরিচয় আমরা দিয়ে এসেছি। কিন্তু সন্তান যখন নিজের হাতে জোর করে মাকে চিতায় তুলে দেয়, তাতে আগুন দিয়ে মাকে পুড়িয়ে মারে, তখন একে মানবসমাজের নিষ্ঠুর এক কলঙ্ক না বলে উপায় নেই! এমনই এক বীভৎস ঘটনা ঘটেছিল কলকাতার কাছে জয়নগর-মজিলপুরে।

১৭৯৬-এর কাছাকাছি সময়ে সেখানে বাঞ্ছারাম নামে এক বামুন মারা গেলে, তার বউ চলল সহমরণে। সব অনুষ্ঠান শেষ হলে চিতায় তাকে ভালভাবে বেঁধে আগুন দেওয়া হল।

রাত তখন গভীর, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। আগুনের তাপ গায়ে লাগামাত্র চিতা থেকে নিজেকে কোনোক্রমে মুক্ত করে, মেয়েটি বুকে হেঁটে চুপিসাড়ে পাশের ঝোপে গিয়ে লুকলো। চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার, ব্যাপারটা চট করে তাই কারো চোখে পড়ল না। হঠাৎ এইসময় একবার বিদ্যুৎ চমকাতে সবাই চমকে উঠে দেখে—আরে, চিতায় যে একটা শরীর জ্বলছে! সবাই চকিত হয়ে উঠল। খোঁজ, খোঁজ, সতী পালিয়েছে।

চোখে পড়ল প্রথমে ছেলেরই, আরে ঐতো ঝোপের আড়ালে মা লুকিয়ে। ঝোপের আড়াল থেকে টানতে টানতে মাকে সামনে নিয়ে এসে কর্কশস্বরে সে বলল, 'তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, সতী হতে এসে তুমি কিনা পালাচ্ছ! তোমার জন্য আমার মান-সম্মান-জাত সব গেল। তোমার কোনো কথা আমি শুনব না, তোমাকে আবার চিতায় উঠতে হবে, তা না হলে জলে ঝাঁপ দিতে, বা গলায় দড়ি দিতে হবে, মোটকথা, ঘরে আর তোমার ফেরা চলবে না, মরতে তোমাকে হবেই।'

মা আর ছেলে মুখোমুখি—মার চোখে জল।

ছেলের হাত ধরে মা মিনতি করে বলল, 'বাবা, তুই আমাকে আগুনে দিস না—এভাবে মরতে আমি পারব না, আমি তোর মা, তোকে পেটে ধরেছি, তোর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।'

ছেলে দেখল ভাল বিপদ, কোথায় সতী-মার ছেলে বলে লোকে তার জয়জয়কার করবে, তা নয়, তার মা কিনা এখন সতী হতে এসে পেছিয়ে যাচ্ছে। এবার তো তাকে একঘরে হতে হবে, লোকের কাছে মুখ দেখাবে সে কেমন করে! কথা বাড়াল না সে, অন্যদের সাহায্যে মার হাত-পা বেঁধে তাকে চিতায় ফেলে দিল।[১৬]

ওয়ার্ডের বর্ণিত এই কাহিনীটি কতখানি সত্য জানি না, তবে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, অনেক ছেলেই এযুগে বিনা দ্বিধায় তার জীবিত মাতা ও মৃত পিতার চিতায় অগ্নিসংযোগ করত। ঠিক বিপরীত ঘটনাও ঘটত—যেখানে সতী হতে উত্মত মেয়ের চিতায় বাবা নিজের হাতে অগ্নিসংযোগ করত। এরকম একটি ঘটনার কথা বলি। ১৮২৪-এ গোরক্ষপুর জেলায় গিরিধারি নামে এক ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার পরিধেয় বস্ত্র ও পৈতে তার ৯ বছরের বালিকাবধূ ভক্তির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটি ঐ বস্ত্র ও পৈতে নিয়ে সতী হয়। চিতায় অগ্নিসংযোগ করে তার বাবা রামপ্রসন্ন—সে নাকি মেয়েকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ৯ বছরের মেয়ে—তার ওপর ব্রাহ্মণী—এই দুই অপরাধে মেয়ের বাপ-ঠাকুরদার বিচার হয়। বিচারে প্রথমজনকে ১ বছর বিনাশ্রম ও দ্বিতীয়জনকে তার অতিবৃদ্ধ অবস্থার কথা স্মরণ করে ১ মাস বিনাশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১৭]

এর চেয়েও নিষ্ঠুর এক পিতার পরিচয় পেয়েছি মিশনরিদের লেখায়। ১৮০৭-এ কাটোয়ায় এক হিন্দু তার তরুণী স্ত্রীকে রেখে মারা যায়। মেয়েটির বাবা একজন পণ্ডিত, ধার্মিক ব্যক্তি বলে সে পরিচিত। মেয়েটি তার স্বামীর মৃত্যুকালে সতী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন চিতা প্রজ্বলিত হল, তখন জীবনের প্রতি অপার মমতায় সে বাঁচতে চাইল এবং আগুন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। মেয়েটির 'ধর্মভীরু' পিতা তা দেখে যেসব লোক বাঁশ হাতে নিয়ে আগুনকে উসকে দেবার জন্য দাঁড়িয়েছিল, তাদের মেয়েটিকে মেরে চিতায় ঢুকিয়ে দেবার আহ্বান জানাল। তারা সঙ্গে-সঙ্গে তার কথা-মতো কাজ করল এবং বাঁশের বাড়ি মেয়েটির মাথায় মেরে তার পালানোর পথ চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিল।[১৮]

এই 'ধার্মিক' পিতাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। কিন্তু সহমরণের ব্যাপারটা বীভৎসতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করত, যখন দুধের শিশুকে দিয়ে জোর করে তার জীবন্ত মায়ের মুখাগ্নি করান হত। এরকম একটি ঘটনা কলকাতার কাছেই বরানগরে ঘটেছিল।

১৮০৯-এ এখানে স্থানীয় এক ধোপা মারা গেলে তার স্ত্রী সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। তার আত্মীয়রা তাকে সতী না হবার জন্য অনেক অনুরোধ করে, তার ভরণপোষণের সব দায়িত্ব নেবার কথাও বলে। কিন্তু ৩ বছরের ছেলের কথা পর্যন্ত যে মেয়ে ভাবেনি, এসব কথায় সে যে কান দেবে না—এতো

জানা কথা। অবিচলিতভাবে সে চিতায় গিয়ে উঠলে, তাকে তার সঙ্গে ভালভাবে বেঁধে, তার ওপর আড়াআড়িভাবে বাঁশ চাপিয়ে দেওয়া হল। এই সময় একজন মেয়েটির ৩ বছরের ছেলেকে কোলে করে সেখানে নিয়ে আসে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে, এত লোকজন, তাব মা ওখানে শুয়ে আছে, তাকে ডাকছে পর্যন্ত না। একজন বামুন একটা জলন্ত কাঠের টুকরো তার হাতে গুঁজে দিতে গেলে ভয় পেয়ে ছেলেটি চিৎকার করে ওঠে। তখন তার হাতে জোর করে সেটা গুঁজে দিয়ে তাকে দিয়ে প্রথমে চিতার মাথায় ও পরে পায়ের দিকে অগ্নিসংযোগ করান হয়। জনতার হরিবোলেব মধ্য দিয়ে চিতা জ্বলে উঠল। চিতায় মেয়েটি সতী হচ্ছে। চিতায় আগুন দিয়েছে ছেলে, সেই ছেলে—যে দুচোখ বড করে দেখছে—বুঝতে পারছে না কিছুই।[১৯]

এ ঘটনা সত্য। বীভৎস, বর্বর এই প্রথা। কিন্তু তাই বলে কি আমরা বলব, সব মেয়েকেই জোর করে সতী করা হত, এবং পৈশাচিক উল্লাসে অসহায় মেয়েগুলোকে হিন্দুরা পুড়িয়ে মারত! তাদের কাছে এটা ছিল নেহাৎই একটা মজার ব্যাপার। ইতিহাস এক্ষেত্রে কি বলে? দেখা যাক।

৭। না, জোর করে সবাইকে সতী করা হত না

১৭৪২-৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। কাশিমবাজারের এক ধনী মারাঠী যুবক রামচাঁদ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর ১৮ বছরের যুবতী স্ত্রীকে নিজের চোখে সহমৃতা হতে দেখেছিলেন মিঃ হলওয়েল। নিজের হাতে আগুন জেলে চিতায় ওঠার পর মেয়েটি কি ভয় পেয়েছিল, শিউরে উঠে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, বাঁচতে চেয়েছিল? প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েলের কথাই উদ্ধৃত করি:

'With what a dignity and undaunted countenance she set fire to the pile the last time, and assumed her seat, can only b: conceived, for words cannot convey a just idea of her '[১]

ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি।

ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে ভোর ৫টায় রামচাঁদ পণ্ডিত মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী ব্রাহ্মণদের কাছে সহমরণের সঙ্কল্প করে। ২ মেয়ে, ১ ছেলে তার, বড়টিব বয়সই চাব পূর্ণ হয়নি

কাশিমবাজারে রামচাঁদের পরিবারের খুব নামডাক। খবর পেয়ে তার আত্মীয়স্বজন আর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দলে-দলে এসে হাজির। বউটির সঙ্কল্পের কথা শুনে তারা তো অবাক। অনেক বোঝানো হল তাকে, কিন্তু তার ঐ এক কথা। তার সহমরণের সঙ্কল্পের কথা শুনে লেডি রাসেলও বেশ কবার তার কাছে লোক পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন, সে শুধু স্ত্রী-ই নয়, মা-ও। ছেলে-মেয়েদের প্রতিও তার একটা কর্তব্য আছে। আগুনে পুড়ে মরাটাও খুব হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। মেয়েটি লেডি রাসেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে বলল, 'কি নিয়ে বাঁচব আমি, বাঁচার মতো আমার তো আর কিছুই নেই, দয়া করে তিনি যেন আমার ছেলেমেয়েদের একটু দেখেন।'

মেয়েটিকে ভয় দেখানোর জন্য আগুনে পুড়ে মরার যন্ত্রণার কথা যখন হচ্ছিল, তখন সে শান্তভাবে জলন্ত আগুনে একটা আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ একইভাবে অবিকৃতমুখে বসে রইল, যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র তার মুখচোখে ফুটল না। এরপর একহাতে খানিকটা আগুন নিয়ে অন্য হাতের তালুতে রেখে ধুপধুনো

ছিটিয়ে ব্রাহ্মণদের সুবাসিত করল সে। তাকে তার ছেলেমেয়েদের অসহায় অবস্থার কথা একজন আবার স্মরণ করিয়ে দিলে সে বলল, 'যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দেখবেন তাদের।'

শেষ অস্ত্র হিসাবে তখন তাকে বলা হল, সতী হবার অনুমতি তাকে কিছুতেই দেওয়া হবে না। একথা শুনে ক্ষণেকের জন্য তার মনে যেন সংশয় দেখা দিল। পরমুহূর্তেই নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়ে সে বলল, 'মৃত্যু আমার হাতের মুঠোয়, আমাকে যদি সতী হতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি উপোস করে মরবো।' তার আত্মীয়বন্ধুরা তার মতিগতি দেখে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

পরদিন সকালে রামচাঁদের শবকে নদীর ধারে নিয়ে আসা হল। বেলা দশটা নাগাদ মেয়েটিও এল সেখানে। সঙ্গে প্রধান তিন ব্রাহ্মণ, তার ছেলে-মেয়েরা, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন আর অগণিত সাধারণ মানুষ।

চিতা প্রস্তুত। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ফৌজদারের কাছ থেকে অনুমতি আর আসে না। বউটি গঙ্গায় স্নান করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ গিয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

বেলা একটার পর মুর্শিদাবাদের ফৌজদার হোসেন খাঁর অনুমতিপত্র এসে পৌঁছল। মেয়েটি স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একজন রাজ-কর্মচারীও এসে হাজির।

অনুমতিপত্র এসে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি উঠে তার মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আধঘণ্টাখানেক সময় কাটানোর পর নিজের চুড়িবালা ও অন্যান্য গয়নাগাঁটি খুলে একটা কাপড়ে বাঁধল। তার এক আত্মীয় সেটিকে চিতার একপাশে রেখে এল।

ইতিমধ্যে শবকে চিতার ওপর শোয়ানো হয়েছে। বউটিও প্রস্তুত। চিতার এককোণে সামান্য একটু আগুন জ্বেলে সেখানে প্রধান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের জন্য কয়েকমিনিট বসল সে। প্রথমজন একটা বেল-পাতায় নানা জিনিস নিয়ে তার হাতে দিলে, সেটাকে আগুনে নিক্ষেপ করে দ্বিতীয়জনের দেওয়া আর একটি বেলপাতা আগুনের ওপর ধরলে বামুনটি তিনবার তার ওপর ঘি ছিটিয়ে দিল, পাতা থেকে ঘি ঝরে আগুনের ওপর পড়ল। তৃতীয়জন অথর্ববেদের অংশবিশেষ তাকে পড়ে শুনিয়ে কিছু প্রশ্ন করলে, শান্তভাবে পবিত্রমুখে সে তার জবাব দিল। এসময় এত গোলমাল

হচ্ছিল যে কি যে সে বলল, খুব কাছ থেকেও তা বোঝা গেল না। এইসব অনুষ্ঠান সারা হলে ব্রাহ্মণদের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে তিনবার প্রসন্নমুখে সে চিতা প্রদক্ষিণ করল।

এবার বিদায় নেবার পালা। প্রথমে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে, তারপর একে-একে বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শেষ হলে একজন বামুন একটুকরো ঘি মাখান জ্বলন্ত কাপড় তার হাতে দিয়ে তাকে চিতার দিকে নিয়ে গেল। সব বামুনরা এসে মেয়েটির পায়ে লুটিয়ে পড়ল, আশীর্বাদ চায় তারা—সতীর আশীর্বাদ। সবাইকে আশীর্বাদ করল সে—কাঁদতে কাঁদতে তখন তারা পথ ছেড়ে দিল।

দুপা এগিয়ে চিতায় ওঠার সময় স্বামীর পায়ে শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করার পর আর একটু এগিয়ে তার মাথার কাছে গিয়ে বসল বউটি। যেন আত্মসমাহিত-কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার, বিহ্বলচোখে স্বামীর মুখপানে চেয়ে—হাতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। মিনিটখানেক পরে হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, নিজের হাতে চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু যেদিকে আগুন দিল, বাতাস বইছিল তার উল্টোদিকে। তখন বাতাসের অনুকূলে চিতায় অগ্নিসংযোগ করে আবার সে যথাস্থানে এসে বসল। এসময় তার চিত্তের দৃঢ়তা, নির্ভীক মনোবলের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম বলে প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েল জানিয়েছেন।[২]

শুধু হলওয়েল কেন, আরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে দেখাতে পারি, যুগে-যুগে ভারতীয় নারীরা কেমন হাসিমুখে গিয়ে চিতায় উঠেছে (প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি টাভার্নিয়ের, পিটার মাণ্ডি, জেমেল্লি ক্যারেরি, নিকোলাস উইদিংটন, উইলিয়ম হজেস প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের কথা)। প্রাচীনকালে সতীপ্রথা যখন অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও সতী হবার জন্য রানীদের মধ্যে কেমন কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, তার কথা আমরা আগেই বলে এসেছি। প্রাচীন গ্রীক লেখক ভেলেরিয়াস মাক্সিমাসের মতে সতীদের অতুলনীয় সাহস, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের কোনো তুলনা নেইঃ 'The pious wife ascends the pile in the face of instant death, as if it was a nupital coach.'[৩] চতুর্দশ শতাব্দীর পর্যটক ইবন বতুতা সহমরণের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সতীকে হিন্দুরা খুব সম্মানের চোখে দেখে, একথার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বলেছেন, তাই বলে জোর করে কিন্তু কোনো মেয়েকে সতী করা হয় না। চিতায় ওঠার পূর্বমুহূর্তে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা যখন

মেয়েটিকে শেষবিদায় জানায় তখন 'She laughs, plays, or dances to the very time in which she is to be burnt'.[8] সতী যে মেয়েরা স্বেচ্ছায় হয়, এ-বিষয়ে যে তাদের বাধ্য করা হয় না—স্যার টমাস রো-র চ্যাপলেন এডওয়ার্ড টেরিও (১৬১৬-১৯) তা বলে গেছেন। ক্রফোর্ড সতীর মতো সহনশীলতা ও স্থৈর্য পুরাকালের নায়ক ও দার্শনিকদের মধ্যেও বিরল বলে মন্তব্য করেছেন।[৫]

কিন্তু উনিশ শতকে ভারতে মিশনরি কার্যকলাপ যখন খুব বেড়ে যায়, তখন দেখতে পাই এদেশীয় ধর্ম, প্রথা-আচার ইত্যাদিকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়ে পড়েছে তাঁদের কর্তব্যকর্মের অন্যতম। আর সেই কারণেই ইতিহাসের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে তাঁরা বলতে থাকেন, অসভ্য বর্বর হিন্দুগুলো মেয়েদের জোর করে পুড়িয়ে মারে। তাঁদের কথায় সায় দেবার লোকেরও অভাব হয় না। এমনই এক মিশনরি জে. পেগস্ ১৯.৮ ১৮২৪-এ কটকে চোখের সামনে একটি মেয়েকে সতী হতে দেখেছিলেন। অন্যদের সঙ্গে স্বয়ং পেগস্ও মেয়েটিকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মেয়েটি বলে, পূর্বের তিনজন্মে সে সতী হয়েছে, এবার চতুর্থবারও সে তা হতে যাচ্ছে। সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে সে বলে, তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা যারা করবে, তার অভিশাপে তাদের বংশলোপ হবে ও গতি হবে নরকে। মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্য মেয়েটি একটুকরো আগুন নিয়ে শিশুর মতো খেলা করতে থাকে, তার হাত একটুকরো জ্বলন্ত কয়লার ওপর চেপে ধরা হলেও মুখে তার বিকৃতির চিহ্নমাত্র ফুটে ওঠে না।[৬]

অথচ এই পেগসই অধিকাংশ মেয়েকে জোর করে সতী করা হয় বলে মনে করতেন! পেগসের বিদ্বেষপ্রসূত এইসব কথার জবাব দিয়েছিলেন 'এশিয়াটিক জার্নালে'র জনৈক লেখক। তাঁর মতে এইভাবে পেগস্ সতীপ্রথা সম্পর্কে যেন-তেনপ্রকারে একটা নিরতিশয় ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে (অসচেতনভাবে) মূল সমস্যাটি থেকে মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করে জনমতকে বিভ্রান্ত করছেন। বাংলার সর্বত্র বাঁশের সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে মেয়েদের সতী হতে বাধ্য করা হয় বলে পেগস্ যে বক্তব্য রাখেন, সে সম্পর্কে জার্নাল-লেখকের মন্তব্য:

'What object, we would ask, can be answered, by the publication of such statements as these (which if true at any period, are absolutely false as applied to the practice at present), but to create unjust notions in the public mind.'[৭]

আসলে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মিশনরিরা হিন্দুদের কুৎসা করতেন। এবং তাই সত্যকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করে মিশনরিরা তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইতেন। সেই কারণে সতী যে হিন্দুদের কাছে মস্ত একটা তামাসার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়, তা জোর গলায় প্রচার করতে তাঁদের বাধেনি।

তামাশা? তাই নাকি? মিশনরিদের কল্যাণে অনেক জ্ঞানের মতো এও এক জ্ঞানলাভ হল। সতী শোকের অনুষ্ঠান নয়, একটি মেয়ের স্বেচ্ছা-মৃত্যুর কাহিনী—তাই সতীর ক্ষেত্রে জনতার স্বতঃস্ফূর্ততা, সতীর আশীর্বাদা-কাঙ্ক্ষায় দলেদলে নরনারীর ভিড় ইত্যাদির ফলে গোটা পরিবেশটাই কেমন যেন পালটে যেত। সতী অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বেচ্ছায় হত, হাসিমুখে সে স্বামীর সহগমন করত—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ যেন মৃত্যুকে অতিক্রম করার চেষ্টা। কিন্তু নিজের চোখের সামনে মেয়ে আত্মবিসর্জন দিচ্ছে, ঢলঢলে মুখের একটি সদ্যযুবতী পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানাচ্ছে, এমন ঘটনার সময় পরিবেশ যে কেমন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠত, তার দৃষ্টান্ত খাস মিশনরি কাগজ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' থেকেই তুলে ধরছি:

১৮২১-এর ১৫ আগস্ট সালকের নামকরা ধনী তারিণীচরণ বাড়ুয্যে মারা যান। তাঁর স্ত্রীর বয়স ১৭/১৮। অসাধারণ সুন্দরী সে, চোখমুখে নিষ্পাপ সরলতা। স্বামীহারা হবার পর সতী হতে যখন সে সালকের ঘাটে আসে, তখন সমবেত হাজার-হাজার জনতার মধ্যে নেমে আসে গভীর বিষাদের ছায়া। আহা, এমন মেয়েকেও সতী হতে হবে, আগুনে এমন সোনার অঙ্গ পুড়বে। সবাই দুঃখিত, শোকার্ত। মেয়েটির বাবা পয়সাওয়ালা লোক, সতী না হলে মেয়েটিকে যে আর্থিক কষ্টের বা অবহেলা অনাদরের মধ্যে পড়তে হবে না, তা জোর করে বলা যায়। অনায়াসে আরো বহুবছর সে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু একবার সঙ্কল্প গ্রহণের পর সম্পদের প্রতিশ্রুতি, বন্ধুদের বিষাদমাখা মুখ, মা-বাপের স্নেহ-ভালবাসা, মৃত্যুর যন্ত্রণাময় বিভীষিকা - পৃথিবীর আর কোনো-কিছুই তাদের সঙ্কল্প পাল্টাতে পারে না। বেলা ১টার সময় তারিণীচরণ মারা যান, আর তাঁর স্ত্রী চিতায় গিয়ে ওঠে বেলা ৫টায়।[৮]

ফ্রেণ্ড-সম্পাদক ঠিকই বলেছিলেন, মেয়েরা একবার সতী হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে বন্ধুবান্ধবের বিষাদমাখা মুখ, মা-বাবার চোখের জল কিছুই তাদের সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে না। পারে নি আগরপাড়ার সতীটিকেও। আগরপাড়ার কাছে পেনেটিতে বছর পঁচিশের এক ব্রাহ্মণ যুবক মারা গেলে

তার দুই স্ত্রী-ই সহমরণের সঙ্কল্প করে। বড়র বয়স ১৭, ছোটর ১৫। যথারীতি পুলিশে খবর পাঠান হয়, দারোগা এসে তারা স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করে যায়।

উদ্যোগ-আয়োজনের প্রথম পর্ব শেষ। এমনসময় জামাই-এর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছোট বউ-এর বাবা-মা এসে উপস্থিত। নদীতীরে শ্মশানে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, একি তাঁদের মেয়ে যে সতী হতে চলেছে। মেয়ের হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করলেন তাঁরা, 'না, না, তুই সতী হস না, কেন সতী হবি তুই, স্বামী তো তোর ভরণপোষণের কোনো অভাব রেখে যায়নি।' মেয়ে বেশি কথা বলল না, এ-জগতের নয় যেন সে। মুখে সে কি গভীর আত্মপ্রত্যয়। গভীর অথচ শান্তস্বরে সে বলল, 'সতী আমি হবই।'

চিতায় ওঠার আগে দুই সতীন চান করতে নদীতে নেমে একবুক জলে দাঁড়িয়ে পুরোহিতের নির্দেশমতো যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করল। জল থেকে উঠে নতুন কাপড় পরে, মাথা আঁচড়ে, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ পরে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করার পর বড় বউ স্বামীর ডানপাশে, আর ছোটবউ বাঁপাশে আসন নিল। চিতার সঙ্গে তাদের বাঁধার জন্য একটুকরো দড়ি থাকলেও, তা কাজে লাগান হল না। তাদের ওপর কাঠ আর শুকনো ডালপালা চাপান হলে পুরোহিতের নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে বউদের খুড়তুতো দেওর চিতায় আগুন দিল। সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠল, 'হরিবোল'। অল্পক্ষণের মধ্যে আগুন উঠল লকলক করে, চারদিক থেকে তার ওপর আরও কাঠ ও দাহ্যপদার্থ পড়তে লাগল।

নিজের মেয়ে পুড়ে মরছে—সতী বা যাই হোক সে, কোন বাপ-মা তা চোখ মেলে দেখতে পারে। আগুন যখন চারদিকে তার শিখা বিস্তার করেছে, ছোট বউ-এর বাপ-মা তখন সেখান থেকে নদীর ধারে চলে গিয়ে মেয়ের শোকে অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সন্তান হারানোর গভীর বেদনায় তাঁদের চোখের জল যখন নদীজলে গিয়ে মিশছে, অন্যদিকে তখনও চিতা জ্বলছে—জ্বলছেই।[৯] শুধু চোখের জলই নয়, চিতা জ্বলে ওঠার পর অনেকসময় সতীর দু'চারজন আত্মীয়স্বজন (বিশেষকরে মেয়েরা) চেতনা হারাত।[১০]

জ্বলন্ত চিতায় সতীর আত্মবিসর্জনের আরো একটি ঘটনা উদ্ধৃত করব, এবং করব মিশনরি পত্রিকা থেকে। শুধু দেখাতে যে সতী মেয়েদের জোর করে করা হত কি সতী মেয়েরা স্বেচ্ছায় হত। ঘটনাটি ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮২৮-এর।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাহেবরা দেখেন, বছর কুড়ি বয়সের একটি বামুনের মেয়ে সতী হবে। গঙ্গার ধারে সহমরণের উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ। ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মেয়েটিকে নিবৃত্ত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। কোনো কথাতেই কান দিল না সে, সতী হবার গর্বে সে যেন ফেটে পড়ছে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ সে করবেই।

সমবেত লোকজন তার সাহস দেখে মুগ্ধ। মেয়েটির বিশ্বাস সে তার পূর্ব কয়েকজন্মের ইতিহাস জানে। সমবেত লোকজনের কাছে সে যে পূর্বের চার জন্মে বিভিন্ন জায়গায় সতী হয়েছে এবং এবার পঞ্চমবারও তা হতে চলেছে—গর্বের সঙ্গে তা ঘোষণা করে। চিতায় আগুন দেওয়া হল। পনের মিনিট ধরে তা জ্বলার পর মেয়েটি ধীর পায়ে চিতায় উঠে চিৎকার করে উঠল 'সতী মার জয়' তার কথার প্রতিধ্বনি উঠল চারিদিকে।

আগুন জ্বলছে। মেয়েটি দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে চিতায় বসে, যেন কোনো চেতনাই নেই তার। ক্রমে আগুন তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল, আগুনের আঁচে তার সারা শরীর প্রথমে ঝলসে গেল, সারা শরীর কাঁপতে লাগল। ক্রমে আগুনে সে সম্পূর্ণ দগ্ধ হল। চারিদিকে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি—'জয় সতী-মার জয়।'[১১]

মিশনারি কাগজের কথা আপাতত তোলা থাক। আমরা বরং কলকাতার খাস সাহেবী কাগজ 'জন বুলে'র মতামতের দিকে একটু নজর দিই। বলে রাখা ভাল, সতীপ্রথার ঘোর বিরোধী এই পত্রিকাটি আইন করে এ-প্রথা রদের উৎসাহী সমর্থক না হলেও, সুযোগ পেলেই এই বীভৎস প্রথাকে আক্রমণ করতে কসুর করত না। ১৫. ১০ ১৮২৫-এ পত্রিকাটি সতী-বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা যে স্বেচ্ছায় সতী হতে এগিয়ে আসে, তা কলকাতার আশপাশের সতী ঘটনাগুলির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই জানা বলে মন্তব্য করে।[১২]

'জন বুলে'র সম্পাদক ম্যাকনাক্টেন গোঁয়ার-গোবিন্দ টাইপের লোক, খ্যাতির চেয়ে অখ্যাতিই তাঁর বেশি। তাঁর জাতভাই 'ক্যালকাটা লিটররি গেজেটে'র সম্পাদক ডি. এল. রিচার্ডসনের অন্যান্য অখ্যাতি থাকলেও, কবি হিসাবে কিছুটা খ্যাতি ছিল। ১৮১৮-য় বাংলাদেশে আসেন তিনি। দীর্ঘদিন ছিলেনও এদেশে, কোনো সতী-ঘটনা নিজের চোখে দেখেছিলেন কিনা জানি না—দেখাই সম্ভব। 'সতী'র ওপর একটি কবিতাও লিখেছিলেন। কবিতাটিতে

অম্লান হাসিমুখে নির্ভয়ে 'সুস্থির অন্তরে' স্বহস্তে চিতা জ্বেলে তাতে সতীর আরোহণের বর্ণনা আছে। 'ক্যালকাটা লিটররি গেজেটে' প্রকাশিত এই কবিতাটি 'বেঙ্গল হরকরা' বঙ্গানুবাদসহ পুনর্মুদ্রিত করে। ইংরেজি কাগজে ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদের প্রকাশ—ঘটনাটি বিচিত্র। বঙ্গানুবাদের প্রথম ৬ লাইন উদ্ধৃত করছি:

'স্নেহাবিষ্ট যাহা ইষ্ট ছিল অন্তকালে।
তাহা স্পষ্ট কহে সতী বান্ধব সকলে॥
বিদায় সময় হাসি অমল বদনে
ঐ দেখ দগ্ধ হয় আসন্ন মরণে॥
নির্ভয়রূপেতে সতী সুস্থির অন্তরে।
পার্থিব পতির চিতা আরোহণ করে॥'[১৩]

রিচার্ডসন কোনো সতীঘটনা দেখেছিলেন কিনা তা সংশয়ের বিষয় বলে তাঁর এ-বিষয়ক বক্তব্য হয়তো অনেকে গ্রহণযোগ্য নাও মনে করতে পারেন। কিন্তু যাঁর সম্পর্কে এরকম কোনো আপত্তি উঠবে না, হুগলির সেই নামকরা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিডে সাহেবের এ-বিষয়ক অভিজ্ঞতাটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

হুগলিতে এবং খুব সম্ভবত বাংলাদেশে শেষ 'আইনসম্মত' যে সতী ঘটনাটি ঘটে তাতে মিঃ হ্যালিডে ও ডাঃ ওয়াইজ ছাড়াও একজন ধর্মযাজক উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটিকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে হ্যালিডে তাকে শেষপর্যন্ত সতী হবার অনুমতি দেন। মহিলাটি চিতার দিকে এগোচ্ছে তখন ধর্মযাজকটির অনুরোধে হ্যালিডে তাকে শেষ একটি প্রশ্ন করলেন 'তুমি কি জানো কি ভীষণ যন্ত্রণা তুমি ভোগ করতে যাচ্ছ?' শুনে মহিলাটি হ্যালিডের পায়ের কাছে বসে পড়ে বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখে অসন্তোষের ছাপ ফুটিয়ে বলল 'একটা প্রদীপ আনুন।' তার কথা অনুযায়ী প্রদীপ এনে সেটা জ্বালানো হলে সে তার ডান হাতের কনুইটি মাটিতে রেখে আগুনে তার আঙুলটি ধরল। আঙুল ঝলসে ফোস্কা পড়ল এবং শেষে কালো হয়ে গেল, তবু তার হাত একটুও নড়ল না। তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দও বার হল না, বা মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হল না। এ-সময় মেয়েটি হ্যালিডেকে জিজ্ঞাসা করল 'আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন?'

হ্যালিডে তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে জানালেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

মেয়েটি তখন আগুন থেকে আঙুলটা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'এখন কি আমি সতী হতে পারি?' হ্যালিডে সম্মতি জানালে সে চিতার কাছে গিয়ে

দু' তিনবার তা প্রদক্ষিণ করার পরে চিতারোহণ করল। তার ওপর হালকা কিছু ডালপালা চাপানো হল, হ্যালিডের আপত্তির জন্য চিতার সঙ্গে তাকে বাঁধা হয় নি। মহিলাটির বছর ৩০-এর ছেলে চিতায় অগ্নিসংযোগ করে। অনুমরণের এই ঘটনাটিতে হ্যালিডে সাহেব চিতার খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও তিনি কোনো চিৎকার শোনেন নি, বা বিধবাটিকে নড়াচড়াও করতে দেখেন নি।[১৪]

সতীপ্রথা যে আবশ্যিক ছিল না এবং খুব সামান্য সংখ্যক মেয়েই যে সতী হত—এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু একবার সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করার পর, ভয় পেয়ে বা অন্য কারণে কেউ পেছিয়ে যেতে চাইলে, হিন্দুরা তাকে জোর করে পশুর মতো পুড়িয়ে মারে—সাহেবদের এটা একটা প্রিয় অভিযোগ। কিন্তু তাহলে মহামায়া বা বিন্ধ্যবাসিনীরা আবার ফিরে আসত কেমন করে? রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' গল্পের নায়িকা মহামায়া চিতা থেকে পালিয়ে এসেছিল। হতে পারে, চরিত্রটি পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসৃষ্ট, অথবা তিনি যদি তাঁর ছেলেবেলায় সতীর চিতা থেকে পালিয়ে আসা কোনো মেয়েকে দেখে থাকেন, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। সামনেই তো চিৎপুর, সতীস্থান হিসাবে চিৎপুরের খ্যাতির কথা বলে এসেছি। কাজেই এ ধরনের কোনো গল্পকাহিনী ঠাকুরবাড়ির মা-মাসিদের মুখে শুনে থাকা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব। গল্পের কথা ছেড়ে আমরা যদি বাস্তবে নেমে আসি, তাহলে অনেক মহামায়া অনেক বিন্ধ্যবাসিনীরই সাক্ষাৎ পাব। নাম-না-জানা প্রয়াগের সেই মেয়েটির কথাই ধরি।

৭. ১২. ১৮২৮-এ প্রয়াগের এক বেনিয়া মারা গেলে তার ২৫ বছরের স্ত্রী সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ম্যাজিস্ট্রেট মেয়েটিকে ডেকে পাঠান এবং সবরকমভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত মেয়েটি হয়তো তার সঙ্কল্প পালটাতে পারে এই আশা নিয়ে, এবং নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি পরের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠান স্থগিত রাখেন।

পরের দিন মেয়েটির মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, দু'মাইল পথ স্বচ্ছন্দে সে হেঁটে গেল— মুখ তার প্রশান্ত ভাবগম্ভীর। তার মনে উন্মাদনা আনার মতো কোনো কিছুই রাখা হয় নি— না কোনো বাজনা, না কোনো গান, না বিলানো হয় কোনো অর্থ। সারা পথ নিঃশব্দে সে অতিক্রম করে।

ঘাটে পৌঁছে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সব সারা হল। চিতায় ঘি, রজন ও

অন্যান্য দাহ্যপদার্থ দেওয়াও নিষিদ্ধ হল। সব প্রস্তুত হবার পর মহিলাটি আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রথামতো উপহার দিল। চান করে নতুন পোষাক পরল, এবং তারপর কয়েকহাজার চোখের সামনে নিজের হাতে চিতা জ্বেলে তাতে ঝাঁপ দিল। একমুহূর্ত চিতায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সে বলল, 'রামসৎ-রামসৎ'—স্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে একটু বসে সে চিতার ওপর শুয়ে পড়ল।

কিন্তু আগুন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাব হাত-পা কাঁপতে লাগল। খুব যন্ত্রণা হতে লাগল তার। শেষপর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে চিতার অন্যপ্রান্তে চলে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। তুলে আনার পর সে আবার চিতায় উঠতে চাইল। কিন্তু তার অনুরোধে কান না দিয়ে তাকে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তার আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যরা ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ কবে।

মেয়েটি এখন ভালোই আছে, কিন্তু তার পা, বাঁ হাত, ঘাড়-মুখ এমন বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে যে তার দিকে তাকানো যায় না, মেয়েটির আত্মীয়রাই এখন তার দেখাশোনা কবছে। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপেব জন্য মেয়েটি বারবার তাঁর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১৫] চিতা পর্যন্তও অনেকে উঠত না, তার আগেই ফিরে আসত। যেমনটি এসেছিল বাঁশবেড়িয়ার জানকী।

জানকী তার স্বামী লালচাঁদ সাঁই-এর মৃত্যুর পর ৯ ১১ ১৮২৩-এ নদীতীরে সহমৃতা হতে যান। বয়স তাঁব ৬০। খবর পৌঁছল ব্যাণ্ডেলের ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের কেরানী মিঃ গডিমোর কানে। তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখেন, সহমরণের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। থানার বরকন্দাজ, ফাঁড়িদার আর কিছু দর্শকও উপস্থিত, বিধবাটিও প্রস্তুত। মিঃ গডিমো এগিয়ে বিধবাটির কাছে গিয়ে সতী হবার নিরর্থকতার কথা বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। জোর দিয়ে বললেন, 'সতী আপনি হবেন না, কেন কিসের জন্য এই অমানুষিক যন্ত্রণা আপনি ভোগ করবেন।' তাঁর জেদ দেখে ও মনে-মনে অনেক চিন্তাভাবনা করে জানকী সতী হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। সতী না হয়ে সে রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন।[১৬]

অবিচল নিষ্ঠায় সবরকম প্রলোভন, অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা কবে, সন্তানের মুখের দিকে না তাকিয়ে অনেক মেয়ে যেমন সতী হয়েছে, ঠিক তেমনি অনেকে শেষমুহূর্তে পেছিয়ে আসত, ভয় পেত, বাঁচার চেষ্টা করত। দেবীত্বের খোলসটাকে টান মেরে খুলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসত একটি মেয়ে—বাঁচতে

চায় সে, বাঁচতও সে। মুর্শিদাবাদের কমল দেবীর কথাই বলি। বয়স তাঁর ৬৫। স্বামীর মৃত্যুর পর ২. ১০. ১৮২১-এ তিনি ঘোষণা করলেন, সতী হবেন তিনি। রাতারাতি হয়ে উঠলেন রূপকথার নায়িকা। তাঁর পায়ের ধুলো, তাঁর আশীর্বাদ সবাই পেতে চায়। যথাসময়ে সতী হবার অনুমতি এল। ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে, দারোগাকে সব সরকারি নির্দেশাদি ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য কড়া নির্দেশ পাঠালেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দারোগা কমল দেবীর সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু কমল দেবীর সেই এক কথা। দারোগা হিন্দু-সন্তান। তিনি বললেন 'সতী আপনি হোন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তাব আগে আপনাকে আগুনে আঙুল ধরে দেখাতে হবে অগ্নিদগ্ধ হবার যন্ত্রণা সহ্য কবতে আপনি সক্ষম।'

সতীর কাছে এ তো কিছুই নয়! প্রদীপ আনা হল, সবার মনে কৌতূহল। আঙুল মেলে ধরলেন কমল দেবী। কিন্তু একি! তাঁব মুখ কুঞ্চিত হচ্ছে কেন? কেন যন্ত্রণাবিকৃতমুখে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন তিনি, একি. আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেয়ে আঙুল সরিয়ে নিচ্ছেন যে তিনি। না, সতী তিনি হবেন না।[১৭]

কমল দেবীই একমাত্র মহিলা নন, আরো বহু মহিলা সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেও মত পালটেছেন, কেউ শেষমুহূর্তে অস্বীকার করেছেন চিতায় উঠতে, কেউ প্রাণভয়ে জ্বলন্ত চিতা থেকে লাফিয়ে পড়েছেন, আবার কেউ-বা পুলিশ ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ-উপরোধে ঘরে ফিরেছেন। ১৮২১-এ সতী হতে এসেও ৯টি মেয়ে শেষপর্যন্ত সতী হয় নি।[১৮] ১৮২২-এও ২২টি মেয়েকে নানাভাবে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮২৫-এ পুলিস ও আত্মীয়স্বজনদের হস্তক্ষেপে ১৯টি মেয়ের সতী হওয়া হয় নি। ১৮২৬-এও ২৪/২৫টি মেয়ে সতী হতে এসেও শেষপর্যন্ত ঘরে ফিরে যায়।

যেসব মেয়ে ঘরে ফিরে যেত, তাদের কি আত্মীয়স্বজন গ্রহণ করত? সন্দেহ নেই, সতী হতে গিয়ে যে মেয়ে ফিরে আসত, লোকের চোখে তার আসন বেশ কিছুটা নেমে যেত। লোকলাঞ্ছনাও তাকে মর্মে-মর্মে অনুভব করতে হত। কিন্তু তাই বলে নিতান্ত হৃদয়হীন না হলে আত্মীয়স্বজনরা তাকে পরিত্যাগ করত না। শাস্ত্রমতেও এইসব মেয়েদের পুনর্গৃহীত হতে কোনো বাধা ছিল না। ১৯.১১.১৮২১-এ বীরভূমের কসবায় নবকুমার চক্রবর্তীর স্ত্রী কিশোরী দেবী চিতারোহণের পর আগুনের স্পর্শ অনুভব করে ভয় পেয়ে সঙ্কল্প পাল্টালে তার

আত্মীয়রা তাকে দেখাশোনা করার ভার নেয়, যদিও তারা মনে করত এর ফলে সে জাতিচ্যুত হয়েছে।[১৯] ১৮২৪-এ বুন্দেলখণ্ডে মহারাজ্ঞী নামে একটি মেয়ে চিতারোহণের পর প্রাণভয়ে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়লে আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়।[২০] দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে ইতস্তত করলে অনেকসময় সরকারপক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট লোকজনদের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হত।

১৮১৩ থেকে সতী সম্পর্কে সরকার কিছু বিধিনিষেধ জারি করেন, এবং ১৮১৫ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটরা তাঁদের এলাকার সতীর বাৎসরিক রিপোর্ট দাখিল করতে থাকেন—তা আগেই বলেছি। এই সময় থেকে পুলিশকে প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছায় শাস্ত্রানুসারে মেয়েটি সতী হচ্ছে কিনা দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ধরে নিতে পারি, দু'চারজন পুলিশ হয়তো অসাধু ছিলেন, পয়সা খেয়ে চোখের সামনে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে দেখেও তাঁরা হয়তো চুপচাপ থাকতেন। বাংলার পুলিশ সুপার ডাবলিউ. এওয়ার তো বলেইছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দারোগারা শব পচে বীভৎস হয়ে ওঠার আগে ঘটনাস্থলে হাজির হবার জন্য, অথবা বেআইনী কোনো সহমরণের অনুমতি দেবার জন্য ঘুষ খায়।[২১] ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য কোনো-কোনো অফিসার হয়তো এইসব অনুষ্ঠানে নীরব দর্শকের ভূমিকাও পালন করতেন। ১৮২১-এ এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে গোরক্ষপুরে। শহরের কোতয়ালি থানায় ২২.৭.১৮২১-এ বসন্তিয়া নামে বছর ৫০-এর এক ব্রাহ্মণী সতী হবার জন্য চিতায় ওঠার পর দুবার লাফিয়ে পড়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু দুবারই তার আত্মীয়স্বজন—যারা চিতার চারপাশে ছিল তাকে ধরে এনে জোর করে চিতায় তোলে এবং তাকে সতী হতে বাধ্য করে। শহরের কোতয়ালের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে। অন্যান্যদের সঙ্গে তাই তাকেও বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়।[২২]

কিন্তু পুলিশের চোখের সামনে বলপ্রয়োগ করার মতো বুকের পাটা থাকাও চাট্টিখানি কথা নয়। পুলিশের উপস্থিতি অনেকক্ষেত্রে যে শাস্ত্র মেনে চলতে বাধ্য করেছে, একথা মিঃ এওয়ারকেও স্বীকার করতে হয়েছে। যথাসময়ে খবর পেলে অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথা নিবারণে পুলিশ যথোচিত ভূমিকা নিতে পারে বলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন মনে করতেন। তাছাড়া ভয় তো পুলিশেরও ছিল। ওপরওয়ালা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কানে যদি কোনোক্রমে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ পৌঁছয়, তাহলে সাধের চাকরি তো

যাবেই, কোর্টে অভিযুক্ত হয়ে দোষী সাব্যস্ত হলে জরিমানার টাকা যোগাড় করতে ভিটে-মাটি বেচতে হবে। বেত্রাঘাতের ভয়ও ছিল।

এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও ১৮২২-এ যে ৫৮৩ জন সতী হয়, তাদের একজনের ওপরও বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল, এমন কোনো তথ্য পুলিশ-রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় না। এই বছর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশের উপস্থিতিতে মেয়েরা স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে। হুগলির ৭৯টির মধ্যে ৭৭টি সতীর ক্ষেত্রে এবং নদীয়ায় সবকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ উপস্থিত ছিল। কোনো-কোনো জেলার লোকেরা অবশ্য এ-ব্যাপারে পুলিশি হস্তক্ষেপ মোটেই পছন্দ করত না। পুলিশে খবরও সেজন্য তারা বড একটা দিত না, বা দিলেও ঘটনা শেষ হবার পর দিত। বেনারস বিভাগের গাজিপুর ও পাটনা বিভাগের শাহাবাদের নাম এই প্রসঙ্গে মনে আসে। শাহাবাদে ১৮১৮-য় ২৫টি সতীর মধ্যে ২৩টি ক্ষেত্রে পুলিশে খবর না দিয়ে মেয়েরা সতী হয় (১টি ক্ষেত্রে খবর দিলেও পুলিশ আসার আগেই মেয়েটি সতী হয়)। এজন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৫ জন গ্রামপ্রধানকে ১৫ ঘা, ২ জনকে ২০ ঘা ও ২ জনকে ২৫ ঘা করে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। এছাডা ১ জনকে অর্থদণ্ড ও ২ জনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঘটনার খবর পুলিশকে সময়মতো না দেওয়ায় ১০টি ক্ষেত্রে সতীব আত্মীয়দের কারাদণ্ড (১-৩ মাস) দেওয়া হয়। শাস্তি এডাতে কেউ-কেউ গা ঢাকাও দেয়। সময়মতো পুলিশে খবর না দেওয়ার জন্য সতীর আত্মীয়দের শাস্তিদানের ব্যাপারটা নিজামৎ আদালত ভালোচোখে দেখেনি। কারণ এ সম্পর্কে ধরাবাঁধা কোনো আইন নেই। এই কাজের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবাবদিহিও চাওয়া হয়।[২৩] এত কঠোরতা অবলম্বন করেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। তাই দেখতে পাই, ১৮২২-এ শাহাবাদে ৩৬টির মধ্যে মাত্র ১টি ক্ষেত্রে পুলিশকে যথাসময়ে জানানো হয়। গাজিপুরের অবস্থা অবশ্য এরচেয়ে ভাল। এখানে এ-বছরে অনুষ্ঠিত ৪৭টি সতী ঘটনার মধ্যে ১০টি ক্ষেত্রে পুলিশকে সময়মতো জানানো হয়। গাজিপুর, গোরক্ষপুর ও শাহাবাদ এই ৩টি জেলায় প্রতিবছর যেমন কিছু মেয়ে পুলিশকে না জানিয়ে সতী হত, ঠিক তেমনি প্রতিবছরই কিছু মেয়ে শেষপর্যন্ত পেছিয়ে আসত। ১৮২৪-২৬—এই ৩ বছরে এই ৩টি জেলায় ৫৫টি মেয়েকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা হয়, অথবা তারা নিজেরাই ভয় পেয়ে শেষমুহূর্তে পেছিয়ে আসে।

পুলিশি রিপোর্টে উল্লেখ করা না হলেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ

করা হয়—এমন সন্দেহের অবকাশ আছে। ৩০.১০.১৮২২-এ গাজিপুরের সেকেন্দরপুর থানায় ক্ষীরী নামে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধাকে পুলিশ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু পুলিশ চলে যাবার পর সে সতী হয়।[২৪] স্বেচ্ছায় সে সতী হয়েছিল, অথবা পুলিশ চলে যাবার পর তাকে সতী হতে বাধ্য করা হয়েছিল বলা শক্ত।

গাজিপুরেরই বেওতি থানায় ভোজাগুণ নামে ৮০ বছরের এক মহিলা তার স্বামী মারা যাবার ২৫ বছর পরে ১১ ৪.১৮২২-এ অনুমৃতা হতে চাইলে পুলিশি হস্তক্ষেপে সে রক্ষা পায়, কিন্তু এই ঘটনার আধঘণ্টা পরেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি সম্পর্কে নিজামৎ মন্তব্য করে 'The fact cannot but excite some suspicion as to the mode by which her dissolution was effected.'[২৫] দু'চারজন অসৎ পুলিশ কর্মচারী কিছু টাকা পকেটে পুরে বলপ্রয়োগে কাউকে সতী করা হচ্ছে দেখেও হয়তো মুখ বুজে থাকতেন, আবার সবরকম প্রলোভন জয় করে অনেকে ধীরভাবে নিজের কর্তব্যপালন করতেন। করে অনেকসময় বিপদেও পড়তেন।

দিনাজপুরের পীরগঞ্জ থানার দারোগার কথাই বলি। তাঁর এলাকায় ২৮ আষাঢ়, ১২২৪-এ অনিরুদ্ধ নাপিত মারা গেলে তার স্ত্রী মহেশ্বরী, অনেক বোঝানোর পরও সতী হবার সঙ্কল্পে অটুট রইল। চিতায় ওঠার পর আগুন তাকে গ্রাস করলে, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে ওঠে। দারোগা ও অন্যান্য দর্শকরা তখন তাকে উদ্ধার করে। অবশ্য তারমধ্যেই বিশ্রীভাবে সে পুড়ে গেছে। দারোগা মহেশ্বরীকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য নিজের প্রভাববিস্তার করেছিলেন কিনা, তা জানার জন্য তাঁর ওপর কোর্ট থেকে সমনজারি করা হয়। মহেশ্বরীও তার সেবাযত্নের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হয়। দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে সে, 'ঐ, ঐ লোকটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে চিতা থেকে টেনে নামিয়েছে। আমি যখন 'হরিবোল' 'রামবোল' ধ্বনি দিচ্ছিলাম, তখনই ও এই কাণ্ড করে। হুজুর, ওর জন্য আমায় এখন জাত খোয়াতে হয়েছে।'

বিষয়টি সম্পর্কে কোর্টের পণ্ডিতদের মতামত চাওয়া হলে তারা বলেন, মহেশ্বরীকে পুনরায় জাতে গ্রহণ করা চলবে। তার জাতভাইরা প্রথমে এ ব্যাপারে গাইগুঁই করলেও পরে পণ্ডিতদের কথা মেনে নেয়। মেয়েটি এখন বৈরাগিনী হয়েছে, দিন তার ভালোই কাটছে।[২৬]

ভাবুন তো একবার পীরগঞ্জের দারোগার কথা। একদিকে সরকার তাকে বলছে, নিশ্চয়ই তুমি মেয়েটাকে ভালো করে বোঝাও নি, আর যাকে তিনি বাঁচালেন সে বলছে, জোর করে ঐ লোকটা আমাকে বাঁচিয়েছে! একেই বলে জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ!

অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক, পুলিশ কিন্তু হাল ছাড়ত না। পুলিশি হস্তক্ষেপে প্রতিবছরই কয়েকটি প্রাণ রক্ষা পেত তা দেখে এসেছি, কিন্তু সময়মতো খবর না পাওয়ায় সবক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হত না। ঘটনাটি লক্ষ্য করে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, এবং ১৮২৪-এ সতী হবার আগে আত্মীয়স্বজনকে ব্যাপারটা থানায় জানাতে বলা হয়। এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, পুলিশ আসার আগে কেউ যেন সতী না হয়, এবং এ নির্দেশ পালন না করলে এ-বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের জরিমানা বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মেয়েটির বয়স ১৫ বছর পূর্ণ না হলে অভিযুক্তদের কোর্ট অব সার্কিটে চালান দেওয়া হবে। সতীর আত্মীয়দের যথাসময়ে পুলিশে খবর দিতে (না দিলে জেল/জরিমানা হতে পারে) ও পুলিশকেও এ বিষয়ে খবরাখবর সংগ্রহে তৎপর হতে বলা হয়।

এর ফল কতখানি হয়েছিল জানতে হলে ১৮২৪, ১৮২৫ এই দু'বছরে কয়েকটি জেলার সতীসংখ্যা ও পুলিশের উপস্থিতি একনজরে দেখে নেওয়া দরকার:

১৮২৪-এ মোট সতীসংখ্যা-৫৭২

জেলা	মোট সতীসংখ্যা	পুলিশের উপস্থিতি
যশোর	৩০	২৯
মেদিনীপুর	২২	২০
নদীয়া	৭৩	৭৩
কলকাতা শহরতলী	৩৪	৩৪
২৪ পরগণা	২২	২০
কটক	১১	৯
ঢাকা	২৩	২১
মুর্শিদাবাদ	৮	৭
রামগড়	১০	৩
সারন	১২	১১
শাহাবাদ	১৮	২
বেনারস	১৬	১৬
গাজিপুর	৩৩	৫
গোরক্ষপুর	১৭	০
মির্জাপুর	৬	৫
১৫টি জেলা	৩৩৫	২৫৫

১৮২৫-এ মোট সতীসংখ্যা-৬৩৯

জেলা	মোট সতীসংখ্যা	পুলিশের উপস্থিতি
বর্ধমান	৬৩	৬৩
হুগলি	১০৪	১০২
জঙ্গলমহল	৯	৯
মেদিনীপুর	২২	২০
নদীয়া	৬০	৬০
কলকাতা শহরতলী	৪৮	৪৮
বারাসত	২০	২০
কটক	১৪	১৩
খুরদা	১৬	১৫
বীবভূম	৯	৮
শাহাবাদ	২০	১
পাটনা	২	২
গোরক্ষপুব	৯	০
এলাহাবাদ	২	২
বেনারস	১৭	১৭
মির্জাপুর	৯	৭
১৬টি জেলা	৪৩৩	৩৯১

দেখাই যাচ্ছে, ১৮২৪-এর তুলনায় ১৮২৫-এ সতী ঘটনাগুলিতে পুলিশের উপস্থিতির হার অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৮২৬-এও যে ৫১৮টি মেয়ে সতী হয়, তার ৪৩২টির ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত ছিল। ৮৩টি ক্ষেত্রে (এর মধ্যে গাজিপুরে ১৮টি, শাহাবাদে ২১টি, গোরক্ষপুরে ২২টি) পুলিশকে খবর না দিয়ে বা পুলিশ আসার আগেই মেয়েরা সতী হয়। ৩টি ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত ছিল কিনা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। গাজিপুর, শাহাবাদ ও গোরক্ষপুর—এই ৩টি জেলার কথা বাদ দিলে অন্যত্র সতী ঘটনাগুলির শতকরা ৯৬টিরও বেশি ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত থাকত, এবং যেসব ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত থাকত, সেসব ক্ষেত্রে মেয়েদের ওপর বলপ্রয়োগের প্রায় কোনো অবকাশই থাকত না। স্বেচ্ছায় অবিকৃত মুখে চিতায় উঠে মেয়েরা মৃত্যুকে বরণ করত।

কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের তৎপরতা অনেকের সাধুবাদ কুড়োত। চিৎপুর থানার এক দারোগার কথাই বলি।

১৮২৮-এর মার্চ মাসের শেষদিকে চিৎপুর ঘাটে একটি মেয়ে সতী হবে শুনে 'ফিলানথে_াপস' ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করেন। থানার সামনে এসে দেখেন, বিরাট এক জনতা। কি ব্যাপার, না, সতী আগুনের তাপে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। শুনে তিনি গাড়ি থেকে নেমে থানায় গেলে দারোগা তাঁকে জানালেন, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশানুযায়ী শাস্ত্রানুসারে যাতে মেয়েটি সতী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে, তিনি মেয়েটি চিতায় ওঠার আগেই তাতে অগ্নিসংযোগ করেন। ফলে মেয়েটিকে চিতার সঙ্গে বাঁধা সম্ভব হয় নি। চিতায় ওঠার পর মেয়েটির গায়ে আগুন লাগার সঙ্গে-সঙ্গে সে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ে। দারোগা তখন তাকে বাঁচাবার জন্য থানায় নিয়ে আসেন।

থানায় মেয়েটি বসে, তার মুখের একপাশ আর পিঠের কিছুটা পুড়ে গেছে। তাকে তার সতী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কপালে হাত দিয়ে মেয়েটি বলে, 'আমার ভাগ্য'। ফিরে গিয়ে সতী হবার ইচ্ছে তার নেই। ভবিষ্যতে সে কি করবে জানতে চাইলে সে জানায়, তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হোক, বাড়ির লোক যদি তাকে না-ও নেয়, তাহলেও নিজের দিন চলবার মতো সম্পত্তি তার ঢের আছে। তার ঘরে ফেরার আশা সুদূরপরাহত। তার এরকম আচরণে তার পরিবার লোকচক্ষে হেয় হয়েছে, এর ওপর তাকে ফিরিয়ে নিলে আরও হবে। পরদিন সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, মনে হয় শীঘ্রই সে সেরে উঠবে। পত্রলেখক সবক্ষেত্রে দেশীয় পুলিশরা এরকম সতর্ক হলে সতীপ্রথা একরকম লোপ পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।[২৭]

ঘটনাটি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'বেঙ্গল ক্রনিকল' বলে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুলিশ-দারোগারা যদি এই ঘটনাটির মতো নিষ্ঠাভরে নিজেদের কর্তব্যপালন করেন, তাহলে অনেক মর্মান্তিক ঘটনাই ঘটতে পারবে না। সতীর গোঁড়া সমর্থকেরও এ-ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু থাকবে না। অবশ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করলে এ-প্রথা কোনোকালে লোপ পাবে না—তাও বলতে সম্পাদক ভোলেন নি।[২৮]

২৫. ৩. ১৮২৮-এ 'এ ফ্রেণ্ড টু দি ফিমেল রেস' স্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি 'ক্রনিকলে' এক চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট থানার দারোগাকে সরকারের পুরস্কৃত করা

উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। দারোগাদের উৎসাহিত করার জন্য কোনো দারোগা কোনো সতীকে রক্ষা করলে তাকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাবও চিঠিটিতে করা হয়।

সরকার চিৎপুরের দারোগাকে পুরস্কৃত করেছিলেন কিনা, অথবা তাঁর কোনোরকম পদোন্নতি হয়েছিল কিনা জানি না। তবে সাধারণ মানুষ এ-ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন। 'MILES' নামান্তরালে এক ব্যক্তি দারোগার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদকের কাছে একটি ড্রাফট পাঠিয়ে তার অর্ধাংশ দারোগাকে এবং সাহায্যের প্রয়োজন হলে বাকি অর্ধাংশ রক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েটিকে দেবার প্রস্তাব করেন। মেয়েটির সাহায্যের প্রয়োজন না হলে ড্রাফটের সবটাই দারোগাবাবুকে দেবার জন্য তিনি সম্পাদককে অনুরোধ করেন।[২৯]

যেসব জায়গায় পুলিশ উপস্থিত থাকত না, সেখানে সর্বত্র মেয়েদের বলপ্রয়োগে সতী করা হত, মনে করার কোনো কারণ নেই। পুলিশ আসার আগেই খবর পাওয়ামাত্র মিশনরিরা সেখানে চলে যেতেন। হিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার—বিশেষ করে অমানবিক সতীপ্রথা ছিল মিশনরিদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এদেশে আসার পর থেকেই কোথাও কেউ সতী হচ্ছে শুনলেই তাঁরা সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মেয়েটিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। সফল অবশ্য তাঁরা খুব কমক্ষেত্রেই হতেন। ডাঃ টমাস এদেশে আসার পর ৩০.৮.১৭৮৯-এ বালিতে বছর ৫০-এর সতী হতে উদ্যত এক রমণীকে নিবৃত্ত করার প্রচুর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ডাঃ টমাস মহিলাটির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, 'এটা মহাপাপ—তোমার নিজের এবং ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা কর - করুণা কর।' মহিলাটি স্বর্গের দিকে এবং নিজের কপালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে 'সবই এখানে লেখা আছে, সতী আমাকে হতেই হবে, ফেরার কোনো উপায় নেই।'[৩০] ১৭৯৯-এ উইলিয়ম কেরীও একটি মেয়েকে সতী হওয়া থেকে অনেক বুঝিয়েও নিবৃত্ত করতে পারেন নি। ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে ১০.৮ ১৮০০-এ আর একটি সতী-ঘটনার কথা লিখেছেন, এখানেও কেরী মেয়েটিকে ফেরাতে ব্যর্থ হন।[৩১] পেগসের ব্যর্থতার কথা আগেই বলেছি। শুধু মিশনরিরাই নয়, অনেকসময় ইউরোপীয় ভদ্রলোকরাও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনোভাবেই যাতে মেয়েটির ওপর বলপ্রয়োগ করা না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের প্রয়াস মাঝে-মাঝে ডিটেকটিভ

গল্পের মতো রোমাঞ্চকর হয়ে উঠত। অনেকক্ষেত্রে সাদা চামড়ার মানুষরা সতী সম্পর্কিত শাস্ত্রবিধি মেনে চলার উত্তেজনায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সতীর আত্মীয়-বন্ধুদের মারধোর পর্যন্ত করত।[৩২] গ্রামবাসীরাও অনেকসময় মেয়েদের সতী হতে দিত না। ১৮১৭-এ কাটোয়ার গদাধর মণ্ডলের স্ত্রী খুদীকে (৪০) গ্রামবাসীরা তার অনেকগুলি শিশুসন্তান আছে বলে বুঝিয়ে পুলিশ আসার আগেই নিবৃত্ত করে।[৩৩] এই বছরই গ্রামবাসীদের সাহায্যে শাহাবাদে পুলিশ একটি মেয়েকে ফিরিয়ে আনে।

এত শত বাধা সত্ত্বেও কেউ যদি মনে করেন, শতকরা ৯৯টি মেয়েকেই 'জোর করে' পুড়িয়ে মারা হত, তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু সতীপ্রথার বীভৎস রূপ যিনি হাড়ে-হাড়ে জানেন, বলপ্রয়োগে কাউকে সতী করার পর সেসব মামলার বিচার যিনি করেন, এমন মানুষও যদি সতীর অতুলনীয় স্থৈর্যের কথা বলেন—তাহলে ?

ডাবলিউ. ডোরিন নিজামং আদালতের এমনই এক বিচারপতি। একাধিক সতী মামলার সুচিন্তিত রায় তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সতী হতে কখনো-সখনো বিধবার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগও করা হয়—একথা তিনি জানতেন। এসব জেনেও তিনি বলেছেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধবার সঙ্কল্প মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এবং তাকে যদি সতী হতে দেওয়া না হয়, তাহলে অন্য কোনোভাবে সে আত্মহত্যা করবে :

'But there are also some in which, it is evident that the determination of the widow is beyond human control, and that if she were prevented from burning with her husband's body, she would commit suicide in some other form'.[৩৪]

তাঁর কথা কতখানি সত্য তার প্রমাণ দু'একটা ঘটনার দিকে তাকালেই মিলবে।

১২ অগস্ট, ১৮২৫-এ রংপুরের কমিশনার মিঃ স্কট মুর্শিদাবাদের কোর্ট অব সার্কিটে একটি চিঠি লিখে জানান, গত ২৪.৫.১৮২৪-এ কান্তিশ্রী নামে একটি ২১ বছরের মেয়েকে ১৬ ক্রোশ দূরের থানার দারোগার কাছ থেকে সময়মত সতী হবার অনুমতিপত্র না আসার জন্য তার আত্মীয়স্বজন ও গ্রাম-বাসীরা সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। কান্তিশ্রী ধজুক্ষরের স্ত্রী, বয়সের ব্যবধান তাদের মধ্যে ৩৯ বছরের। সহমৃতা হতে না পারলেও, ধজুক্ষরকে দাহ করার দুদিন পরে কান্তিশ্রী এক কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে।[৩৫]

অনেকসময় সতী হবার সুযোগ না পেলে মেয়েরা উপবাসী থেকে তা আদায় করত। বেরিলি বিভাগের মহাকুঁয়ারের কথাই বলি। জাঠ মহিলা তিনি। ৩ মেয়ে, ১ ছেলে তাঁর। তাঁর স্বামী পুর্সা জাঠ যেদিন মারা যান, সেদিনই তিনি সতী হবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর দেওর বাড়িতে তাঁকে বন্ধ করে রেখে শবদাহ করে আসে। ঐদিন থেকে মহাকুঁয়ার অন্নজল ত্যাগ করেন। দিন দশেক এভাবে কাটার পরও নিজের সঙ্কল্পে অবিচলিত থেকে শাশুড়িকে ডেকে একদিন তিনি বললেন, 'আমাকে যদি সতী হওয়ার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে চরিত্রে আমার কলঙ্ক রটবে, আর তাই আপনার সামনেই আমি আত্মঘাতী হব।' অবস্থা দেখে তাঁর পরিজনরা তাঁকে সতী হবার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। নিজের হাতে চিতা জ্বেলে স্বামীর কাপড়-চোপড় ও মালা নিয়ে তিনি আত্মবিসর্জন দিলেন।[৩৬]

বক্তব্য আমাদের একটাই, এবং তা খুব স্পষ্ট। সতীপ্রথা বীভৎস, অমানবিক। দু'চারটি মেয়েকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে সতী করা হলেও, অধিকাংশ মেয়েই সতী হত স্বেচ্ছায় – বলপ্রয়োগের কোনো প্রশ্নই উঠত না। এবং সেইকারণে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি শতকরা ৯৯টি মেয়ে সতী হত স্বেচ্ছায়, একটির ক্ষেত্রে হয়তো বলপ্রয়োগ করা হত। এই সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর তাই উইলিয়ম ওয়ার্ডের মতো সতীপ্রথার নির্মম সমালোচক, নামকরা হিন্দুবিদ্বেষীও সতীর অবিচল দৃঢ়তা দেখে চমকে উঠেছেন, এবং অজ্ঞাতসারেই হয়তো তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে গেছে :

'The desire of Hindoo women to die with their husbands ; and the calmness of many in going through the ceremonies which precede this terrible death, are circumstances almost, if not altogether unparrelled'.[৩৭]

সতী-ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আর এক সাহেব পরবর্তীকালে প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন :

'but with rare exception, the suttee is a voluntary victim, Resolute, undismayed, confident in her own inspiration.'[৩৮]

সতী অধিকাংশ মেয়ে স্বেচ্ছায় অবিচলিতভাবে হত—একথা মেনে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঠবে উদ্যত হয়ে, কেন, কিসের জন্য যুগে-যুগে দলে-দলে মেয়ে জ্বলন্ত চিতায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে—কেন, কেন, কেন ?

৮। কেন মেয়েরা সতী হত?

মাত্র ২৭ বছর বয়সেই কপাল পুড়ল ইন্দ্রানীর। ২৬ এপ্রিল, ১৮২৩-এ তার স্বামী বালেশ্বরের দিগম্বর মিশির মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। স্বামীশোকে পাগলের মতো হয়ে ইন্দ্রানী ঘোষণা করল, সতী হবে সে। সংশ্লিষ্ট সোরা-চূড়ামণ থানার দারোগাবাবু খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন, নানা যুক্তি দেখিয়ে ইন্দ্রানীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টাও করলেন। খুব শান্তভাবে প্রসন্নমুখে ইন্দ্রানী তাঁকে বলল, 'আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে যাচ্ছি, আমার কল্পনায় তিনি এখনও জীবিত। স্বামীর মৃত্যুতে চারধার আমি শূন্য দেখছি, নিজেকেও মৃত মনে করছি—আর সেজন্যই আমি চলেছি সতী হতে। এরফলে আমি আমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাব—আর শাস্ত্রমতেই সতী হওয়ার জন্য আত্মহত্যার পাপও আমাকে স্পর্শ করবে না।'[১]

ইন্দ্রানীই একমাত্র মেয়ে নয়, আরও অনেক মেয়েই স্বামীর মৃত্যুতে চারিদিক শূন্য দেখত, আর স্বামীকে ভালোবেসে তার প্রেমকে মূল্য দিতে তারা চিতায় গিয়ে উঠত। আজকের দিনে যতই অর্থহীন শোনাক, আমরা কিন্তু বলব, অধিকাংশ মেয়েই সতী হত প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির জন্য।*

পুরীর নাম-না-জানা সেই মেয়েটির কথা বলি। ১৮২৪-এর জুন মাসে কাছাকাছি এলাকার একটি মেয়ে সতী হচ্ছে শুনে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তার মন ফেরাতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মেয়েটি বলে, 'আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসতাম, তাই তার সঙ্গে সহমৃতা আমি হবই।'[২]

---

* আষাঢ় ১২৮৪-তে বঙ্গদর্শনে 'সতীদাহ' নামক একটি প্রবন্ধে লেখক ভালোবাসাকে সহমরণের কারণ বলে বিবেচনা করতে রাজি হন নি। কারণ 'হিন্দুললনার ধর্ম পতিভক্তি পতিপ্রেম নহে। হিন্দুসমাজ হিন্দুললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী দেবতা তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে···তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে এ শিক্ষা হিন্দুসমাজের নহে।' তাঁর এই উদ্ভট মতের প্রতিবাদ করেন শ্রী ন. না কার্তিক, ১২৮৪-র বঙ্গদর্শনে।

প্রায় একই উত্তর পেয়েছিলেন মেজর-জেনারেল স্লীম্যান। জাঁদরেল লোক তিনি, দুর্ধর্ষ ঠগীদের একাই প্রায় ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন। এহেন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিটিকেও কিন্তু হার মানতে হয়েছিল নর্মদাতীরে গোপালপুর গ্রামের এক ৬৫ বছরের বৃদ্ধার কাছে।

কোনোভাবেই সতী হবার অনুমতি না পেয়ে মহিলাটি নদীতীর থেকে বাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করে সেখানেই উপোস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর অনমনীয় সঙ্কল্পের কথা শুনে ২৮ নভেম্বর, ১৮২৯-এ ১০ মাইল পথ ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে স্লীম্যান দেখেন, মহিলাটি মাথায় ধ্বজা বেঁধে, সামনের পেতলের থালায় কিছু চাল আর ফুল, আর দু'হাতে দুটো নারকেল নিয়ে বসে আছেন। খুব সংযতভাবে স্লীম্যানকে তিনি বললেন, তিনি তাঁর স্বামীর দেহাবশেষের সঙ্গে নিজের দেহকে মেশাতে আগ্রহী এবং আমার অনুমতির জন্য তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। নর্মদার বুকে উদীয়মান রক্তবর্ণ সুন্দর সূর্যের পানে চেয়ে শান্তমনে তিনি বললেন, 'আমার আত্মা ৫ দিন ধরে ঐ সূর্যের কাছে আমার স্বামীর সঙ্গে আছে, এখানে শুধু আমার পার্থিব দেহটাই পড়ে আছে, এবং তাও শীঘ্রই ঐ কুণ্ডে আমার স্বামীর দেহাবশেষের সঙ্গে মিশে যাবে। আমি জানি, আপনি একজন বৃদ্ধার দুঃখ আর বাড়াবেন না।'

'না, না, তা কেন?' কথা খুঁজে পেলেন না স্লীম্যান। 'আমি—আমি আপনাকে আপনার সঙ্কল্প থেকে ফেরাতে এসেছি আপনাকে বাঁচার অনুরোধ নিয়ে, আপনার বংশকে হত্যাকারীর কলঙ্কচিহ্ন থেকে মুক্ত করতে।'

'না, তারা আমাকে সতী না হবার জন্য অনেক বলেছে। আমি জানি, বাঁচতে চাইলে তারা আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। কিন্তু তাদের প্রতি আমার কর্তব্য এখন শেষ হয়েছে। এখন আমি আমার স্বামী উমেদ সিং উপাধ্যায়ের—যার সঙ্গে পূর্বে আমি তিনবার সতী হয়েছি—সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি।

অনেক বুঝিয়েও শেষপর্যন্ত হার মেনে বাধ্য হয়েছিলেন স্লীম্যান তাঁকে সতী হবার অনুমতি দিতে।

চিতায় ওঠার আগে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে মহিলাটি বলেন, 'ওগো পাঁচদিন কেন তুমি এভাবে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখলে?'[৩] কারণ তুমিই তো আমার ইহকাল-পরকাল।

স্বামী ছাড়া কে আছে এ জীবনে আমার, তিনিই আমার ইহকাল-পরকাল—হিন্দু মেয়ের এই যে জন্মার্জিত সংস্কার, মেয়েদের সতী হবার এটা একটা বড় কারণ। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী অনেক হিন্দু মেয়ে মনে করত, সুখ তো এ জীবনে মিলল না, যদি পরের জীবনে মেলে। সব যন্ত্রণা সহ্য করে আমি যদি সতী হই, তাহলে স্বর্গে অনন্তকাল স্বামীসুখ ভোগ করতে পারব। ভবিষ্যৎ সুখের এই প্রলোভনে অনেকেই হাসিমুখে সতী হত। এমন কি দাম্পত্যজীবন যাদের সুখের ছিল না, তারাও অনেকসময় সতী হত একথা আবুল ফজল তাঁর 'আকবর নামা'-য় বলে গেছেন। মেয়েরা তাদের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বয়সী স্বামীদের সঙ্গে অনন্ত স্বর্গসুখের প্রলোভনে সতী হত—একথা মিশনরি লেখকেরা সঙ্গত মনে করেন নি।[৪] মিশনরিরা স্বামীসুখ বলতে বোধহয় শুধু যৌনসুখই বুঝতেন, তার বেশি কিছু থাকতে পারে—তা তাঁদের মাথায় ঢুকত না।

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, জন্মার্জিত সংস্কার বা স্বর্গের প্রলোভনেই নয়, বংশমর্যাদা রক্ষা করতেও অনেক মেয়ে সতী হত। মা সতী হয়েছে, মেয়েও সতী হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। পুত্রবধূ শাশুড়ির পদাঙ্কানুসরণ করবে এটাই কাঙ্ক্ষিত। বংশে কেউ সতী হলে সে বংশের মর্যাদা যেত বেড়ে। অনেক হিন্দুবাড়িতে যাদের বংশে কেউ সতী হয়েছে, সেইসব সতীর হাত হলুদে রঞ্জিত করে দেওয়ালে তাদের হাতের ছাপ রেখে দেওয়া হত। বিকানীর রাজবংশে যেসব মেয়ে সতী হত, তাদের ডান হাতের তালুতে হলুদ লাগিয়ে দরজার পাশের দেওয়ালে তার ছাপ রাখা হত, পরে সেই অনুপাতে দেওয়াল কেটে তাকে চিরস্থায়ী করা হত।[৫] আর বেদনার সঙ্গে একথাও মনে রাখব, এই বংশমর্যাদা রক্ষা করতে কিছু হতভাগিনীকে সতী হবার অদৃষ্ট মেনে নিতে হত।

কেন মেয়েরা সতী হয়—এ প্রশ্ন মধ্যযুগেই অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে মেয়েদের সতী হবার ৪টি কারণ নির্দেশ করা হয়:

'A Hindoo wife who is burnt with her husband, is either actuated by motives of real affection; or she thinks it her duty to conform to custom; or she consents to avoid reproach, or else she is forced to it by her relations.'[৬]

এসব ছাড়াও রাতারাতি লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ মেয়েদের সতী হবার একটা বড় কারণ। অন্যরা আমার কথা বলুক, আমার পানে চেয়ে

দেখুক—এটা সাধারণ মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতা। অতি সাধারণ মেয়েও সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে অতি সম্ভ্রমের পাত্রী হয়ে দাঁড়াত। জীবনের প্রতি ভীরু মমতা কাটিয়ে মৃত্যুকে যখন তারা প্রশান্ত ঔদাস্যে বরণ করতে এগিয়ে যেত, সাধারণ মানুষ তখন মুগ্ধ ভক্তি-বিহ্বল। দলে দলে মানুষ আসত সতী দেখতে। ১৮২৮-এ শাহজাহানপুরে ১৫ বছরের একটি মেয়ের অনুমরণ দেখার জন্য ১০/১২ হাজার লোক জড় হয়েছিল। কোনো মেয়ে সতী হলে রাতারাতি সেখানে সতীপীঠ গড়ে উঠত, গাঁয়ের মেয়েরা সেখানে ভক্তিনিবেদন করত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এখনও দু'চারটি জীর্ণ সতীমন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি এই প্রথার কথা স্মরণ রেখে বেশ কিছু গ্রামনামেরও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন মেদিনীপুরের সতীঘাটা, ২৪ পরগণার সতীজ্বালিয়া, হুগলির সতীথান ও সতীদাহ, কোচবিহারের সতীমারি প্রভৃতি গ্রামনামের কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।[৭] সতীদের কাছে মানসিক করা হত, রোগ-ভোগ, আপদ-বিপদে তাঁদের করুণা ভিক্ষা করা হত। সতীর পরিত্যক্ত বস্ত্র, শাঁখা, সিঁদুর লোকে যত্ন করে ঘরে রাখত। সতীর নিক্ষিপ্ত চাল-কড়ি লোকে কাড়াকাড়ি করে সংগ্রহ করত। সতীর দেহাবশেষ বিবেচিত হত পরম পবিত্র জিনিস হিসাবে। সতীর শেষবাক্যকে মনে করা হত অমোঘ। সাধারণ লোকের কা কথা, রাজারাজড়ারাও সতীর শেষ বাক্যের সামনে মাথা নীচু করত। পাতিয়ালার ক্ষেত্রী রমণীটির কথাই ধরা যাক।

১৮২৭-এ তার স্বামী পাতিয়ালায় কলেরা মহামারীর শিকার হলে সে সহগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু রাজকর্মচারীরা তাকে নিবৃত্ত করে। তখন সে সরবে তাদের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করে বলে, পূর্বের চারজন্মে সে তার স্বামীর সঙ্গে সতী হয়েছে, এবং যদি তার পঞ্চমবার সতী হবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে কলেরা মহামারী দূর হবে। একথা শোনার পর রাজা স্বয়ং তাকে সতী হবার অনুমতি দেন।[৮]

পাতিয়ালার ক্ষেত্রী রমণীটির ভবিষ্যৎবাণী ফলেছিল কিনা জানি না, দু'একটি ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎবাণী আশ্চর্যভাবে ফলে যেত।[৯] ব্যাপারটা যে কাকতালীয়—তা না বললেও চলে।

সতীর আশীর্বাদ পাবার জন্য ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদাভেদ ভুলে সাধারণ মানুষ কেমন পাগলের মতো ছুটে যেত— আগে তা বলে এসেছি। দেবী হয়ে ওঠার এই মাদকতাময় প্রলোভনে শহীদ হবার লোভে অনেক মেয়েই সতী হতে এগিয়ে

যেত। অনুমরণের ঘটনাগুলির পেছনে এই মনোভাব বিশেষভাবে কাজ করত। নাহলে স্বামী মারা যাবার ১০/১৫/২০/২৫/৩০/৪০ এমনকি ৪৮ বছর পরে হঠাৎ স্বামীপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে খুঁজে-পেতে স্বামীর হুঁকো, কেউ টুপি, কেউ ধুতি-চাদর, কেউ দোয়াতদান, কেউ বালিশ-বিছানা, কেউ বটুয়ার সঙ্গে অনুমৃতা হত কেন?

কারণ আর কিছুই নয়। জীবন যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন চোখের সামনে হয়তো তারা কাউকে সতী হতে দেখেছিল। তার প্রতি লোকের সসম্ভ্রম দৃষ্টি, পায়ের ধুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি, রাতারাতি রূপকথার নায়িকা হয়ে ওঠা ইত্যাদি চোখের সামনে দেখে তারাও জীবনের অন্তিমলগ্নে ঐটুকুর জন্যই লোকের মনে চমক লাগিয়ে হাসিমুখে সতী হত।

এমন ঘটনাও অনেকসময় ঘটত—স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাটি হয়তো স্বেচ্ছাচার করে, সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে রাতারাতি সতী হয়ে দেবীর আসনে বসতে চাইত সে। যেমনটি বসেছিল জৌনপুর জেলার নিজামাবাদ থানার উদাসীয়া—তার কথা তো আমরা আগেই বলেছি।

বিধবার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চোখের সামনে দেখে অনেকে ভাবত সারাজীবন তিলে-তিলে দগ্ধে মরার চেয়ে একেবারে পুড়ে মরাই শ্রেয়। ১৩শ শতাব্দীর একটি তামিল অনুশাসনে স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকলে তার দুঃখদুর্দশার বর্ণনা দিয়ে বিধবাটি বলেছে, যারা তাকে বাঁধবে না, এবং আগুনে ফেলে মরার সুযোগ দেবে না, তারা স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করানোর পাপে লিপ্ত হবে।[১০] ১৭শ শতাব্দীর পর্যটক টাভার্নিয়ের বলেছিলেন, বৈধব্যজীবনের দুঃখদুর্দশায় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে মেয়েরা স্বামীর সহগমন করে।[১১] রামমোহন ১৮২২-এ তাঁর '*Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females*'…এ বলেন, শুধু ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের জন্যই নয়, বাঙালিসমাজে বিধবার অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা চোখের সামনে দেখে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা সবকিছু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে ভবিষ্যতে অনন্ত সুখভোগের আশায় জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়।[১২] অন্য একটি স্ত্রীলোকের মুখের কথাতেও অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে 'বিধবা হলে আমাকে মাসে দুদিন উপোস করতে হবে, দিনান্তে একমুঠো খেতে পাব, তাও ভালোমন্দ কিছুই জুটবে না। আত্মীয়রা আমাকে তাদের বোঝা মনে করবে, সবরকম অত্যাচারও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। সবাই আমাকে

সন্দেহের চোখে দেখবে, গালমন্দ করবে। আর যদি প্রলোভনে পড়ে কখনও পদস্খলন ঘটে, তাহলে আমার ইহকাল-পরকাল দুই-ই গেল। বেঁচে থাকলে এর সবকিছুই আমাকে সহ্য করতে হবে—কিন্তু যদি আমি সতী হই, তাহলে ইহলোকে আমি সম্মানিত হব, আর পরলোকে তো আমার জন্য অনন্ত সুখভোগের পথ খোলাই থাকবে।'[১৩]

বিধবা আত্মীয়ার আজীবন বোঝাবহনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার ও তার সম্পত্তি কিছু থাকলে তা গ্রাস করবার জন্য অনেকে মেয়েদের কানে সতী হবার মন্ত্র দিত। তবে এরকম ঘটনার সংখ্যা ছিল খুবই কম। যেসব বিধবা সম্পত্তির মালিক, তাদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মীয়রা নিবৃত্ত করবার সবরকম চেষ্টা করত—এলফিনস্টোন তা বলে গেছেন।[১৮] কম হলেও এধরনের ঘটনাও মাঝে-মাঝে ঘটত।

২১ অক্টোবর, ১৮২৪-এ রংপুর জেলার সদুল্লাপুর থানার দারোগার কাছে খবর পৌছল, রামলোচন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী জয়মণি দেবী (৩৫) সহমরণে যাবেন। খবর পাওয়ামাত্র তিনি থানার মোহরারকে যথাবিহিত তদন্ত করার জন্য পাঠান। থানা থেকে ঘটনাস্থল মাত্র ৪ ক্রোশ। কিন্তু সে পৌছনোর আগেই, আত্মীয়স্বজনরা চিতায় অগ্নিসংযোগ করে কাজ এগিয়ে রাখে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায়, তদন্ত করে দারোগা দেখেন রামলোচনের ৩/৪ হাজার নগদ টাকা ছাড়াও জায়গা-জমি আছে, জয়মণি দেবীই সেসবের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। সে সতী হবার পর রামলোচনের ভাইরাই হবে তার মালিক। ব্যাপার বুঝে দারোগা তাদের গ্রেপ্তার করে কোর্ট অব সার্কিটে চালান দেন।[১৫]

স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রী সতী হলে লোভী আত্মীয়দের নাবালকের সম্পত্তিগ্রাসের সুবিধা হত মৃতব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তো কথাই নেই। চিতার আগুন নিভতে না নিভতে সম্পত্তির লোভে শকুনির কাড়াকাড়ি লেগে যেত। একটা ঘটনার কথা বলি :

১৮২৫-এর গোড়ার দিকে কৃষ্ণনগরের মোহরপুরের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা ঘনশ্যাম মুখার্জি ৮২ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর দুই স্ত্রী। বড়র বয়স ৭০, ছোটর ৩০। স্বামীর মৃত্যুর পর তারা দুজনই গরীবদের যথেষ্ট পরিমাণে দানধ্যান করে সহগমন করে। নিঃসন্তান ঘনশ্যাম মৃত্যুর বছরখানেক আগে তাঁর এক ভাইপোকে দত্তক নেবার কথা ভাবেন। এখন তাঁর মৃত্যুর

পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, তা নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অনেকের মতে তাঁর মেজভাই গোলোকচন্দ্র মুখাগ্নি, যে মুখাগ্নি ইত্যাদি করে, সেই তাঁর সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী। অন্যদল বলছে না, তা কেন, তাঁর যে ভাইপোকে তিনি দত্তক নেবার কথা ভেবেছিলেন, সেই হবে উত্তরাধিকারী।[১৬]

বিধবা ভ্রষ্টা হলে বংশ কলঙ্কিত হবার আশঙ্কাতেও স্বামীর আত্মীয়রা অনেকসময় সহমরণে উৎসাহ দিত।[১৭] তবে এমন ঘটনা হাজারে একটা ঘটত কিনা সন্দেহ।

সতীসংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি কারণ 'আবিষ্কার' করেছিলেন শ্রীরামপুরের ডাঃ মার্শম্যান। বিশপ হেবার ১৮২৪-এর প্রথমদিকে কলকাতা থেকে জলপথে ফেরাব সময় দুটি সতীর চিতা দেখতে পান। ১৫ জানুয়ারি, ১৮২৪-এ তিনি ডাঃ মার্শম্যানের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন। কথায় কথায় বিশপের দেখা সতীর কথা উঠল। বিশপ হেবারকে কিছু জ্ঞান দেবার লোভ মার্শম্যান সামলাতে পারলেন না। বাংলাদেশে গত কয়েকবছরে সতীসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ আবিষ্কারের মহামূল্যবান 'থিসিসটি' অতঃপর উপস্থাপিত হল। মার্শম্যানের মতে এর কারণ 'উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির ক্রমবর্ধমান বিলাসিতা, এবং ইউরোপীয় অভ্যাসের ব্যয়বহুল অনুকরণ—যার ফলে অনেক পরিবারে অনটন দেখা দিয়েছে, এবং তারা যে কোনো উপায়ে মা বা অন্যকোনো বিধবা আত্মীয়-স্বজনকে পালনের দায় থেকে অব্যহতি খুঁজছে।'[১৮] ইউরোপীয় সভ্যতার সত্যিই জুড়ি নেই, যা নিজের মা-বোনকে বোঝা মনে করতে শেখায়! তবে উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপীয় সভ্যতার এই মহৎ গুণটি বাঙালি ভালোমতো রপ্ত করতে পারেনি। মার্শম্যান সাহেব জানতেন না, একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারে, বিধবাদের পরিবারের বোঝা মনে করা হত না। উনিশ শতকের বাঙালিসমাজের দোষের শেষ ছিল না, কিন্তু তাই বলে বাঙালি পরিবারে বিধবা মা-ঠাকুমা অনাদৃতা ছিলেন—একথা ডাহা মিথ্যা। সংসারের তাঁরাই হতেন সর্বময়ী কর্ত্রী। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, মেজর-জেনারেল স্লীম্যানের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল: 'হিন্দুদের মতো পৃথিবীতে আর কেউ বাপ-মাকে এত ভালোবাসে না বা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না; এদের কাছে মার চেয়ে ঠাকুমা সবসময়ই বেশি সম্মানের পাত্রী।'[১৯]

অর্থপ্রাপ্তির লোভে বামুনরা অনেককে সতী হতে প্ররোচিত করত। এই

'চালকলাভোজী উচ্ছিষ্টসেবী'র দল জানত, একটি মেয়ের চিতায় ওঠা মানে ট্যাকে দু'পয়সা আসা। তাই তারা মেয়েদের কানে মন্ত্র দিত, শ্লোক আওড়াত, যে মেয়ে সতী হয়, সে স্বর্গে কেমন তোফা আনন্দে ইন্দ্রানীর মতো দিন কাটায়, তার এক মোহময় ছবি শোকবিহ্বল বিধবার সামনে তুলে ধরত। ক্ষণ বৈরাগ্যের সেই পরিবেশে অনেক মেয়েই তাদের বাগ্‌জালে অভিভূত হয়ে চিতায় গিয়ে উঠত। বামুনরা যে মেয়েদের সতী হতে প্রলোভিত করে, ১৭শ শতাব্দীতেই টাভার্নিয়ের-এর চোখে তা ধরা পড়েছিল। এই প্রথায় কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপেরও ঘোর বিরোধী তারা। ১৭৪২-এ হুগলির ডাচ-ডিরেক্টর সিচটারম্যান একটি সতী ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত বামুনদের ২৫,০০০ টাকা প্রণামী দিয়ে সেযাত্রা তিনি নিস্তার পান।[20] বামুনরাই যে জনগণকে ক্ষেপিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি অনেকসময় বলপ্রয়োগেও যে তারা কুণ্ঠিত হত না—সেকথা আর এক পর্যটক টমাস্ বাউরি বলে গেছেন। বলপ্রয়োগের ফল সবসময় শুভ হত না। বাউরি এ ধরনের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বলেছেন। হুগলি থেকে ৬ মাইল দূরে ১টি মেয়ে বিনা দ্বিধায় সতী হতে এগিয়ে আসে। কিন্তু আগুনের মুখোমুখি হয়ে তার মনোভাব পালটায়। চিতায় লাফ দিতে সে অস্বীকার করে। ব্যাপার দেখে বামুনরা যায় ক্ষেপে। একজন বামুন মেয়েটিকে চেপে ধরলে, মেয়েটি তাকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ নিয়েই জলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে দুজনেই যায় শেষ হয়ে।[21]

১৭৬৭-তে হলওয়েল লেখেন, 'বামুনরা হিন্দু মেয়েদের সতী হবার জন্য অবিরত উৎসাহিত করে তাদের মনে রেখাপাত করতে চেষ্টা করে।'[22] স্যার চার্লস ফরবেস এদেশে দীর্ঘদিন ছিলেন, সতীপ্রথা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে কয়েকবারই তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করতেন, মেয়েদের সতী হবার পেছনে বামুনদের এক বিরাট ভূমিকা আছে।[23] ১৮২৮-এ বিলাতের 'ব্লাকউড ম্যাগাজিনে' সতীপ্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে একে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান হয়। প্রবন্ধ-লেখক প্রসঙ্গত বলেন, সতীপ্রথায় ব্রাহ্মণদের আগ্রহ প্রচুর, কারণ এতে তাদের দুপয়সা হয়।[24] জে. পেগস মেয়েদের সতী হবার পেছনে ব্রাহ্মণদের লোভ এবং স্বার্থের কথা বলেছেন। কোনো-কোনো ধনী পরিবার থেকে এজন্য তারা ২০০ টাকা পর্যন্ত পেত। কেউ-কেউ বলেছেন, সতীদের মধ্যে নিঃস্ব মেয়েরই তো সংখ্যাধিক্য, কাজেই সবক্ষেত্রে বামুনদের

তো আগ্রহ থাকবার কথা নয়। সব দোষ তাই তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।[২৫] সতী নিঃস্ব হলেও বামুনরা তাদের প্রাপ্য ঠিকই পেত। গ্রামের জমিদার বা অন্য কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব নিত। কৌতূহল জাগে, একটি মেয়ের সতী হতে খরচ পড়ত কত? ঠিক বলা মুশকিল, অবস্থাভেদে নিশ্চয়ই খরচেরও তারতম্য ঘটত। তবে ১৯.৮.১৮২৪-এ পেগস কটকে যে মেয়েটিকে সতী হতে দেখেছিলেন, তার খরচের একটা ফিরিস্তি তিনি পণ্ডিতদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন :

ঘি—তিন টাকা
কাপড়—এক টাকা
সতীর নতুন কাপড়—আড়াই টাকা
কাঠ—তিন টাকা
পুরোহিত—তিন টাকা
সতীর বিলি কবার জন্য—এক টাকা
চাল—এক আনা
পান—দু পয়সা
ফুল—এক আনা
কর্পূর—এক আনা
শন চার আনা
হলদী—এক আনা
চন্দন, ধুপ, নারকেল ইত্যাদি—পাঁচ পয়সা
বাহক—পাঁচ আনা
গায়ক-বাদক—আট আনা
নখ কাটার জন্য—চার আনা
কাঠ কাটার জন্য—তিন আনা

মোট পনেরো টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা

এরপর শ্রাদ্ধবাবদও খরচ হবে ১৫-২০ টাকা। সব মিলিয়ে টাকা তিরিশের ব্যাপার।[২৬] মনেহয়, এরকম খরচই মধ্যবিত্ত পরিবারে কেউ সতী হলে পড়ত।

অনেক সন্দিগ্ধ বৃদ্ধ স্বামী তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে সতী হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করত। মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর ওপর দখলী স্বত্ব কায়েমী রাখতে অনেক

বৃদ্ধ স্বামী তাদের যুবতী স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ দিয়ে যেত, অথবা স্ত্রী যাতে সতী হয়, উত্তরাধিকারীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলত।[২৭] ফরাসী-পর্যটক দুবাস অবশ্য এ ধরনেব অনুমানকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।[২৮] আমরাও এ অনুমানকে নিছক কষ্টকল্পনা বলি। বরং এর বিপরীতটাই সত্য। অনেক মেয়ে স্বামীপ্রেমে গদগদ হয়ে বিহ্বল কোনো মুহূর্তে সংকল্প করত, উনি যদি আগে মারা যান, তাহলে আমি সতী হব। এবং অনেবসময় নিজেদের সঙ্কল্প ঘোষণা করে তারা লোকচক্ষে বাড়তি সম্মান আদায় করত। কোনো কোনো মেয়ে বিয়ে হওয়াব পব থেকেই সতী হবার স্বপ্ন দেখত। বড়ি গ্রামের সতীটিব কথাই ধরি।

১৮২৫-এ পিপ্পলওয়ান্দিতে রবার্ট কীথ প্রিঙ্গল তাঁবু করে আছেন। এমন সময় একদিন তাঁর কাছে খবব এসে পৌঁছল বড়ি গ্রামে একটি মেয়ে সতী হতে চলেছে। তিনি তখনই তাঁব কাবকুনদের পাঠিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে, অন্তত তিনি সেখানে গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত মেয়েটিকে চিতারোহণ থেকে বিবত করতে নির্দেশ দিলেন। বিকালে নিজে সেখানে পৌঁছে দেখেন মেয়েটিকে নিবৃত্ত করাব সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েটিকে তিনি বললেন, 'এখন সতী না হলে লজ্জাব কিছু নেই, ভবিষ্যতে ভরণপোষণের জন্যও তাকে কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু সতী হবার জন্য যদি সে জেদ কবে তাহলে তাকে শাস্ত্রানুসারে সতী হতে হবে, এবং যদি (খুবই সম্ভব তা) ভয় পেয়ে সে আগুন থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে তাব জাত-মান দুই-ই যাবে।' একথা শুনে একটু হেসে তিনি বললেন, 'হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আমি সতী হতে যাচ্ছি না, অনেকদিনের সাধ আমার সতী হবার। বিয়ের পর বারবার আমার স্বামীকে বলেছি, তোমাকে ছেড়ে আমি একদিনও থাকব না। আর তাই এখন আমি আমাব কথা রাখতে চলেছি। বাঁচার ইচ্ছা যদি আমার একটুও থাকত, তাহলে আমাব ছেলে ও অন্যান্য আপনজনেরা খুশিমনেই আমাকে প্রতিপালন করত, কাজেই আপনার ভবণপোষণের প্রতিশ্রুতি আমাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।' সাহেবকে অনুনয় করে বললেন তিনি, 'অনুগ্রহ করে আপনি দেখুন, কেমন সাহসের সঙ্গে আমি সতী হই।'

বয়স তার ৫০/৬০, দুটি ছেলে—নাতিনাতনী অনেকগুলি। তাঁর স্বামী চিনচোড়িতে গোপাল রাও দেশপাণ্ডের বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন—দিন তিনেক আগে তিনি মারা যান। মহিলাটি পরশু আলাবাজারে একটি সহমরণ দেখতে

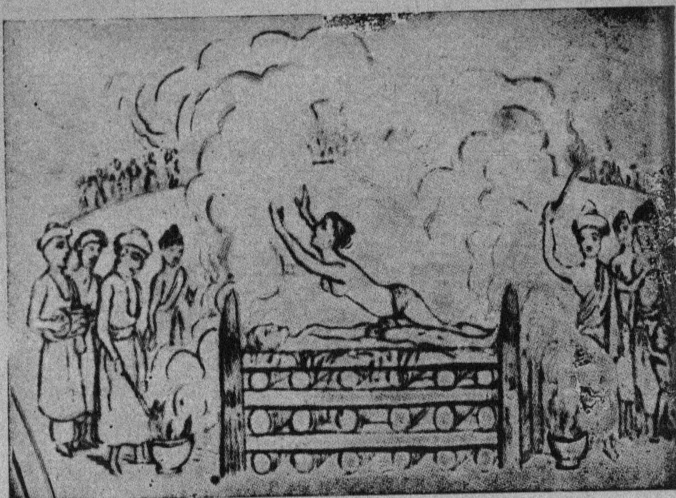
বিদেশি শিলপীর চোখে সহমরণ (আনু. ১৮০০-৩০ খ্রী.)





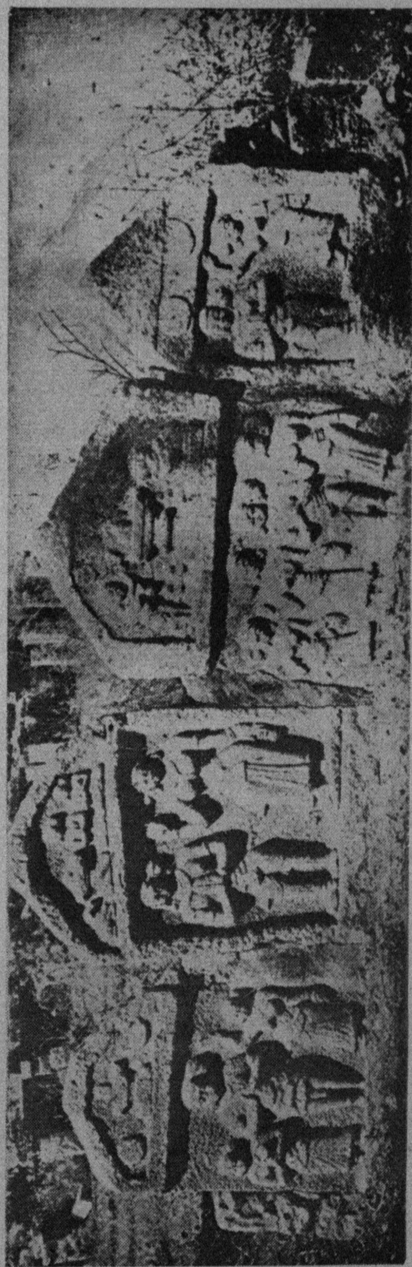


(উপরে) হাওড়া জেলায় প্রাপ্ত সতীর হাতের ছাপ ও সহমরণের মৃণ্ময়-স্মারক
(নিচে) ‘রাজপুত্র শ্রীঅতীন্দ্র চন্দ্র তসাং’—আনু. ১০ম শতাব্দীর একটি সতীস্তম্ভের
গাত্রলিপি। লিপিকাল নির্ণয় করেছেন পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল

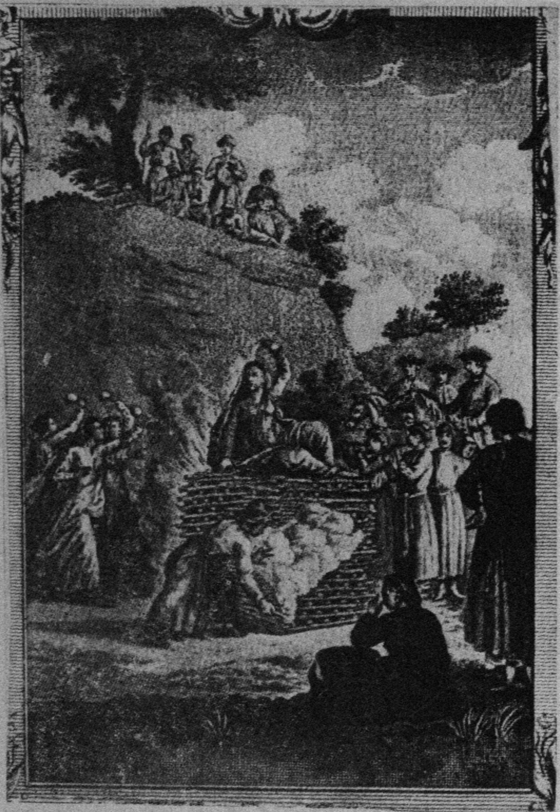


'দেবতা আমায় ডাকছেন, সতী আমাকে হতেই হবে'—প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে ১৮২৯-এ চাকদহের একটি সতী ঘটনা

অগ্রদ্বীপের একটি সতী মন্দির (হজেস, ১৭৮৮)



(বাঁদিকে) আকবরের তৃতীয় পুত্রের কাছে একটি মেয়ে সহমরণের অনুমতি চাইছে
(ডানদিকে) তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে হাম্পি যাবার পথে প্রাপ্ত সতী-স্মারক (আনু. ১৬শ শতাব্দী)



আজব দেশ ভারতবর্ষ—তা বোঝাতে সাহেবরা ভূগোল



দক্ষিণ ভারতের অনন্তপুর জেলায় প্রাপ্ত সতী-স্মারক



সতী-নিবারক লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। মূর্তিটির পাদদেশে সতী-নিবারণের একটি দৃশ্য খোদিত (শিল্পী, স্যার ওয়েস্টম্যাকট, ১৮৪০)



সহমরণ—তাঞ্জোরের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর কোম্পানি স্টাইলে আঁকা ছবি (আনু. ১৮০০ খ্রী.)

গিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানে তিনি অংশও নেন। সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে বাড়ি ফিরছেন, পথে একজনের সঙ্গে দেখা। তার মুখেই পেলেন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ, লোকটির সঙ্গে তাঁর মৃত স্বামীর অস্থিও রয়েছে। সব শুনে তিনি তখনই সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। তাঁর পরিবারের এবং গ্রামের সবাই তাঁর সঙ্কল্পে দুঃখ পায়। তাঁকে সারারাত ধরে সবাই মিলে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু—

প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদির পরও মহিলাটি প্রশান্ত-প্রসন্নময়ী। যখন তাঁকে চিতার কাছে আনা হল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মিঃ প্রিঙ্গল আবার একবার ভেবে দেখার জন্য শেষবারের মতো তাঁকে অনুরোধ করলেন। মহিলাটি কিন্তু সঙ্কল্পে অবিচল। চিতার কাছে শেষ অনুষ্ঠান সেরে তিনি চিতায় উঠলেন। চিতার বাইরে ছেলেরা আগুন দিল, ভেতরে তিনি নিজেই। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, মিনিট তিনেকের মধ্যেই হল সব যন্ত্রণার অবসান।[২৯]

স্বামীর কাছে কথা দিয়েও অবশ্য দু'একজন সে কথা রাখত না।

স্বামীকে ভালবেসে কিংবা বংশমর্যাদা রক্ষা করতে, কিংবা রাতারাতি দেবী হয়ে ওঠার লোভে বা অন্য কারণে বছরের পর বছর এত মেয়ে যে আত্মাহুতি দিত, সমাজে তা কি কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি? বেশির ভাগ মানুষই ভক্তিবিহ্বল চোখে সতীকে দেখেছে সত্য, কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকেই কিছু মানুষ এ-প্রথাকে সমর্থন করতে পারেন নি, তাঁরা এর নিন্দা করেছেন, সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এর বিরুদ্ধে। এরা কারা। কি এদের পরিচয়?

৯। সতী-বিরোধী আন্দোলন—যুগে যুগে

সতী বিরোধিতা : প্রাচীন ও মধ্যযুগে

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অনুষ্ঠিত একটি সতী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাই গ্রীক ঐতিহাসিক ডিডোরাস সিকুলাই-এর রচনায়। ঘটনাটি এইরকম :

যুদ্ধের পর এন্টিগোনাসের কাছ থেকে এমুনাস যুদ্ধে নিহতদের সমাধিস্থ করার অনুমতিলাভ করেন। সমাধিস্থ করার সময় একটি ব্যাপারে বিসংবাদ উপস্থিত হয়। মৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় অফিসারও ছিলেন। ভারতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মহিলারা স্বামীর সহগমন করে, যদি সে তা না করে, তাহলে তাকে অসম্মানিত বৈধব্যজীবন যাপন করতে হয়, তারা কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে না। ভারতীয় অফিসারটির দু'জন স্ত্রীই সতী হতে চায়। বড়জন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ-ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাবি করলে, ছোটজন বলে 'বড় বউ গর্ভবতী, কাজেই শাস্ত্রানুযায়ী সে সতী হতে পারে না।' সত্যই সে গর্ভবতী প্রমাণিত হলে সতী হতে না পারার দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পাগলের মতো কখনও সে মাথার চুল, কখনও পরনের কাপড় ছিঁড়তে থাকে।

অন্যদিকে ছোট বউ-এর তখন বিজয়িনীর বেশ। অলঙ্কারে সেজে সে যেন বিয়ের কনেটি। প্রসন্নমুখে অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গান গাইতে-গাইতে সে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে গেল। গা থেকে গয়নাগুলো খুলে আত্মীয়দের তা বিলিয়ে দেবার পর, তাদের কাছে বিদায় নিয়ে চিতায় গিয়ে উঠল। তার আপন ভাই চিতায় অগ্নিসংযোগ করল। দেখতে দেখতে আগুন উঠল লকলক করে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সমবেত অধিকাংশ দর্শকের জয়ধ্বনির মধ্যে চিতার আগুনে মেয়েটি নিঃশেষ হয়ে গেল। সমবেত কিছু দর্শক কিন্তু একে বর্বর অমানবিক এক প্রথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি।[১]

এইসব দর্শকদের পরিচয় আমাদের অজানা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খ্রীস্টপূর্ব যুগেও সতীপ্রথাকে বর্বর ও অমানবিক মনে করার মতো লোকের অভাব এদেশে ছিল না। প্রাচীন যুগেই কয়েকজন হিন্দু চিন্তাবিদ এ-প্রথার

বিরোধিতা করেন। মেধাতিথি এ প্রথাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিরাট এই প্রথার বিরোধিতা করে বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করে স্ত্রী স্বামীর কিছু উপকাব করতে পারে, কিন্তু সহগমন করলে নিজেকে আত্মহননের পাপে লিপ্ত করা ছাড়া কিছু হয় না।[২] প্রাচীনকালেই সতীপ্রথার কঠোরতম সমালোচনা করেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট। ৭ম শতাব্দীর এই লেখক তাঁর 'কাদম্বরী'তে বলেন :

'শাস্ত্রকারেরা অনুমবণকে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রণালী বলিয়া নির্দেশ করেন উহা ব্যামোহমাত্র। মূঢ় ব্যক্তিবাই মোহবশতঃ ঐ পথে পদার্পণ করে। ভর্তা উপরত হইলে তাহার অনুগমন কবা মূর্খতা প্রকাশ করা মাত্র। ইহাতে কিছুই উপকার নাই।...অনুমবণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়।...বিবেচনা করিলে স্বার্থপর লোকেরাই দুঃসহ বিবহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনুমরণ অবলম্বন করে। কেহ বা অহঙ্কার প্রকাশের নিমিত্ত এই পথে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ ধর্মবুদ্ধিতে প্রায় কেহ অনুমৃত হয় না।'[৩]

বানভট্টের মতানুসারী কিছু ব্যক্তি সেযুগেও নিশ্চয় ছিলেন। ১২শ শতাব্দীর এক দক্ষিণ ভারতীয় লেখক দেবনভট্ট সহমরণকে নিম্নস্তবের ধর্মানুষ্ঠান, এবং এতে উৎসাহ দেওয়া নিতান্ত অকর্তব্য মনে করতেন।[৪] চৈতন্যদেবও এ-প্রথাকে প্রীতির চোখে দেখতেন না। 'একদা একটি সতীদাহ দর্শন' করে তিনি সবেগে সেইস্থান ত্যাগ করেন।[৫] তন্ত্রেও এ-প্রথার বিরোধিতা করা হয়েছে।

মুসলমান নরপতিরা সরাসরি একে নিষিদ্ধ না করে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পর্যটক ইবন বতুতা বলেছেন, সুলতানের রাজ্যে কোনো মেয়ে সতী হতে চাইলে, সুলতানের অনুমতি নিতে হয়। ১৫১০-এ আলবুকার্ক গোয়াতে একে নিষিদ্ধ করেন। অবশ্য তাঁর বিধিনিষেধ কতদূর কার্যকরী হয়েছিল বলা মুশকিল। কারণ, ১৬৪৮-এ গোয়াতে টাভার্নিয়ের সহমরণের দৃশ্য দেখেছিলেন। তৃতীয় শিখগুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪) সতীপ্রথার নিন্দা করেন। হুমায়ুন বয়স্কা মহিলাদের সহমরণ নিষিদ্ধ করে দেবার কথা ভেবেছিলেন, শেষপর্যন্ত অবশ্য বিশেষকিছু করে উঠতে পারেন নি। আকবর জবরদস্তীমূলক সতীর বিরোধী ছিলেন, কাউকে যাতে জোর করে সতী করা না হয়, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। যোধপুর রাজপরিবারের একজন রমণী সহমরণে উদ্যত হয়েছে খবর পেয়ে ১০০ মাইল পথ ঘোড়ার পিঠে ছুটে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে আকবর মেয়েটিকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন। স্ত্রীর আত্ম-

দানের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধান করাকে পুরুষের পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে না করলেও, এই প্রথা সম্পর্কে তিনি একেবারে মোহমুক্ত হতে পারেন নি। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আকবরের দরবারে পাদরিদের আনাগোনা ছিল। একদিন পাদরিরা তাঁদের সমাজের একপত্নীত্বের প্রশংসা প্রসঙ্গে মুসলমানদের ও প্রকারান্তরে হিন্দুদের বহুপত্নীত্বের নিন্দা করলে আকবর বলেছিলেন, 'তা ঠিকই বলেছেন, হিন্দুরা বহুপত্নীক, তাঁদের সমাজে স্ত্রীরা অতি দুঃখকষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ দেখাতে পারেন যেখানে পত্নীরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়।'[৬] আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীরও এই প্রথার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ১৬০৯-এ। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাদশার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। আগ্রায় থাকাকালীন সতী হতে ইচ্ছুক অনেক মেয়েকে সম্রাটের সামনে হাজির করার দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে। কারণ, বাদশার আদেশানুসারে তিনি না দেখা পর্যন্ত কেউ মেয়েদের সতী হবার অনুমতি দিতে পারত না। এ-রকম কোনো মেয়ে এলে তিনি তাকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করতেন, এবং সতী না হলে তাকে নানাবিধ উপহার ও মাসোহারার প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু হকিন্সের থাকাকালীন কোনো প্রতিশ্রুতিতেই কোনো কাজ হয় নি। কোনো কথাতেই এইসব মেয়েরা কর্ণপাত করত না। বাদশাও উপায়ন্তর না দেখে সতী হবার অনুমতি দিতে বাধ্য হতেন।[৭]

১৬২০-তে জাহাঙ্গীর সতী নিষিদ্ধ করে দেন বলে শোনা যায়। ১৬৬৯-এ আরঙ্গজেব এক আদেশবলে সতীপ্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[৮]

মুসলমান শাসকরা সরাসরি এ-প্রথাকে নিষিদ্ধ করার চেয়ে এর ওপর কিছু-কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন।[৯] এই কারণে সুবাদারের অনুমতি ছাড়া কোনো মেয়ে সতী হতে পারত না। চট করে সতী হবার অনুমতি না দিয়ে এইসব শাসনকর্তারা মেয়েদের সতী না হবার জন্য অনেক বোঝাতেন, তাতে কাজ না হলে অনেকসময় অন্দরমহলে বাড়ির মেয়েদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য পকেটে টু পাইস এলে অন্য কথা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি নিকোলাস উইদিংটন এ ধরনের একটি ঘটনার কথা বলেছেন। ১৭শ শতাব্দীর ২য় দশকে সুরাটে একটি ১০ বছরের মেয়েকে সতী হবার অনুমতি দিতে স্থানীয় গবর্নর অস্বীকার করেন। যে মেয়ে কোনো-

দিন স্বামী-সহবাস করে নি, সে আবার সতী হবে কি! গবর্নরের আদেশ শুনে সতীর আত্মীয়বন্ধুদের তো মাথায় হাত। অনুমতির জন্য তারা তখন গবর্নরের কাছে যথাযোগ্য উপঢৌকন নিয়ে গেল। বলাবাহুল্য, তা পেতেও দেরী হল না।[১০]

কোনো-কোনো মারাঠা নৃপতি এ প্রথাকে পছন্দ করতেন না। নিজের মেয়েকে চোখের সামনে সতী হতে দেখার পর অহল্যা বাই-এর মনোভাবও এ প্রথার অনুকূল ছিল না। ১৮শ শতাব্দীর শেষদিকে দুটি মারাঠী রাজ্যে সতী নিষিদ্ধ হয়। বন্দরের কাছাকাছি বিভিন্ন স্থানে নিজেদের ঘাঁটিতে পোর্তুগীজরা গায়ের জোরে অনেক হিন্দু বিধবাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে চুঁচুড়ায় ডাচরা, চন্দননগরে ফরাসীরা ও শ্রীরামপুরে ডেনরা তাদের এলাকায় সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করে দেয়।

॥ ২ ॥

সতী আন্দোলন: ইংরেজ আমলে

কিন্তু ইংরেজ যারা উড়ে এসে এদেশে জুড়ে বসল, তারা সতীকে কি চোখে দেখল? প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ এদেশে ঘাঁটি গেড়ে বসতেই মহাব্যস্ত, দেশীয় ধর্মকর্ম, প্রথা-আচার ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই তাদের। তবু সময়সুযোগ পেলে, দু'একটি মেয়েকে শ্মশানভূমি থেকে উদ্ধার করে তারা তাদের শয্যাসঙ্গিনী করত। কলকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের নামে এ ধরনের একটি কাহিনী প্রচলিত।

পাটনার কুঠীতে থাকাকালীন ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে একদিন চার্নক গঙ্গাতীরে বেড়ানোর সময় বছর পনেরোর একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে আত্মবিসর্জনে উদ্যত দেখেন। তিনি তাঁর প্রহরীদের সাহায্যে বলপ্রয়োগে মেয়েটিকে উদ্ধার করে তাকে 'পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।' ঘটনাটি সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। তাঁর সমসাময়িক গবর্নর হেজেসের ডায়রি অনুযায়ী চার্নক পাটনায় থাকাকালীন একজন হিন্দু স্ত্রীলোক অর্থ ও অলঙ্কারাদিসহ তার স্বামীর আবাস ত্যাগ করে চার্নকের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। চার্নকের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করার জন্য হুগলি ও কাশিমবাজারের শাসনকর্তা বুলচাঁদ এই স্ত্রীলোকটির স্বামীকে হেজেসের কাছে পাঠিয়ে দেন।[১১]

ঘটনাদুটি পরস্পর বিরোধী হলেও একটি দেশীয় স্ত্রীলোক যে চার্নকের জীবনে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সতীর চিতা থেকে উদ্ধার করে একে তিনি জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন কিনা বলা মুশকিল। আগেই বলেছি, বিদেশিবা অনেকসময় বলপ্রয়োগে সতীর চিতা থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে শয্যাসঙ্গিনী করত। চার্নক যদি এইসব মহাজন-পন্থা অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে আশ্চর্যেব কিছু নেই। তবে চার্নকেব সতী-উদ্ধার কাহিনীর উৎস আলেকজাণ্ডার হামিলটনেব যে বইটি, তাতে সতী বিষয়ে লেখকের যে মনোভাব প্রকাশিত তা অস্বচ্ছ, একপেশে এবং ভুলে ভরা। তাছাড়া হামিলটনের সঙ্গে চার্নকের সম্পর্কও ছিল আদায়-কাঁচকলায়। বলে বাখা ভাল, হেজেসও চার্নকের বন্ধু ছিলেন না।

চার্নক তাঁর বিবিকে যেখান থেকেই যোগাড করুন, সতী বিষয়ে তাঁব ভাই-ব্রাদারদের পদক্ষেপ ছিল অতি সতর্ক। ১৭৬৬-তে ক্লাইবের দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণ একজন বিধবাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত কবলে, বিধবাটি অনাহারে আত্মবিসর্জন দেয়। এই ঘটনার পরে ক্লাইব হিন্দুধর্ম ও আচাবে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৭৩-এ কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চেয়াবম্যান মিঃ ন্যাথানিয়েল স্মিথের অনুরোধে হেস্টিংস সতীব শাস্ত্রীয়তা বিষযে অনুসন্ধান করে নিশ্চিন্ত হন। ১৭৭৫-এ মিঃ উইলকিন্সও বিষয়টির শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। ১৭৮১-তে মিঃ জোনাথান ডানকান সতীবিষয়ে হেস্টিংস ও উইলকিন্সের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান।[১২] পার্লামেণ্টও এদেশীয়দের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ কবেন। তবু, চোখের সামনে মেয়েরা সহমৃতা হচ্ছে, দু'এক জায়গায় তাদের ওপব বলপ্রয়োগও কবা হচ্ছে দেখে দু'একজন ইংরেজ রাজকর্মচারি বিচলিত হয়ে উঠতেন। ঝুঁকি নিয়েও দু'একটি মেয়েকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতেন তাঁরা।

১৭৮৯-এ শাহাবাদের কালেক্টর এম. এইচ. ব্রুক একটি মেয়েকে সহমৃতা হবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ব্রুকের মতে কলকাতা আর তার আশেপাশে সতী যখন নিষিদ্ধ, তখন কালক্রমে তা সারা কোম্পানির রাজত্বে নিষিদ্ধ হবে। তাঁর আচরণ কতখানি সঙ্গত হয়েছে জানার জন্য তিনি লর্ড কর্নওয়ালিশকে লেখেন। বোর্ড তাঁর আচরণ সমর্থন করে, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও তাঁকে জানান হয়, অমানবিক সতীপ্রথা নিবারণের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব যতখুশি খাটান, কিন্তু এ-প্রথা দমন করার ব্যাপারে তিনি যেন তাঁর

সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন। এইসঙ্গে আশা প্রকাশ করা হয় যে, কালক্রমে দেশীয় ব্যক্তিরা নিজেরাই এই প্রথার অযৌক্তিকতা বিষয়ে অবহিত হবেন, এবং এই প্রথাটিও ধীরে ধীরে লোপ পাবে।[১৩]

একদিকে যখন এইসব লেখালেখি হচ্ছে, অন্যদিকে ইংরেজের রাজধানী কলকাতায় ক্রমেই বন কেটে গড়ে উঠছে বসত। ১৭৭৪-এ শহরের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'এসিয়াটিক সোসাইটি'। 'এসিয়াটিক রিসার্চেস' নামে সোসাইটির মুখপত্র প্রকাশিত হতে লাগল ১৭৯২ থেকে। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-এর ৪র্থ সংখ্যায় 'পতিব্রতা হিন্দু বিধবার কর্তব্য' বিষয়ে একটি প্রবন্ধে হেনরি কোলব্রুক সতীপ্রথা সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রকারদের মতভেদের কথা তুলে ধরেন।

১৭৯৮-এ স্যার জন আনস্টুথার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে কলকাতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর এলাকায় সতী হওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেও এর মূলোচ্ছেদ করতে পারেন নি। নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পর কলকাতার সতী হতে ইচ্ছুক মেয়েরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে সহমৃতা হত। মার্শম্যানের উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'but in the course of 18 years, 130 widows were taken into territories of the E. I. Company and burnt.'[১৪]

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হল। এল উনিশ শতক। ভারতভাগ্যবিধাতা তখন ওয়েলেসলি। ঝানু লোক তিনি। শাসন-শোষণের বনিয়াদ পাকা করতে সিবিলিয়ানদের দেশীয়ভাষা, রীতিনীতি জানা দরকার—এটা তিনি বুঝেছিলেন। এই বোঝারই ফলশ্রুতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। দেশীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে ছাত্ররা কতটা ওয়াকিবহাল তা বোঝার জন্য ১৮০২-এর থার্ড টার্মে ইংলিশ কম্পোজিসনের বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট হয় '*On the custom of Hindoo Women burning themselves on the decease of their Husbands*'. মিঃ চ্যাপলিন, মিঃ নিউনহ্যাম, মিঃ স্প্যারোট ও মিঃ রস এই চারজন ছাত্র বিষয়টিতে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[১৫] শুধু দেশীয় রীতিনীতিই নয়, প্রাচ্যভাষা ছাত্ররা সত্যিই শিখছে না ফাঁকি দিয়ে বাজিমাৎ করছে দেখার জন্য এই বছর থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিভিন্ন দেশীয়ভাষায় বাৎসরিক বিতর্কের আয়োজন করা হয়।

দ্বিতীয় বিতর্কের আসর বসল মঙ্গলবার, ২৯ মার্চ, ১৮০৩। বেলা ৯টায়

বিতর্কসভায় যোগ দিতে অফিসার, অধ্যাপক, ছাত্র ইত্যাদিরা 'নিউ গবর্নমেন্ট হাউসে' সমবেত হলেন। দশটা বাজার একটু আগে গবর্নর জেনারেল, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলেজ কাউন্সিলের সদস্যরা ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সভার কাজ শুরু হল। পারসীতে বিতর্ক শেষ হবার পর আরম্ভ হল হিন্দুস্থানীতে—বিষয়: *The suicide of Hindoo Widows by burning themselves with the bodies of their deceased Husbands is a practice repugnant to the natural feelings, and inconsistant with moral duty.'* প্রস্তাবটির সমর্থনে বললেন হিন্দী বিভাগের 'অনার'প্রাপ্ত ছাত্র মাদ্রাজের ডাবলিউ চ্যাপলেন। বোম্বায়ের আর. টি. গুডউইন প্রধান বিরোধী বক্তার ভূমিকা নেন, মাদ্রাজের আর সি. রসও বিরোধী ভূমিকা নেন। ছাত্রদের বক্তব্যের শেষে হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক জন গিলক্রিস্টকে দেখা গেল 'মডারেটরের' ভূমিকায়।[১৬]

সতী বিষয়ে হিন্দীতে এই আলোচনা কি ওয়েলেসলির মনে কোনো রেখাপাত করেছিল? জানি না। তবে এটুকু বলব, বাংলার হর্তাকর্তা-বিধাতাদের উপস্থিতিতে সতীপ্রথা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বিতর্কের বিষয়টি কে নির্বাচন করেছিলেন? সম্ভবত ডঃ গিলক্রিস্ট। সেই হিসাবে কৃতিত্বও তিনি দাবি করতে পারেন। সমকালেই তাঁর এক সহকর্মী উইলিয়ম কেরীর দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়।

১৭৯৯ খ্রী বাইবেল ছাপানো সংক্রান্ত ব্যাপারে কলকাতায় এসে গঙ্গার ধারে নোয়াসরাই গ্রামের কাছে কেরী জীবনে প্রথম একটি মেয়েকে অবিচলমুখে সতী হতে দেখেন। ঘটনাটির স্মৃতি কেরীর মন থেকে মুছে যায় নি। ১৮০০ খ্রী সূচনাতেই তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা শ্রীরামপুরে এসে ঘাঁটি গাড়লেন। সতীপ্রথার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণের এক ভালো কল খুঁজে পেলেন তাঁরা। ৫ ১ ১৮০২-এ ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে সতী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখলেন, কেউ বলেন ৩০,০০০, কেউ বলেন ২৫,০০০ মেয়ে বছরে সতী হয়।[১৭] বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হবার জন্য ১৮০৩-এ কয়েক-জন দেশীয়ব্যক্তিকে কলকাতার আশপাশের ৩০ মাইলের মধ্যে সতীসংখ্যা নির্ণয়ের কাজে নিযুক্ত করা হল। ওয়ার্ড সাহেবের মতে বছরশেষে সংখ্যাটা দেখা গেল ৪৩৮! তাও তো গঙ্গার পুবপশ্চিমপারের জায়গাগুলো একরকম দেখাই হয় নি।[১৮] আরও সঠিক হিসাব পাবার জন্য পরের বছর তাঁরা গঙ্গার

ধারে বিভিন্নস্থানে ১০ জন এজেন্ট নিয়োগ করলেন। প্রত্যেকটি সতী ঘটনার হিসাব রাখতেন তাঁরা; মাসিক রিপোর্টও পাঠাতেন। রিপোর্ট-অনুযায়ী দেখা গেল, এইটুকুন জায়গাতেই ৬ মাসে ২০০ থেকে ৩০০ জনের মতো সতী হয়েছে।[১৯] মার্শম্যান সাহেবের স্মৃতিশক্তি ভালো, তিনি একেবারে ঠিক সংখ্যাটা বলে দিলেন, পুরো ৩০০।[২০]

সংখ্যাটার ওপর অনেক রং চড়িয়েছেন ওয়ার্ড-মার্শম্যানরা। তার প্রমাণ পাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভাইস-প্রোভস্ট ও ক্লাসিকসের অধ্যাপক ক্লড. বুকাননের বই থেকে। শ্রীরামপুর মিশনরিদের সংগৃহীত সতী-রিপোর্ট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর বইতে দেখি ১৮০৩-এ কেরী-লভ্য তালিকা অনুযায়ী কলকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে ২৭৫ জন সতী হয়।[২১] ১৮০৪-এর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ অক্টোবর—এই ৬ মাসে কলকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনরিরা যে সমীক্ষা চালান, তাতে দেখা যায় এই ৬ মাসে এই অঞ্চলে ১১৬ জন সতী হয়। এই ৬ মাসে কোথায় কতজন সতী হয় বুকানন তাও উল্লেখ করেছেন :

গড়িয়া থেকে বারুইপুরের মধ্যে	১১ জায়গায়	মোট ১৮ জন
টালির নালার মুখ থেকে গড়িয়ার মধ্যে	১৮ জায়গায়	মোট ৩৬ জন
বারুইপুর থেকে বাহিপুরের মধ্যে	৭ জায়গায়	মোট ১২ জন
শিবপুর থেকে বালির মধ্যে	৫ জায়গায়	মোট ১০ জন
বালি থেকে বৈদ্যবাটির মধ্যে	৩ জায়গায়	মোট ৩ জন
বৈদ্যবাটি থেকে বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে	৫ জায়গায়	মোট ১০ জন
কলকাতা থেকে বরানগরের মধ্যে	৪ জায়গায়	মোট ৬ জন
বরানগর থেকে চানকের (বারাকপুর) মধ্যে	৬ জায়গায়	মোট ১৩ জন
চানক থেকে কাঁচড়াপাড়ার মধ্যে	৪ জায়গায়	মোট ৮ জন[২২]
কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে মোট সতীসংখ্যা		১১৬ জন

না, তেমন বেশি কিছু নয়, ২৭৫ কে '৪৩৮' ও ১১৬ কে মাত্র '৩০০' বলে চালিয়েছিলেন ওয়ার্ড আর তাঁর দোস্ত মার্শম্যান। আশ্চর্য লাগে যখন দেখি প্রতিষ্ঠিত গবেষকরাও বিনা বিচারে ওয়ার্ড-মার্শম্যানের তালিকাকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছেন।[২৩]

যাক, যে কথা বলছিলাম, কেরীর কথা। ১৮০১-এ কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি কলেজের পণ্ডিতদের সাহায্যে সতীপ্রথা সম্পর্কে শাস্ত্রে কোথায় কি বলা হয়েছে সংগ্রহ করেন। মনে হয়, এ-ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ই তাঁকে সবচেয়ে সাহায্য করেন। অতঃপর তিনি এর ওপর ভিত্তি করে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে একটি আবেদন প্রস্তুত করে মিঃ উডনির মারফৎ সপার্ষদ ওয়েলেসলির কাছে উপস্থাপিত করেন।[২৪] কেরী-জীবনীকার অনুমান করেছেন, ওয়েলেসলি আরো কিছুদিন এদেশে থাকলে ১৮২৯ পর্যন্ত সতী-নিবারণের জন্য অপেক্ষা করতে হত না, ১৮০৮-এই কেরী তা করিয়ে নিতেন।[২৫] অনুমান, যে যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু ধুরন্ধর শাসক ওয়েলেসলি মিশনরি ও তার দরদীদের হাড়ে-হাড়ে চিনতেন। তাদের মতামতকে প্রশ্রয় দিলে সাধের ভারতসাম্রাজ্য যে দুদিনে ডকে উঠবে, এ বোধটুকু তাঁর ছিল। তাই এই আবেদনটির কি গতি হয়েছিল সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই ১৮০৫-এই এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে ওয়েলেসলিকেও একটু নড়ে বসতে হল।

১৮০৫-এ বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট জে. আর এলফিনস্টোন ১২ বছরের একটি মেয়েকে সতী হবার অনুমতি দিলেন না। মেয়েটি প্রথমত অপ্রাপ্তবয়স্ক, দ্বিতীয়ত, মাদকপ্রয়োগ করে মেয়েটিকে নেশাচ্ছন্ন করা হয়েছে। ঘটনাটি এখানেই শেষ হল না। সতী-বিষয়ে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ণয় করার জন্য সরকার ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৫-এ নিজামৎ আদালতের কাছে জানতে চাইলেন, সতীপ্রথা কতদূর শাস্ত্রসম্মত, একে নিষিদ্ধ করা সম্ভব কিনা ইত্যাদি।

নিজামতের প্রধান পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা ও তাঁর সহকর্মীদের উত্তরের ওপর ভিত্তি করে ৫ জুন, ১৮০৫-এ নিজামৎ আদালত সরকারকে জানাল, স্বামীর চিতায় সহমরণ হিন্দুশাস্ত্র ও আচারসম্মত। তবে এটি পালন করা বা না করা সম্পূর্ণ বিধবার ইচ্ছাধীন। শাস্ত্রেই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিধবার সতী হওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আছে। সতী হতে উদ্যত রমণীকে মাদকপ্রয়োগ করা সম্পূর্ণ শাস্ত্র এবং আচারবিরোধী। কেউ সতী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেও যে কোনো মুহূর্তে পেছিয়ে আসতে পারে, তারজন্য তাকে জাতিচ্যুত হতে হয় না। কিন্তু সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করার পর কেউ যদি পেছিয়ে আসে, তাহলে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে উঠতে হবে। একে পুরোপুরি

নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে পুলিশ অফিসারদের সাহায্যে যত শীঘ্র সম্ভব সতী হতে উদ্যত কোনো মহিলার বয়স ইত্যাদি বিচার করে যদি দেখা যায়, সে স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে না, বা তাকে নেশাচ্ছন্ন করা হয়েছে, বা সে নিতান্ত অল্পবয়সী, বা তার শিশুসন্তানকে দেখার মতো কেউ নেই, বা সে যদি ঋতুকালে থাকে, বা সে যদি গর্ভবতী হয়—তাহলে তার সতী হওয়া হবে বেআইনী এবং এইসব পরিস্থিতিতে তাকে নিবৃত্ত করবার অধিকার পুলিশের থাকবে। এইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের সতী হতে যারা সাহায্য করবে, তাদের অপরাধও দণ্ডনীয় হবে। পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাদের মাসিক রিপোর্টে প্রতিটি সতী বিবরণ জানাতে হবে। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সতীবিষয়ে বেআইনী ব্যাপারগুলি লোপ পাবে, এবং এর ফলে সতীবিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে, তা থেকে এ-প্রথা কোথায় কতখানি বর্তমান, কোথায় বা এটি অবর্তমান—সব জানার পর কোনো-কোনো জেলায় একে নিষিদ্ধ এবং অন্যত্র একে সংযত করে কালক্রমে নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ওয়েলেসলির দিন শেষ হয়েছে, তিনি ফিরে চললেন ইংলণ্ডে। কয়েকজন কাজ চালানোর পর নতুন শাসক হয়ে এলেন লর্ড মিণ্টো। শাসনকাজেই তিনি ব্যতিব্যস্ত। কোথায় কে স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরছে, কাকে উৎসাহের চোটে অন্যরা পুড়িয়ে মারছে—এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় কই তার। তাই নিজামতের সুপারিশগুলি ফাইলচাপা পড়ল, ধুলোর স্তূপ জমতে লাগল তার ওপর।

সরকারি উদ্যোগে ভাটা পড়লেও, মিশনরিরা সতী সম্পর্কে তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত রাখলেন। ১৮০৩-এ ভ্রাতৃবধূর চিতায় অগ্নিসংযোগ করার জন্য শ্রীরামপুর মিশনের জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।[২৬] শুধু ব্যক্তিগত প্রয়াস চালিয়ে বা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেই মিশনরিরা ক্ষান্ত হলেন না, এ-প্রথা যে অশাস্ত্রীয় তাও তাঁরা দেখালেন এবং এ-প্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জনমত সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কোথাও কেউ সতী হচ্ছে শুনলেই সেখানে গিয়ে মেয়েদের বোঝাতে তাঁরা অনেক চেষ্টা করতেন—তা দেখে এসেছি। সতী হবার চেয়ে আবার বিয়ে করে ঘরকন্না করা শ্রেয়—এমন কথাও তাঁরা বলতেন।[২৭] ওয়ার্ড সাহেব তাঁর বইতে সত্যমিথ্যা নানা গালগল্প তৈরি করে সতীপ্রথার বীভৎসতা লোকসমক্ষে তুলে ধরলেন। সতীর বিবরণ সংগ্রহেও শ্রীরামপুর মিশনরিরা তৎপর রইলেন। ১৮১২-র মার্চ

মাসে অনুষ্ঠিত সতী ঘটনার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা তাঁরা প্রকাশ করলেন। তালিকাটি তুলে ধরছি :

জায়গার নাম	সতীর নাম	বয়স	সন্তান সংখ্যা	স্বামীর জাত
কাশিমবাজার	দুখী	৪০	৫	ব্রাহ্মণ
ঐ	রামপ্রিয়া	৫২	৩	ঐ
ঐ	রমণী	২৩	২	ঐ
নবাবগঞ্জ	ধনী	৪০	৩	ঐ
পলাশি	কুমারী	৩১	১	মালী
	[স্বামীর বস্ত্র নিয়ে অনুমরণের ঘটনা]			
ঐ	ঈশ্বরিণী	৩৫	৩	কাঁসারি
অগ্রদ্বীপ	নিমি	৪৫	৭	সেকরা
ঐ	দেবা	৩১	২	কামার
বাঁশবেড়িয়া	গোপা	২৫	১	চাষা
ঐ	সুখী	৪২	৩	কাঁসারি
শ্রীরামপুর	বিশাখা	৩১	৫	কামার
হুগলি	তারা	৫৫	৩	ব্রাহ্মণ
বারাকপুর	সুখী	৪৯	৩	সেকরা
কলকাতা	প্রেমী	৪১	২	ব্রাহ্মণ
চন্দবেড়িয়া	ললিতা	৩০	৪	ঐ
সুখসাগর	রূপা	২৫	২	মালী
নবাবগঞ্জ	অন্নদা	৩০	৩	তেলী
চন্দননগর	সুন্দরী	২৩	২	জেলে[২৮]
	অনুমরণের ঘটনা]			

তালিকাটি কতদূর নির্ভরযোগ্য জানি না, তবে সতী-বিষয়ে মিশনরি সচেতনতার নিদর্শন এটি। ক্লড বুকানন ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে সতী-বিষয়ে শ্রীরামপুরে ছাপা একটি পুস্তিকা উইলবারফোর্সকে দেন। ১৮১২-১৩-য় পার্লামেণ্টে চার্টার-বিষয়ক বিতর্কের সময় উইলবারফোর্স এটি কাজে লাগান।[২৯] ১৮১৩-র চার্টারে মিশনরি কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হলে তাঁরা পূর্ণোদ্যমে সতী-বিরোধিতায় নামেন। ১৮১৬-য় উইলিয়ম

জোনস ইংলণ্ডে সতীবিষয়ক একটি গ্রন্থ ছাপিয়ে এ-প্রথার বীভৎসতা তুলে ধরেন। ১৮১৮ থেকে শ্রীরামপুর মিশনরিদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' সতীপ্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে থাকে। বিশেষ করে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র সতীবিরোধী লেখা পড়ে সরকারপক্ষের কেউ-কেউ বিচলিত হয়ে পড়েন। ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র তৃতীয় সংখ্যায় সতী সম্পর্কে লেখাটি দেশীয়দের মধ্যে তাদের ধর্মীয় আচার বিষয়ে সরকারের মনোভাব সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টি করতে পারে মনে করে মিঃ আডাম এই লেখাটি কাউন্সিলের গোচরে আনেন, এবং ঐ পত্রিকার সম্পাদকদের ভবিষ্যতে এই ধরনের আলোচনা প্রকাশ না করার নির্দেশ পাঠাবার সুপারিশ করেন। এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে লর্ড হেস্টিংস বলেন, তিনি ঐ লেখাটি পড়েছেন এবং এতে আপত্তি করার মতো কিছু নেই, কাজেই বিষয়টি নিয়ে মিশনরিদের সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগাযোগের তিনি বিরোধিতা করেন।[৩০] ১৮২০-তে ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে উইলিয়ম ওয়ার্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য তাঁদের চাপ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানান।[৩১]

মিশনরিরা যখন এ-প্রথার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে জনমত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন, প্রায় সেই সময়ই ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট সতী-বিষয়ে কর্তব্য জানতে চেয়ে নিজামতে চিঠি লেখেন। নিজামৎ চিঠিটি গবর্নর জেনারেলকে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাপারটি নিয়ে নিজামতের সঙ্গে সরকারের কয়েকটি চিঠিপত্র আদানপ্রদান হবার পর, ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সরকারি আদেশমতো ম্যাজিস্ট্রেটরা সতী সম্পর্কে পুলিশ দারোগাদের কয়েকটি নির্দেশ দেন : কাউকে যেন বলপ্রয়োগে বা মাদকপ্রয়োগ করে সতী করা না হয়। সতীর বয়স যেন ১৬-র কম না হয়, গর্ভবতী সে যেন না হয়। সতীবিষয়ে পুলিশকে তাদের মাসিক রিপোর্ট দেবারও নির্দেশ দেওয়া হল।

সতী এতদিন ছিল শাস্ত্রীয়, ইংরেজরাজে হল আইনসম্মত।

১৮১৫ থেকে সরকারি উদ্যোগে সতীর বাৎসরিক হিসাব তৈরী হতে লাগল, শিশুসন্তানের মার সতী হওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হল। ১৬ এপ্রিল, ১৮১৬-য় কলকাতা কোর্ট অফ সার্কিটের চতুর্থ বিচারপতি এডওয়ার্ড ওয়াটসন নিজামৎ আদালতের রেজিস্ট্রারকে আইন করে এ প্রথা রদ করে দেবার সুপারিশ করেন, এবং তা করলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই তাও জানান।[৩২] ওয়াটসনের প্রস্তাব নিজামৎ আদালত গ্রহণযোগ্য মনে না

করলেও এই সূত্রে এই প্রথার শাস্ত্রীয়তা আবার একবার যাচাই করে নিয়ে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে সতী সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিধিনিষেধ জারি করা হয়। ১৬ বছরের কমবয়সী মেয়েদের, গর্ভকালে বা ঋতুকালে, শিশুসন্তানকে দেখার কেউ না থাকলে সতী হওয়া যাবে না—এইসব পুরোনো আদেশের সঙ্গে কয়েকটি নতুন নির্দেশও এই সময় প্রচারিত হয়। ব্রাহ্মণীর অনুমরণ তো আগেই নিষিদ্ধ হয়েছিল—অন্যবর্ণের ক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে দূরস্থিত স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শোনার পরই অনুমৃতা না হলে, ভবিষ্যতে তার তা হবার অধিকার থাকবে না। স্বামীর মৃত্যুর সময় কাছে থেকেও কেউ যদি সহমৃতা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতেও সে তা হতে পারবে না। ঘোষণাটিতে আরো বলা হল, একমাত্র বিবাহিতা পতিব্রতা স্ত্রীই সতী হবার অধিকারী, রক্ষিতা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সে অধিকাব নেই।

এইসব বিধিনিষেধে ফল হল কতটুকু ? আর কিছু হোক বা না হোক, বেশ কিছু মেয়েকে পুলিশি হস্তক্ষেপে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। বেআইনীভাবে সতী হতে সাহায্য করায় কিছু লোককে লঘু দণ্ডবিধানও করা হয়েছিল। সতীব ক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে অবহেলার জন্য অনেকসময় পুলিশ অফিসারদের সাসপেণ্ড করা হত, যথাসময়ে খবর পৌঁছে দেবার কাজে গাফিলতির জন্য চৌকিদারদের বেত পর্যন্ত মারা হত।

বিধিনিষেধ জারি করার পরও অনেকক্ষেত্রে বেআইনী সতীর ঘটনা ঘটত। পুলিশি বা অন্য তৎপরতায় অনেককে নিবৃত্ত করা গেলেও সতীর সংখ্যাটা না কমে বরং গেল বেড়ে। ১৮১৭-য় ৭০৭ জন মেয়ে সতী হল, ১৮১৮-তে সংখ্যাটা দাঁড়াল ৮৩৯ (এরমধ্যে কলকাতা বিভাগেই ৫৪৪)। সতীর এই সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ সম্ভবত এইসময় কলেরার মহামারী আকার ধারণ। এটি অন্যতম কারণ হলেও, একমাত্র কারণ নয়। আসলে শাস্ত্রীয় সতীপ্রথাকে ইংরেজ সরকার যখন আইনসম্মত বলে স্বীকার করে নিল, তখন লোকের চোখে এ-প্রথার মর্যাদা গেল বেড়ে। আর তাই মেয়েরা উৎসাহিত হল আরো বেশি সংখ্যায় সতী হতে।

১৮১৮-তে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে নামলেন ডাবলিউ. এওয়ার—বাংলার অন্যতম পুলিশ সুপার তিনি। ১৮ নভেম্বর, ১৮১৮-তে সরকারের বিচার বিভাগের সচিব ডাবলিউ বি বেলিকে লিখিতভাবে তিনি জানালেন, বর্বর অমানবিক এই প্রথাকে দমন করলে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে তেমন কোনো অসন্তোষ দেখা দেবে না। এ সম্পর্কিত সরকারি বিধিনিষেধগুলি মূল্যহীন। কোনো মেয়ে

যদি তার ঠিক বয়স না বলে, গর্ভবতী তা স্বীকার না করে—তাহলে? এর ওপর দারোগাদের ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারটা তো আছেই। এইসব বিধিনিষেধে কোনো কাজের কাজ হলে বছর-বছর সতীসংখ্যা বেড়েই বা যাবে কেন? সবিনয়ে তিনি জানালেন 'that authorizing a practice is not the way to effect its gradual abolition.'[৩৩]

বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে সতী নিবারণ বিষয়ে মতামত জানতে চেয়ে মিঃ এওয়ার চিঠি লেখেন। সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট জে এউইং, বাখেরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট জে হ্যারিংটন, পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট ডাবলিউ এইচ ট্রিপেট এ-বিষয়ক কোনো আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করলেও, চাটগাঁর মিঃ পিচেল, বর্ধমানের মিঃ মলোনি, হুগলির মিঃ ওকেলি, বীরভূমের মিঃ মরিসন—এই ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেট একে নিষিদ্ধ করার পক্ষেই মতপ্রকাশ করেন।[৬]

কলকাতা সার্কিট কোর্টের বিচারপতি মিঃ জর্জ ফরবেসও ৫ নভেম্বর, ১৮১৯-এ নিজামৎ আদালতকে জানান, বড়রকমের কোনো গণ্ডগোলের আশঙ্কা ছাড়াই সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।[৩৪] প্রায় সমকালেই ত্রিচিনোপল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট সি এম লাসিংটন একে নিষিদ্ধ করে দেবার পক্ষে বলেন। নিজামৎ আদালত এ-প্রথা নিয়ে অনেকদিন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছিল তা দেখে এসেছি। ১৮২১-এ নিজামৎ আদালতের বিচারপতিরা সতীপ্রথা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করলেন। প্রধান বিচারপতি মিঃ লেসেস্টার জানালেন, যতক্ষণ না সতীপ্রথার বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে—ততক্ষণ এটাকে নিষিদ্ধ করা চলে না। তবে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বেরিলি, এলাহাবাদ, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি যেসব অঞ্চলে এটির প্রাদুর্ভাব নেই, সেখানে এটি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে প্রচলিত প্রথা নয় বলে।[৩৫]

দ্বিতীয় জজ মিঃ স্মিথ জানালেন, এ-প্রথা সহ্য করা সরকারের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ, এবং এখনই একে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই। তাঁর সঙ্গে অপর বিচারপতি মিঃ গুড একমত হতে না পেরে বললেন, সরকার বারবার এদেশীয়দের ধর্মীয় আচরণে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মানবতার দিক দিয়ে যুগপ্রচলিত সতীপ্রথা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু একে নিষিদ্ধ করা হলে দেশীয়দের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অফিসিয়েটিং জজ মিঃ ডোরিনও দ্বিতীয় জজের সঙ্গে একমত হয়ে আইন করে একে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। তাঁর মতে

এটা নিষিদ্ধ করা অবশ্যই দরকার, কিন্তু নিরাপদে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে কেমন করে তা করা সম্ভব? হিন্দুশাস্ত্রমতে সতী অনুমোদিত হলেও, তাদের নিজেদের মধ্যেই এ-প্রথাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি প্রস্তাব করেন, পুরোপুরি নিষিদ্ধ না করে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো জায়গায় (যেমন হুগলিতে) একে নিষিদ্ধ করে দিয়ে এব ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।[৩৬]

শাহাবাদ জেলার মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশে খবর না দিয়ে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই সতী হত তা বলে এসেছি। ১৮২৩-এ শাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ল্যাম্বার্ট এই জেলায় একে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেন। নিজামতের প্রধান বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁর মতে অশাস্ত্রীয়ভাবে পুলিশের অনুপস্থিতিতে সতী-ঘটনা ঘটাটা দুঃখজনক। নিজামতের ৫ম বিচারপতি মিঃ মার্টিনের বক্তব্যও প্রায় একইরকম। তার মতে সতীপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করলে দেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস আহত হবে, এবং হয়তো তা বিপদ ডেকে আনবে। কিন্তু দ্বিতীয় জজ মিঃ স্মিথ, তৃতীয় জজ মিঃ সেক্সপীয়র ও অফিসিয়েটিং জজ মিঃ আমুটি আইন করে সতী নিষিদ্ধ করার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন।[৩৭]

দেখা যাচ্ছে, উচ্চপদস্থ বাজকর্মচারী ও নিজামতের বিচারপতিরা সতী বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। একদল বলছেন, এ-প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। অন্যদল বলছেন, প্রথাটা নিঃসন্দেহে অমানবিক, কিন্তু যেহেতু এটা হিন্দুদের ধর্মীয় প্রথা সেইজন্য আইন কবে একে নিষিদ্ধ করাটা ঝুঁকিব ব্যাপার। ইংরেজি পত্রিকা-সম্পাদকরাও সতী নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। 'ক্যালকাটা গেজেট', 'ক্যালকাটা জার্নাল', 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেঙ্গল ক্রনিকল', 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ওরিয়েন্টল অবজার্ভর', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'মিশনারি হেরাল্ড' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি আইন করে এ-প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী হলেও 'জন বুল' আবার আইন করে একে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পারে নি। গবর্নর জেনারেল এই সময় লর্ড হেস্টিংস, হিসাবী লোক তিনি, কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নন, রাজকাজ ভালভাবে চালিয়ে মানে মানে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে পারলেই তিনি খুশি। বিদায়বেলায় তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কবিতায় বলা হল:

'Say but a single word and save
Ten Thousand mothers from a flaming grave.'[৩৮]

হেস্টিংসের পরে এলেন আমর্হাস্ট। দেশীয়দের প্রথা আচার-আচরণে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করলে পাছে গোলমালে পড়তে হয় এইভয়ে সতী সম্পর্কে তিনি গা বাঁচিয়ে চললেন। ৩ ডিসেম্বর, ১৮২৪-এ এ-সম্পর্কে গবর্নর জেনারেল কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে একটি চিঠিতে সতী বিষয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে লিখলেন, সতীপ্রথাকে দেশীয় জনগণ অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখে। এদেশীয় প্রথা-আচার ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ না করার জন্য জনসাধারণ আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, তাছাড়া সতীপ্রথা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক, তাই সরকারি হস্তক্ষেপে একে নিষিদ্ধ করার অবকাশও নেই। তা ছাড়া যে কোনো ধর্মীয়প্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটাও অত্যন্ত জটিল। দেশের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে হলেও এ-প্রথা হ্রাস পাচ্ছে, এদেশীয় জনগণের মধ্যে উন্নতশিক্ষার সাহায্যে চেতনার উন্মেষই এই প্রথা নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। এ প্রথার বিলোপ আমরা চাই, কিন্তু আইন করে তা নিষিদ্ধ করা হলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা আছে। এ-প্রথা বর্তমান থাকার চেয়ে নিষিদ্ধ করলে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশি—এই আশঙ্কাই আমাদের এই প্রথা সহ্য করতে বাধ্য করেছে।[৩৯] দেখা যাচ্ছে, আমর্হাস্ট সরকার সতীপ্রথা সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন হয়েও, বিপদের আশঙ্কায় এ বিষয়ে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

সরকারি মনোভাব যাই হোক না কেন, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা অনেকসময়ই কৌশলে মেয়েদের সতী হবার পথে বাধার সৃষ্টি করতেন। তাঁদের কাজ সরকার অনেকসময় সমর্থন করতেন, অনেকসময় করতেন না। বর্ধমান শহরে ২৫. ১২. ১৮২২-এ ৪৫ বছরের এক কালোয়ার রমণীকে ম্যাজিস্ট্রেট কৌশলে নিবৃত্ত করেন। মহিলাটির স্বামী থাকত হুগলিতে, সেখানে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে শুনে সে অনুমৃতা হবার সঙ্কল্প করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুমতির জন্য প্রার্থনা জানালে তিনি বলেন, আগে খবর নিয়ে দেখা হোক সত্যই ওর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে কিনা, তারপরে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। খবর নিতে নিতে কদিন কেটে যায়, মহিলাটিও তার সতী হবার ইচ্ছা ত্যাগ করে।[৪০] খান্দেশের কালেক্টর জিবার্নে অবশ্য এর চেয়েও অভিনব এক উপায়ে ১৮২৭-এ একটি মেয়েকে সতী হতে দেন নি।

একটি মেয়ে সতী হতে যাচ্ছে শুনে তিনি তাঁর কাছারির সব কর্মচারী এবং সরকারের ওপর নির্ভরশীল সবাইকে একটি বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে জানিয়ে দিলেন 'সরকার এদেশীয়দের প্রথা ও আচারে হস্তক্ষেপের বিরোধী, এবং তাই বিধবাটিকে

নিবৃত্ত করার কোনো আদেশ সরকার দেবেন না। কিন্তু সকলের জেনে রাখা ভাল এটি হিন্দুদের শাস্ত্রসম্মত নয়, এবং সরকারেরও মনোমত নয়। যারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে বা সাহায্য করবে তারা যেন ভবিষ্যতে সরকারের কাছ থেকে কোনোরকম আনুকূল্য প্রত্যাশা না করে, অবশ্য তাই বলে এই অনুষ্ঠানে তাদের যোগ দেওয়া থেকে বিরত হবার কোনো আদেশও আমি দিচ্ছি না। তবে যারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে একজন তাদের নামধাম লিখে নেবে, এবং তাদের আচরণের কথা সরকার ভুলবে না। তারা সরকারের সুনজরে থাকবে অথবা আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক নয় এমন একটি প্রথাপালনে সাহায্য করে তা হারাবে—তা তাদেরকেই ঠিক করতে হবে।'[৭১] জিবার্নের এই বিজ্ঞপ্তি দেখে সরকারি কর্মরত প্রধান ব্রাহ্মণরা বিষয়টিতে একেবারেই উৎসাহ প্রকাশ করল না (খুব সম্ভবত তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার হুমকি দিয়েছিল)। বিধবাটিও সকালের আগেই তার সঙ্কল্প ত্যাগ করল। সরকার থেকে তখন তাকে মাসিক ৭ টাকার একটি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। ম্যালকম অবশ্য জিবার্নের এই ধরনের ভীতিপ্রদর্শনকে সরকারের প্রচলিত নীতিবিরোধী বলে কঠোর সমালোচনা করেন, এবং এই আচরণের জন্য জিবার্নে ভর্ৎসিত হন।[৪২]

শুধু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরাই নয়, নিজামতের বিচারপতিরাও যে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন তা দেখে এসেছি। ১৮২৬-এ তাঁরা আবার বিষয়টি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করলেন। ডাবলিউ লেসেস্টার বললেন, এ-প্রথা নিয়ন্ত্রণের অনুকূল সময় উপস্থিত। সি টি. সিলী বললেন, যতদিন এ-প্রথা বর্তমান আছে, ততদিন এ নিয়ে যত কম আলোচনা হয় ততই ভাল। কর্টেনি স্মিথ আবারও এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বললেন, সরকারি অনুমোদনই সতীপ্রথাকে বাড়িয়ে তুলছে, সরকার তার অনুমোদন তুলে নিক, হিন্দুরাই তাদের প্রথা নিয়ে ভাবুক। এ-প্রথা নিষিদ্ধ করলে অশান্তির আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। ১. ১১ ১৮২৬-এ তিনি তাঁর মিনিটে অবিলম্বে আইন করে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করার আবেদন জানান। নিজামতের ৫ম বিচারপতি মিঃ রসও একে নিষিদ্ধ করার পক্ষে তাঁর মিনিটে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এ-প্রথা নিষিদ্ধ করা হলে সৈন্যবাহিনী অন্য ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও উদাসীন থাকবে।[৪৩]

মিঃ বেলি ১৩ জানুয়ারি, ১৮২৭-এ তাঁর মিনিটে এখনই আইন করে একে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী হয়েও বললেন, সরকার এ-বিষয়ে যদি যথোচিত

সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হয়, তাহলে কালক্রমে এই প্রথা হিন্দুদের মনে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি না করেই নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে।[৭৭]

১৮. ২ ১৮২৭-এ জে. এইচ. হ্যারিংটনও তাঁর মিনিটে প্রায় অনুরূপ মতামত প্রকাশ করে, এখনই না হলেও ভবিষ্যতে সময়সুযোগমতো বিবেচনা করে দেখার জন্য 'সতীপ্রথা বেআইনী ও দণ্ডনীয়'—এই মর্মে একটি ড্রাফট-রেগুলেশন করে পাঠান।[৭৫]

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৮. ৩. ১৮২৭-এ গবর্নর জেনারেল আমর্হাস্ট তাঁর মিনিটে সতীকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। দেশীয়দের মধ্যে প্রতিবছর জ্ঞানের বিস্তার লক্ষ্য করে এ-প্রথা দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করে তিনি লিখলেন : 'I would rather wait a few years for the gradual consummation of this desirable event, than risk the violent and uncertain and perhaps dangerous expedient of a prohibition on the part of a government.'[৪৬]

দশমাস পরে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি আবার মতামত প্রকাশ করলেন। ১৮২৬-এ সতীসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় আনন্দপ্রকাশ করে তিনি ৪. ১. ১৮২৮-এ তাঁর মিনিটে বললেন, 'there is reason to believe and expect that the progress of general instruction and unobstentations exertions of our local officers will produce the happy effect of a gradual diminution, and, at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of suttee.'[৪৭]

দেখতে পাচ্ছি ক্রমশই এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে রাজকর্মচারিরা সরব হয়ে উঠলেও, সরকার দ্বিধাগ্রস্ত।

এইসব আলোচনা শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ রইল না, সাগরপারে ইংলণ্ডেও কিছু ব্যক্তি এ নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। চার্লস গ্রাণ্ট, উইলবারফোর্স প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ-প্রথা নিবারণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের মধ্যে মতভেদ ছিল। ২০ জুন, ১৮২১-এ লর্ড ক্যানিং হাউস অব কমন্সে প্রত্যক্ষভাবে এ-প্রথায় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন।[৪৮] ১৮২৩-এর জুন মাস নাগাদ কোম্পানির ১৭ জন ডিরেক্টর বাংলার

গবর্নর জেনারেলকে যত কম সম্ভব এ-প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে পরামর্শ দেন। ২ জন ডিরেক্টর অবশ্য একে নিষিদ্ধ করার পক্ষেও বলেন। সাগরপারেই সতীপ্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করে দেবার কথা উঠলে ৬. ৬. ১৮২৫-এ হাউস অফ কমন্সে মিঃ ট্রান্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা বিপজ্জনক হবে। এ ধরনের খবর এদেশে এসে পৌঁছলে ১৯. ২. ১৮২৫-এ 'বোম্বে কুরিয়রে'র সম্পাদক এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, উন্নততর শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই এ ধরনের প্রথার সংস্কার সম্ভব। বিষয়টি সম্পর্কে দেশীয় সরকার সজাগ নয়— এমন অপবাদ তাদের কেউ দেবে না। ইংলণ্ডে বসে বিষয়টি নিষিদ্ধ করাও বুদ্ধির কাজ হবে না। কট্টর ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষী পত্রিকা 'জন বুল'ও প্রসঙ্গত এ-প্রথাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলে, সচেতন হিন্দুরা দিনদিন নিজেরাই এ-প্রথার বীভৎসতা সম্বন্ধে যেরকম সচেতন হয়ে উঠেছে, তাতে মনে হয়, শীঘ্রই এ-প্রথা লোপ পাবে। কিন্তু তাই বলে তড়িঘড়ি ইংলণ্ডে বসে আইন করে এ-প্রথাকে নিষিদ্ধ করাটাও ঠিক হবে না। বিষয়টা এদেশীয় সরকারের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।[৪৯] সতীপ্রথা সম্পর্কে এ ধরনের নরম মনোভাবের জন্য বুল সম্পাদককে ব্যঙ্গবান সহ্য করতে হয়।[৫০]

ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলিও বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করতে থাকে। ১৮২৪-এর এপ্রিলে 'ওরিয়েণ্টল হেরল্ড' লেখে, ভারতে ইংরেজের এমনই দোর্দণ্ড প্রতাপ যে শুধু একটি নির্দেশ প্রচার করে তারা এ প্রথার অবসান ঘটাতে পারে। আর তাদের আদেশের প্রতিকূলতা করার মতো বুকের পাটা কারোর নেই।[৫১] জুন, ১৮২৪-এ পত্রিকাটি আবার লেখে, বলা হয়, এ-প্রথা নিবারিত হলে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যেই তো বিষয়টি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।...তাছাড়া সতীপ্রথা সমস্ত ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, মানব সম্প্রদায়ের সুখ বিনাশক, অবিলম্বে একে নিষিদ্ধ করলে অনুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই। আগস্ট, ১৮২৬-এ 'D' আদ্যক্ষরযুক্ত জনৈক পত্রলেখক লণ্ডনের 'খ্রীশ্চান অবজার্ভার' পত্রিকায় এক পত্র লিখে যতশীঘ্র সম্ভব আইন করে এ-প্রথা রদ করার কথা বলেন।[৫২]

শুধু পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে বিতর্কের সময় মাঝে-মাঝে সতীপ্রসঙ্গ উঠত। ব্যাপারটা জমে ওঠে ১৮২৭-এর মার্চে। ২১শে মার্চ সতীপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে মিঃ পয়েণ্ডার দীর্ঘ বক্তৃতার সূত্রপাত করলেন। কিন্তু

সেদিন তাঁর বক্তব্য শেষ না হওয়ায় অধিবেশন ২৮ তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

২৮ মার্চ। বুধবার। অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পয়েণ্ডার। কাগজপত্র নিয়ে তিনি রেডি। সতীপ্রথার বীভৎসতা ও এ-প্রথার বিপক্ষে কে কি বলেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে তিনি দেখাতে চাইলেন, অনায়াসেই এ-প্রথা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। ৭ ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা। শুনতে শুনতে অনেকেই হাই তুলতে থাকেন। কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিনা জানি না। তাঁর স্বদেশবাসীর উদাসীনতায় পয়েণ্ডার দুঃখ পেলেও হাল ছেড়ে দেন নি। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে স্যার সি. ফবেস মিঃ পয়েণ্ডারের বক্তব্যকে সমর্থন করে মানবতার দিক দিয়ে এ-প্রথাকে বিচার করে দেখতে সদস্যদের অনুরোধ জানালেন।

মিঃ পয়েণ্ডারের বক্তব্যের সঙ্গে মেজর কারনাক ও কর্নেল স্টানহোপ একমত হতে পারলেন না। মিঃ স্টানহোপের জবাবটি সবচেয়ে জোরদার হয়। বলপ্রয়োগে সতী নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন না করে, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ও ফ্রী প্রেসের প্রসারের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার পক্ষে তিনি মতপ্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে জেনারেল থর্নটন বললেন, মিঃ পয়েণ্ডারের ভারত সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই; এ-প্রথা নিবারণের ঝুঁকি যে কতখানি—তা ভারত-সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তারাই জানে। চেয়ারম্যানও তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন। মিঃ পয়েণ্ডার যে শুধু নিজের পক্ষ সমর্থনকারীদের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন, এর বিরুদ্ধবাদীদের কথা কিছুই বলেন নি—এই অনুযোগ করে চেয়ারম্যান বললেন, আমরা সবাই এ-প্রথার বিরুদ্ধে, মতভেদটা এ-প্রথার অবসান কিভাবে হতে পারে তাই নিয়ে।

বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ডঃ গিলক্রিস্ট বললেন, যার কোনো আত্মীয়া সতী হবে, তাকে যদি কোম্পানির চাকরির অযোগ্য ঘোষণা করা হয়, তাহলে এ-প্রথার একরকম অবসান হবে। বলপ্রয়োগে একে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে অবশ্য তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি।

ব্যাপারটা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে লাগল। সভার পরিবেশ ক্রমেই উত্তপ্ত। একের পর এক বক্তব্য রাখলেন মিঃ জ্যাকসন, স্যার ডাওলি, মিঃ উইগ্রাম, মিঃ টুইনিং, মিঃ জে. মার্টিন, ক্যাপ্টেন ম্যাক্সফিল্ড প্রভৃতি। অধিকাংশই বলপ্রয়োগে

এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। এই নিয়ে মতভেদ—কথা কাটাকাটি। একজনের বক্তব্য শেষ হতে না হতে আব একজনের উঠে দাঁড়ানো—এবই মধ্যে সভার কাজ চলল। অনেক তর্কবিতর্কের পর বিষয়টি কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের হাতে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়।[৫৩]

কোর্ট অব ডিবেক্টর্স ২৫ ৭ ১৮২৭-এ এক চিঠিতে ইংলণ্ডে এ-বিষয়ক উত্তেজনার কথা স্বীকার কবে এই আশা প্রকাশ করেন: 'that the progress of education and the diffusion of knowledge will gradually effect the extinction of this barbarous rite.'[৫৪]

এদিনেব সভার বিবরণ বেশ ক'মাস পরে কলকাতায় পৌঁছলে সতী সমর্থক 'সমাচার চন্দ্রিকা' কর্নেল স্টানহোপকে তাঁর ভূমিকার জন্য সাধুবাদ জানায়।

শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে বিতর্কের সময়েই নয়, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবেদন আসতে থাকে। ১৮২৩-এই বেডফোর্ডের অধিবাসীরা এ-প্রথাব উচ্ছেদ দাবি করে পার্লামেণ্টে এক আবেদন পেশ কবে। ১৮২৬-এ এডিনবার্গের কাছে ক্রেল-এব বাসিন্দারাও বিষয়টি সম্পর্কে তাদেব উদ্বেগেব কথা পালামেণ্টে জানায়। ১৮২৭-এ এ-প্রথার উচ্ছেদ দাবি করে ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমপক্ষে ২১টি আবেদন পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়।[৫৫] ২৩.৫.১৮২৯-এ 'দি ক্যালকাটা গেজেট এ্যণ্ড কমার্শিয়ল এডভার্টাইজরে' প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যায়, পালামেণ্টের গত অধিবেশনে ভারতবর্ষে সতীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ২৫টি আবেদন এসে পৌঁছেছে। কলকাতার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদেব তবফ থেকেও পার্লামেণ্টে সতী নিবারণকল্পে একটি আবেদন পাঠান উচিত বলে প্রসঙ্গত পত্রলেখক মন্তব্য করেন।

ইংলণ্ডে যখন ভাবতের মেয়েদের জন্য চোখের জলের নদী সৃষ্টির কম্পিটিশন চলছে, এদেশে তখন গবর্নর জেনারেল আমর্হাস্টের বিদায় নেবাব পালা। তাঁর ওপর কোম্পানির ডিরেক্টররা একটু অসন্তুষ্ট। কারণ, তাঁর আমলে বর্মা-যুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক ঘাটতি। আমর্হাস্ট ঠিক সামলে চলতে পারছেন না, একটু শক্ত হাতে হাল ধরা দরকার। কোম্পানির কর্মকর্তাদের তখন মনে পড়ল বেন্টিঙ্কের কথা। হ্যাঁ, এই মানুষটার তো অর্থকরী ব্যাপারে প্রচুর সুনাম আছে। কিন্তু ডিবেক্টরবা তাঁকে চাইলে

হবে কি, প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্যানিং-এর পছন্দসই লোক নন তিনি। তাই অনেক টালবাহানা করার পর শেষপর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান এল তাঁর কাছে। ১৮২৭-এর জুলাই মাসে ইংলণ্ডে তিনি ভারতের পরবর্তী গবর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ভারতে এসে পৌছতে পৌছতে কেটে গেল আরো একটা বছর। এরমধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। ভারতের দিকে দিকে সতীর চিতা কিন্তু জলেই চলেছে।

৪ঠা জুলাই, ১৮২৮। শুক্রবার। আবহাওয়া সুবিধের নয়। তা সত্ত্বেও এসপ্ল্যানেড আর তার আশেপাশের ঘাটগুলোতে সকাল থেকেই উৎসুক জনতার ভিড়। হবে না? ভারতের নতুন গবর্নর জেনারেল আসছেন যে আজকে। ক্রমে পাঁচটা বাজল, অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। কিন্তু কোথায় কে! পাঁচটা চল্লিশ নাগাদ অনেকদূরে নদীর বুকে মনে হল যেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী, অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকীয় বহর 'এণ্টারপ্রাইজ'কে দেখা গেল জল কেটে এগিয়ে আসতে। সন্ধ্যা ৬টার অল্পপরে চাঁদপাল ঘাটে নেমে বেণ্টিঙ্ক পালকি চড়ে সোজা গবর্নর হাউসে।

মন্দ আবহাওয়া মাথায় নিয়ে সকাল থেকে যারা দাঁড়িয়েছিল, চোখের দেখাও দেখতে না পেয়ে হতাশ হল তারা। দু'একটা টুকরো কথা তাদের কানে ভেসে এল। কি সুন্দর চেহারা গবর্নর জেনারেলের, পরনে তাঁর লাল কোট, শুনেই তারা মহাখুশি। সন্ধ্যার পর জনতা ঘরে ফিরছে, অনেকের মুখে গদগদ ধ্বনি 'লাল কোট সাহেব, বহুত আচ্ছা'।[৭৬]

'লাল কোট সাহেব' বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-এ প্রথম কলকাতায় এলেও, ভারতে তিনি নবাগত হন। ১৮০৩-এ মাদ্রাজের গবর্নর হয়ে এদেশে এসেছিলেন তিনি। সময়টা অবশ্য তখন ভালো কাটে নি। সেনাবাহিনীতে নতুন ধরনের পোষাক চালু করা নিয়ে তাঁর শাসনকালে ১৮০৬-এ ভেলোরে বিদ্রোহ দেখা দেয়; সব দোষ পড়ে বেণ্টিঙ্কের ঘাড়ে। সেই দোষের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৮০৭-এর সেপ্টেম্বরে তাঁকে মাদ্রাজের গবর্নরপদ ছাড়তে হয়।

কিন্তু ১৮২৮-এ বেণ্টিক ২৯ বছরের তরুণ নন, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ৫৪ বছরের প্রৌঢ়। টাকাকড়ির ব্যাপারটা বোঝেন ভালো, এদেশীয় জনমনও তাঁর অপরিচিত নয়। এবার এসেছেন অনেকবেশি দায়িত্ব নিয়ে। সাহসী, দৃঢ়চরিত্রের সকলের পছন্দসই মানুষ তিনি। কলকাতা পৌছনোর তিন সপ্তা

পরে চার্লস মেটকাফ তাঁর সম্পর্কে চারটি বিশেষণ প্রয়োগ করলেন 'straight forward, honest, upright, benevolent.'

এদেশে এসে প্রথমেই তিনি মন দিলেন ব্যয়সঙ্কোচে। নভেম্বর, ১৮২৮-এ সৈন্যবাহিনীর বাট্টা অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। ব্যয়হ্রাসের জন্য দেশীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের সিদ্ধান্তও নিলেন। দেখা গেল, তিনি হাল ধরায় তাঁব আমলে কোম্পানির ঘাটতি মিটে উদ্বৃত্ত হচ্ছে।

এবার অন্য বিষয়। এই যে বছব বছর এতগুলো মেয়ে জ্যান্ত পুড়ে মরে, এ ব্যাপারটা কি! ১৮০৬-এ মাদ্রাজে থাকাকালীন ফ্রেঞ্চ মিশনরি ডুবাস-এর লেখার মধ্য দিয়ে সতীপ্রথা সম্পর্কে বিরূপ একটা ধারণা সম্ভবত তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডের সতীবিরোধী আন্দোলনেব এক নেতা ফাউয়েল বাক্সটনের সঙ্গে তো তাঁর শালা-ভগ্নীপতির সম্পর্ক, এই আন্দোলনের আরেক নেতা চার্লস গ্রাণ্ট তাঁর গুরুস্থানীয়। সতীবিষয়ে বেণ্টিঙ্কের বিরূপতা গড়ে তুলতে এঁরাই যথেষ্ট। ইংলণ্ডে থাকাকালীন ব্যাপারটা যে তাঁব গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা ১২. ১১. ১৮২৮-এ লর্ড কম্বারমেয়ারকে লেখা তাঁর চিঠি থেকেই জানা যায়:

'Having had the Suttee question very much pressed upon my attention in England, and feeling the great responsibility which under any view of the case and under any decision must belong to me, both in my private and public capacity. I came to this resolution for my own future comfort, that as soon as possible I would come to a decision upon the question in some way or other'[৫৭] এদেশে আসার কিছুদিন পরেই ১২. ১. ১৮২৯-এ মিঃ এসটেলকে লিখলেন, 'ব্যাপারটা একমুহূর্তও আর সহ্য করা যায় না। পরলোকে তাহলে জবাবদিহি করব কি?'[৫৮] কিন্তু দুম করে তো কিছু করে ফেলা যায় না। নরাপত্তার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। দেখলেন, তাঁর পূর্বসূরী লর্ড হেস্টিংস আর লর্ড আমর্হাস্ট দুজনেই সৈন্যবাহিনীতে বৃহৎ গণ্ডগোলের আশঙ্কায় এ-প্রথায় হস্তক্ষেপ করেন নি।

বেণ্টিঙ্ক প্র্যাকটিকাল লোক, পরের মুখে ঝাল খেতে অভ্যস্ত নন। সতীপ্রথা নিবারণ করলে সেনাবাহিনীতে গণ্ডগোল দেখা দেবার সম্ভাবনাকে তিনি যাচাই করে দেখতে চাইলেন। সেইমতো ১০ ১১. ১৮২৮-এ সেনাবাহিনীর ৫৩ জন

অভিজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অফিসারের কাছে 'গোপনীয়' চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থাগ্রহণ করলে দেশীয় সেনাবাহিনীতে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে জানতে চাওয়া হল। ৫৩ জনের মধ্যে ৫ জন এ-প্রথায় কোনোরকম হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন, ১২ জন এ-প্রথা নিবারণের সমর্থক হয়েও, সরকারি আদেশে আইন করে তা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারলেন না। ৮ জন বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্যদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে এ-প্রথা নিবারণের কথা, বাদবাকি ২৮ জন অবিলম্বে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার কথা বললেন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়ে বললেন, সিপাইরা সতীপ্রথা সম্পর্কে আদৌ উৎসাহী নয়।[৫৯] বেন্টিঙ্ক দেখলেন, সতী নিষিদ্ধ হলে সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে—এ আশঙ্কা অমূলক! আর একটা বিষয়ও তিনি ভেবে দেখলেন। সতীপ্রথার প্রধান কেন্দ্র বাংলা। বাংলার মানুষ যুদ্ধবাজ নয়, উপরন্তু তারা সরকারের অতিশয় বাধ্য।[৬০] সতী নিবারিত হলে বাংলার মানুষ যে বিদ্রোহ করবে না—তা জানা কথা।

শুধু সেনাবাহিনীর অফিসারদেব কাছেই নয়, ইউরোপীয় সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তিনি এ-ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলেন। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এইচ. এইচ. উইলসন এই অমানবিক প্রথার বিরোধী হয়েও ২৫ ১১. ১৮২৮-এ সরকারের মিলিটরি সেক্রেটরির কাছে হিন্দুদের ধর্মীয় এই প্রথায় যে কোনোপ্রকার সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে জানালেন 'My opinions are adverse to any authoritative interference with the practice'.[৬১] ১৮২৮-এ নিজামতের পাঁচজনের মধ্যে চারজন বিচারপতি এ-প্রথার আশু অবসান সম্ভব বলে মত প্রকাশ করলেন। ১৮২৯-এ নিজামতের বিচারপতিরা সবাই এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। শুধু বিচারপতিরাই নয়, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের পুলিশ সুপাররাও একবাক্যে জানান, সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা ছাড়াই সতী নিবারিত হতে পারে। ১৬. ২. ১৮২৯-এ গবর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে সতী নিবারণ ও তীর্থকর রদ করা সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে ইউরোপীয় সমাজের ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এঁদের মধ্যে ৭ জন আইন করে বা অন্য উপায়ে সতী নিবারণের পক্ষে হলেও, তীর্থকর রদের বিপক্ষে, ২ জন সতী নিবারণ ও তীর্থকর রদের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। ৪ জন সতী নিবারণের ফলে বিপদের আশঙ্কা না থাকলেও অসন্তোষ সৃষ্টি হবে সেকথা বলেন, আইনের সাহায্যে এ-প্রথায় হস্তক্ষেপের

যৌক্তিকতা বিষয়েও তাঁরা প্রশ্ন তোলেন।[৬২] সতী-নিবারণ নিয়ে যখন এইরকম তৎপরতা চলেছে, তখন ১৮২৯-এর মে-তে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১১ জন ব্যাপটিস্ট এবং অন্যান্য আরো ৮ জন মিশনরি স্বাক্ষরিত একটি আবেদন বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করে বীভৎস সতীপ্রথার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হল, ধর্মীয় আবরণে এই স্ত্রীহত্যা সহ্য করা সরকারের উচিত নয়। যদি কোনো হিন্দু তার অসহায় মাকে পুড়িয়ে মারা ধর্মীয় কৃত্য বলে মনে করে, তাহলে যে সরকারের ওপর ওই মায়ের জীবনরক্ষার ভার—তাদেরও তাই ভাবতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।[৬৩] জনমতও ক্রমেই এ-প্রথা নিবারণের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। সেসব ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও সতী বিষয়ে অবাধ আলোচনা চলতে দিয়ে বেন্টিঙ্ক সংবাদপত্রগুলিকে জনমত সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করলেন। সতী সংখ্যাও দেখা গেল বছর বছর কমছে। সবদিক দেখেশুনে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে বেন্টিঙ্ক এ-বিষয়ে একরকম মনস্থির করে ফেললেন। কিন্তু চূড়ান্ত প্রস্তাব কাউন্সিলের কাছে রাখার আগে একটি মানুষের মতামত তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হল। মানুষটির নাম রামমোহন রায়।

হাঁ, এই মানুষটিকেই আমরা ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কালীঘাটে নীলুর বউদের সতী না হবার জন্য অনুনয় করতে দেখেছি। বেন্টিঙ্ককে তিনি সতীনিবারণ সম্পর্কে কি বলেছিলেন, তা জানার আগে চলুন, ১৮১৭ থেকে ১৮২৯ দীর্ঘ এই ১২/১৩ বছর ধরে এই মানুষটি এ-বিষয়ে কি করেছিলেন, বাঙালিসমাজই বা এ-বিষয়ে কি ভাবছিল একটু দেখে আসি।

১০। রামমোহন ঠিক কি করেছিলেন ?

প্রচলিত একটা কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক :

গঙ্গাতীরে একটি চিতা প্রস্তুত। কলকাতার নামকরা ধনী বীরনৃসিংহ মল্লিকের 'পরিবারস্থ' এক মহিলা সেখানে সতী হবেন। সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, এমনসময় রামমোহন রায় সেখানে এসে হাজির। রামমোহনের নাম তখন অনেকের কাছেই অল্পবিস্তর পরিচিত। লোকটা নাকি প্রতিমা পুজোর বিরোধী, রাজপুরুষের কাছে খাতিরও খুব। কেউ তাঁকে বলে খ্রীস্টান, কেউ মুসলমান। ভদ্রলোক নাকি অসাধারণ পণ্ডিত, সেইসঙ্গে মদে-মাংসে ও বাইনাচেও নাকি আপত্তি নেই।[১] এহেন লোক সশরীরে উপস্থিত—কাজেই সমবেত দর্শকদের মধ্যে অদম্য কৌতূহল।

উপস্থিত কর্তাব্যক্তি ও মহিলাটির আত্মীয়দের রামমোহন বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন, এটা ঠিক নয়, সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্যে কাল কাটানোই মেয়েদের পক্ষে শ্রেয়। সতী পরম পুণ্যকর্ম—তাতে উটকো এই বাধা দেখে সতীর আত্মীয়বন্ধুরা তো ক্ষেপে আগুন। প্রথমে ভদ্রতা বজায় রাখলেও, পরে তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা দায় হয়ে উঠল। একজন তো প্রচণ্ড রেগে তাঁকে বলেই বসল, সতী হিন্দুদের ব্যাপার, এখানে আপনি নাক গলাতে এসেছেন কোন অধিকারে 'হিন্দুর কার্য্যে মুসলমান কেন ?'[২]

সতী-বিষয়ে রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত গল্পকাহিনীগুলির মধ্যে এটিও একটি। কারণ, পাথুরেঘাটার মল্লিকবংশ রক্ষণশীল হিন্দু হলেও এই পরিবারে উনিশ শতকের প্রথম পাদে সতীপ্রথা প্রচলিত ছিল এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। ২. ৯. ১৮২১-এ বীরনৃসিংহ মল্লিকের কাকা নীলমণি মল্লিকের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন নি। এই পরিবারের কর্তা বৈষ্ণবদাস মল্লিক 'ধর্মসভা'র উৎসাহী সদস্য হলেও, তাঁর বড়ছেলে বীরনৃসিংহ ১৮২৯-এ সতীপ্রথায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে গবর্নর জেনারেলের কাছে প্রদত্ত রক্ষণশীলদের আবেদনপত্রে সই পর্যন্ত করেন নি।

তবু সতী সম্পর্কে বাঙালিসমাজের মনোভাব প্রসঙ্গে রামমোহনের কথা এসে

পড়েই। কারণ, এই মানুষটি সভা-সমিতি করে, পুস্তিকা লিখে, রাজদরবারে আবেদন করে, শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে কায়মনোবাক্যে সতীর বিরুদ্ধতা করে গেছেন।

সতীর বিরুদ্ধে লড়ায়ে নামার প্রেরণা রামমোহন পেয়েছিলেন কোথা থেকে? তাঁর ভক্ত-জীবনীকাররা বলেছেন, তিনি নাকি তাঁর বউদি অলকমণি বা অলকমঞ্জরীকে চোখের সামনে সতী হতে দেখে প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন বাঁচবেন, ততদিন এই ভয়ঙ্কর প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবেন। রামমোহন-অলকমঞ্জরী কাহিনীর উৎস নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন-জীবনী। রাজনারায়ণ বসু তাঁর বাবা নন্দকিশোর বসুর কাছ থেকে শোনা এই 'গল্প'টি রামমোহন রায়ের স্মরণসভায় (সম্ভবত ৭ মাঘ, ১৮০০ শকে অনুষ্ঠিত) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন। এই সভায় নগেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কাহিনীটি তিনি তাঁর রামমোহন-জীবনীতে স্থান দেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের দুটি জায়গায় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন (১৩৮১ সংস্করণ, পৃ ১৪-৫ ও ১৭৮)। প্রথম-ক্ষেত্রে ঘটনাকাল ১৮১১, ঘটনাস্থলে রামমোহন নিজে উপস্থিত থেকে অলক-মঞ্জরীকে সতী না হবার জন্য বুঝিয়েও ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ঘটনাকাল ৮ এপ্রিল, ১৮১০। রামমোহন তখন রংপুরে। তার মা তা নিবারণ করেন নি বলে রামমোহন নাকি বাড়ি এসে মাকে অনুযোগ করেন। একই লেখকের একই বইতে একই ঘটনা মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ব্যবধানে যখন ভিন্নরূপ নেয়, তখন তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আলোচ্য গল্পকাহিনীটি প্রথম শোনা যায় রামমোহনের মৃত্যুর ৩৯ বছর পরে এমন একজনের মুখে যিনি 'স্বীয় স্বাভাবিক কবিত্বে স্থলবিশেষ অনুরঞ্জিত করেন। কাহিনীটিকে যিনি লিখিতরূপ দেন তিনি আবার ঘটনাটি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী কথা লেখেন। তাছাড়া রামমোহনের দাদা জগমোহনের মৃত্যু হয় ১৮.. খ্রীস্টাব্দে, এ-সময় রামমোহন যে রংপুরে ছিলেন না, রায়-পরিবারে সতীপ্রথা যে প্রচলিত ছিল না—এসবই একনিষ্ঠ রামমোহন-গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। তবু আধুনিক রামমোহন-ভক্তরা রামমোহনের সতীপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মূলে যে এই পারিবারিক ঘটনাটি তা বলতে ছাড়েন না।[৩]

আসলে গভীর অধ্যয়ন, মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ও মিশনরিদের সতী সম্পর্কিত কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিতি, ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদির ফলে

গড়ে ওঠা অগতানুগতিক চিন্তাধারাই তাঁকে প্রাণিত করেছিল সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ১৮১৪-তে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করার পরই তাঁর এ-বিষয়ক কর্ম-তৎপরতা রূপ পায়।

কলকাতায় এসে নিজের একেশ্বরবাদী মতামত প্রচার করে, একদিকে তিনি যেমন অনেক শত্রু সৃষ্টি করলেন, অন্যদিকে তাঁর মতবাদ আকৃষ্ট করল কিছু মধ্যবয়সী বিত্তবানকে। এদের নিয়েই ১৮১৫-তে স্থাপিত হয় 'আত্মীয় সভা'। সভা প্রথমে বসত রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে, পরে স্থানান্তরিত হয় তাঁর সিমলের বাড়িতে, কিছুদিনের মধ্যে তা আবার ফিরে আসে তাঁর মানিকতলার বাড়িতে। পরে পালা করে বিভিন্ন 'আত্মীয়ের' বাড়িতে বসত তা।

'আত্মীয় সভা' মূলত ধর্মীয় সভা হলেও আলোচনা সবসময় ধর্মীয় বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকত না, সামাজিক নানা প্রসঙ্গও এখানে উঠত। সহমরণ-বিষয়েও আলোচনা হত। রবিবার, ৯ মে, ১৮১৯-এ রাধাচরণ মজুমদারের ছেলে কৃষ্ণমোহন ও ব্রজমোহন মজুমদারের বাড়িতে 'আত্মীয় সভা'র এক অধিবেশনে রামমোহন রায় ও অন্যান্য বৈদান্তিকরা মিলিত হন। সভায় 'যুবতি স্ত্রীর স্বামী মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা' হয়।[8] এর আগেও বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়েছিল অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

সরকার যে সতীবিষয়ে ক্রমেই মনোযোগী হয়ে উঠছিলেন, ১৮১৩/১৮১৫/১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে সতী সম্পর্কে প্রচারিত বিধিনিষেধগুলিই তার প্রমাণ। এইসব বিধিনিষেধের ফল কিছুটা ফলেছিল তা দেখে এসেছি। কালপ্রচলিত প্রথার ওপর এ-ধরনের বিধিনিষেধজারিতে রক্ষণশীল কিছু ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এবং এই কারণে আনুমানিক ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি গবর্নর জেনারেলের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে এক আবেদনপত্রে এইসব বিধিনিষেধকে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক বলে এগুলি তুলে নেবার আবেদন জানান হয়। প্রতিবাদ এল বাঙালিসমাজের তরফ থেকেই।

আগস্ট, ১৮১৮ নাগাদ গবর্নর জেনারেল হেস্টিংস কলকাতায় ফিরে এলে, কলকাতার বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত হিন্দু এ-বিষয়ে এক আবেদন করে পূর্বোক্ত আবেদনকারীদের হয় নিজেদের শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা অমানুষিক নির্মম এক সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেন। এতে বলা হয়, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ

করতে অথবা শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে সহমরণের সঙ্কল্প ঘোষণার পর বলপূর্বক মেয়েদের সতী করা হয়, আসলে এগুলি হত্যা ছাড়া কিছু নয়।

উপপতির সঙ্গে পুড়ে মরা, ব্রাহ্মণীর অনুমৃতা হওয়া, স্বামীর মৃত্যুর বহুবছর পরে সতী হওয়া, অপ্রাপ্তবয়স্কা, গর্ভবতী, দ্বিচারিণী, শিশুসন্তানের মা প্রভৃতির সতী হওয়া প্রাকৃতিক, নৈতিক এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের পরিপন্থী—এগুলি নিছক আত্মহত্যার ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধগুলি তুলে নিলে তা হবে ব্রিটিশজাতির মানবতা ও মহামান্য সরকারের পক্ষে অপমানজনক। মনু যে এরকথা বলেন নি, বেদান্ত-গীতাও যে এ বিষয়ে নীরব তা বলে. শাস্ত্রমতে কাম্যমরণ নিন্দনীয় দেখিয়ে আবেদনকারীরা জ্ঞানী, বিচক্ষণ, মানবিক সরকার বাহাদুর সতী-বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো ব্যবস্থাদি নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।[৫]

এই আবেদনপত্রটি রচনা ও সরকারের কাছে পেশ করার ব্যাপারে রামমোহনের যে হাত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ দেখতে পাই ১৮১৭/১৮ থেকেই রামমোহন সতী-বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, এবং কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে-গিয়ে মেয়েদের সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন। সমকালে তিনি যে বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা করছিলেন, তার প্রমাণ এই বছরই তার সতী সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ। এছাড়া ১৮১৫-তে 'আত্মীয় সভা' স্থাপনের পর রামমোহন-অনুরাগী একটি ছোট সম্প্রদায় গড়ে ওঠে—তা বলে এসেছি। ১৮১৬-তেই তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা দাঁড়ায় শ-পাঁচেক। এরা আপস করে পথ চললেও, অনেকক্ষেত্রে এদের চিন্তাধারা ছিল অগতানুগতিক। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামমোহনের সতী সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি নখদর্পণে থাকায় তিনি তাঁর ভক্তশিষ্যদের তা ব্যাখ্যা করে, তাঁদের এই ধরনের একটি আবেদনে সই করতে প্রাণিত করেন বলে মনে হয়। তাছাড়া, উনিশ শতকের প্রথমদিকে রামমোহন ছাড়া বাঙালিসমাজে অন্য কোনো সতী-বিরোধী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এতবড় ছিল না, যিনি এ-বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন বা নিজের সমর্থনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর যোগাড় করতে পারেন।

একদিকে শাস্ত্রীয় বিতর্ক, অন্যদিকে আবেদন-নিবেদন—এই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি রামমোহনকে। হেস্টিংসের কাছে আবেদন পেশ করার মাস তিনেক পরে রামমোহন 'সহমরণ বিষয় 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশ করে বৃহত্তর জনসমাজে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরে এ-প্রথার বিরুদ্ধে জনমত

গঠন করতে চাইলেন। সতীপ্রথাকে নিয়ে তিনিই সম্ভবত প্রথম বাংলায় পুস্তিকা লেখেন। হরচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসে' ১০০০ কপি নিজব্যয়ে ছাপিয়ে বিনামূল্যে সর্বত্র তা বিলি করলেন। ২২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে কথোপকথনচ্ছলে সতীপ্রথার শাস্ত্রীয়তা আলোচনা করে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরোধী সতীপ্রথা 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা' ছাড়া কিছু নয় দেখালেন। পুস্তিকাটি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাটিব ব্যাপক প্রচারে ঘটনাটি সাহায্য করে।

বিষয়টির দিকে ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০. ১১ ১৮১৮-তে রামমোহন এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরেজি অনুবাদটিও তিনি ১০০০ কপি ছাপান। রামমোহনের পুস্তিকার ইংবেজি অনুবাদটি ২৪.১২.১৮১৮-এ পুনর্মুদ্রিত করে প্রসঙ্গত 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' মন্তব্য করে, 'হিন্দু শাস্ত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই সতী-বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার নিরাপদ পথ। আর রামমোহনের পুস্তিকায় তা সযত্নে করার ফলে, প্রাচীন এ প্রথার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে।' পরের দিন 'ক্যালকাটা জার্নালে' পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত পবিচয় দেওয়া হয়। ঠিক এর পরের দিন ২৬ ১২. ১৮১৮-তে 'সমাচার দর্পণ' পুস্তিকাটিব স্থূল মর্ম প্রকাশ করে সহমরণ বিষয়ে যথার্থ বিচারে শাস্ত্রে যে কিছু পাওয়া যায় না, তার উল্লেখ করে। সমকালে বামমোহনের পুস্তিকাটির সবচেয়ে বিস্তৃত ও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।'[৬] 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল'ও এই বছরের ডিসেম্বর সংখ্যায় পুস্তিকাটির সপ্রশংস উল্লেখ করে এর অংশবিশেষ উদ্ধার করে। শুধু এদেশেই নয়, ইংলণ্ডের 'মিশনরি রেজিস্টার' ও অন্যান্য পত্রিকায় রামমোহনের পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

ছোট্ট একটি পুস্তিকা, কিন্তু কি প্রচণ্ড তার শক্তি—বাঙালিসমাজকে রীতিমতো কাঁপিয়ে দিল। একজন হিন্দু সতীপ্রথার অশাস্ত্রীয়তা দেখাচ্ছেন, একে 'স্ত্রীহত্যা' বলে অভিহিত করছেন—এসব কাণ্ড তখনকার সমাজে বুকের পাটা না থাকলে কেউ করতে পারে না। ব্যাপার দেখে রক্ষণশীলরা সতী-প্রথাকে সমর্থন করতে উঠেপড়ে লাগলেন। ১৮১৯-এ রামমোহনের পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করেন। প্রত্যুত্তরটি রচনা করতে সময় লাগল পুরো ১ বছর। কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা ২৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি রচনায় কাশীনাথ বহিরঙ্গ-

রীতিতে রামমোহনকে অনুসরণ করেছেন। যদিও উভয়ের মনোভঙ্গির পার্থক্য গ্রন্থসূচনাতেই লভ্য। রামমোহন যেখানে গ্রন্থশীর্ষে 'ওঁ তৎসৎ' দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করেছেন, কাশীনাথ সেখানে শুধু যে 'শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং' দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করেছেন তাই নয়, তাঁর পুস্তিকাটির সমাপ্তিবাক্য 'এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মণ্ডুক শ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়'— তাঁর রক্ষণশীল জরাজীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। যাঁর মনোভাব এমন, তিনি কালপ্রাচীন সতীপ্রথাকে কি চোখে দেখবেন, সহজেই বোঝা যায়। ১৮১৯-এর অক্টোবর সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পুস্তিকাটির ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনায় কাশীনাথের প্রতিটি বক্তব্যকে যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই সমালোচনাটি থেকে জানা যায়, যারা এখনও এই বীভৎসপ্রথা ত্যাগে অনিচ্ছুক, তাদের মধ্যে প্রচারের জন্য রামমোহন রায় এর একটি প্রত্যুত্তর রচনা করেছেন। শীঘ্রই পুস্তিকাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে, তিনি ইংরেজদের অনুগৃহীত করবেন বলে সমালোচক আশা প্রকাশ করেন।[৭]

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সমালোচককে নিরাশ করেন নি রামমোহন। ১৮১৯ খ্রী. কলকাতা মিশন প্রেস থেকে তাঁর 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশিত হয়। ৩৩ পৃষ্ঠার এই বাংলা পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২০-র ফেব্রুয়ারি মাসে। অনুবাদটি রামমোহন হেস্টিংস-পত্নীকে উৎসর্গ করেন। একটি কথা। সহমরণ বিষয়ে প্রথম পুস্তিকাটি বাংলা ও ইংরেজিতে রামমোহন ১০০০ কপি করে ছাপলেও, এ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকাটির বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ দুই-ই মাত্র ৫০০ কপি করে ছাপলেন কেন? অর্থাভাবে নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কি যতখানি বলা হয়, রামমোহনের সতীবিষয়ক পুস্তিকাদুটি ততখানি প্রচার লাভ করে নি?

যাই হোক, কাশীনাথকে উত্তর দিতে গিয়ে জ্বলে উঠেছেন রামমোহন। শত্রুসংহারে উদ্যত এ রামমোহন বৈষ্ণব নন, শাক্ত। কখনও বিদ্রূপবহ্নিতে প্রতিপক্ষকে ভস্ম করতে উদ্যত, কখনও আবার ধীর, স্থির, সংযত। দেশাচারসিদ্ধ জিনিস শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় বলে কাশীনাথের মন্তব্যকে খণ্ডন করে রামমোহনের উত্তর: 'স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ইত্যাদি দারুণ পাতকসকল দেশাচারবলেতে ধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না।'

প্রত্যুত্তর দেবার সময় রামমোহনের নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি যুক্তিনিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম পরিহাসরসিকতা পুস্তিকাটিকে স্বাদু করে তুলেছে। কাশীনাথের

গ্রন্থে বিধায়ক স্ত্রীলোকের প্রতি যেসব দোষারোপ করেন (যেমন তাঁরা অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসঘাতী, সানুরাগা, ধর্মভয়হীন ইত্যাদি) রামমোহন তাঁর পুস্তিকায় দৃঢ়ভাবে সেগুলি খণ্ডন করেন।

রামমোহনের শেষ আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে :

'দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ হইতে রক্ষা পায়।' সতী সম্বন্ধীয় সবকটি বাংলা রচনার মধ্যে ভাব, ভাষা, আন্তরিকতা ইত্যাদি দিক দিয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী। অবশ্য প্রথম পুস্তিকার মতো এটিতেও কিভাবে সতীপ্রথা নিবারিত হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই নীরব।

রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদের জন্য 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' আগ্রহ প্রকাশ করলেও, ইতিমধ্যে খ্রীস্টধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনরিদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পুস্তিকাটি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে না। তাই বলে অন্য পত্রিকাগুলি নীরব রইল না। রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকাটির আলোচনা করতে গিয়ে 'ওরিয়েণ্টল ম্যাগাজিনে'র সমালোচক বললেন : 'এদেশীয়দের ধর্ম ও নৈতিকতার উন্নয়নের জন্য এই বিদগ্ধ ও বিখ্যাত হিন্দুসন্তানের প্রচেষ্টা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ভারতের নারীজাতির অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে আমরা মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানাই। খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে আমরা একমত নই। ইংরেজি তিনি তেমন ভালো বলতে পারেন না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় মেলে লেখার মধ্যে। ইউরোপীয় সাহিত্যে তিনি ডুব দিয়েছেন, সাহেবদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও আছে, তাঁর অনুরাগীর সংখ্যাও কম নয়। কলকাতার বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রায়ই তাঁর টেবিলের চারপাশে ভিড় জমাতে দেখা যায়। রামমোহন রায়ের মতো এমন একজন অসাধারণ মানুষের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এই বীভৎসপ্রথা সহজেই আকর্ষণ করবে এটাই তো প্রত্যাশিত। বেদ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই ব্যক্তি একেবারে এ-প্রথার মূল ধরে টান দিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় 'he has ventured to attack this practice in its strong holds—the Hindoo Scriptures themselves—and to prove that they are far from enjoining it.'[৮]

বহু আলোচিত রামমোহনের পুস্তিকাদুটি সতীপ্রথার দুর্বলতা তুলে ধরে,

এবং এ-প্রথার প্রতি অনেকের যুগসঞ্চিত শ্রদ্ধার মনোভাবে ফাটল ধরায়।[৯] একজন হিন্দু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সতীপ্রথার বিরোধিতায় নেমে দেখাচ্ছেন, এ-প্রথা অশাস্ত্রীয়—দেখে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সতীপ্রথার সমালোচনা করাটা এতদিন সাহেবমহলেরই প্রায় একচেটিয়া ছিল, হিন্দুরা এবার এ-প্রথাকে সমালোচনার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন দেখে তাঁরা স্বভাবতই খুশি হয়ে উঠেছিলেন। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে 'গবর্নমেন্ট গেজেট' তাই বলে: 'রামমোহন রায় যুক্তির সাহায্যে তাঁর দেশবাসীকে দেখালেন, সতীপ্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়। একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ তাঁর মাতৃভাষায় এরকম যুক্তি দেখাচ্ছেন এ ব্যাপারটাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু রামমোহন যিনি ইংরেজি লেখায় অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছেন, তিনি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের ব্যাপারটা কি তা জানাতে চাইলেন, আর তাই ইংরেজিতেও এ-প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখে দেখালেন, এ-প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়।'[১০]

পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে সাহেবরা বলার সুযোগ পেলেন—বুঝলে, আমরা খেয়ালখুশিমতো সতীপ্রথার সমালোচনা করি না, হিন্দুরা নিজেরাই এর সমালোচনামুখর—বিশ্বাস না হয়, রামমোহনের বই পড়ে দেখ। ১৮২০-তে উইলিয়ম ওয়ার্ড ইংলণ্ড ভ্রমণকালে সতীর বিরুদ্ধে জনমতসৃষ্টিতে রামমোহনের পুস্তিকাটিকে কাজে লাগান।[১১] ২৮. ৬. ১৮২৩-এ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন তাঁর মিনিটে রামমোহনের পুস্তিকার ও মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করে বলেন, এ-প্রথার শাস্ত্রীয়তা ও গুণাগুণ সম্পর্কে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও সংশয় আছে।[১২] ১৮২৪-এ জে. পেগস তাঁর '*The Suttees' Cry to Britain*' পুস্তিকায় রামমোহনের বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলেন। এদেশে তো কথাই নেই, এমনকি দূর সাগরপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে সতী বিষয়ে বিতর্কের সময় মিঃ পয়েণ্ডার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রামমোহনের পুস্তিকাটিকে কাজে লাগান। সাগরপারের পত্রিকাগুলিও এ-প্রথা যে হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত নয়, হিন্দুরা নিজেরাই এর বিরোধী—রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশের পর জোরগলায় তা বলতে থাকে। ১৮২৩-এর 'এডিনবার্গ ম্যাগাজিনে' রামমোহন সম্পর্কে একটি লেখায় অশাস্ত্রীয় ও নিষ্ঠুর সতীপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘদিনব্যাপী প্রয়াসের সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়।[১৩] 'ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড' লেখে:

'...among the Brahmins themselves great difference of

opinion exists on this very subject. One of this powerful and influential body···published a work, the object of which was to show that the Burning of Widows was not even enjoined by the Hindoo religion, but that the greatest authorities among their early lawgivers taught a diametrically opposite doctrine.'[১৪]

কিছুদিন পরে পত্রিকাটি আবার লেখে :

'Among the authorities against the practice it is highly satisfactory to be able to quote that of one of the most distinguished natives of India, who has risen so superior to the common prejudices of his countrymen, as to enter the lists boldly against them in the fair field of discussion. In a work, published by Rammohun Roy in 1818, ···this learned Brahmin and ardent philanthropist has shown that the practice is not enjoined by the sacred books and lawgivers, which the Hindoos hold in highest reverence, but, on the contrary, repugnant to the fundamental doctrines and genuine principles of their faith'[১৫]

প্রতিক্রিয়া আরো বেশি হল দেশীয়সমাজে। রক্ষণশীলরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একে তাদের ধর্মনাশের চক্রান্ত মনে করলেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ হল রামমোহনের নিত্যপ্রাপ্য। প্রচারিত হতে লাগল তাঁর নামে নিত্যনতুন কুৎসা। প্রশ্ন জাগতে পারে, হিন্দুদের মধ্যে রামমোহনের আগে ১৮০৫-এ ঘনশ্যাম শর্মা ও ১৮১৭-তে মৃত্যুঞ্জয়[১৬] সতীপ্রথার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা সত্ত্বেও এ ধরনের কোনো আলোড়ন তো সৃষ্টি হয় নি। না হবার কারণ, তাঁরা তা স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে করেন নি। চাকরির খাতিরে মতামত প্রকাশ করতে বাধ্য হলেও (তাও আবার সংস্কৃতে), তা সরকারি ফাইলেই চাপা পড়েছিল, জনমনে সামান্য আলোড়নও সৃষ্টি করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রামমোহন লিখলেন বাংলায়, হাটে-বাজারে বিলি করলেন তা, ইংরেজিতে অনুবাদ করে সাহেবমহলে সাড়া জাগালেন, পত্রপত্রিকাগুলি সাগ্রহে তার পুনর্মুদ্রণ বা আলোচনা করল। ফলে প্রতিক্রিয়াও হল ব্যাপক।

দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে ১৮১৮-২০ এই তিনটি বছর রামমোহন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এরপর থেকে তাঁর এ-বিষয়ক কর্মপ্রয়াস অকস্মাৎ যেন থেমে গেল। সতী সম্পর্কে দিকে দিকে আলোচনা চলছে, সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এমন এক উত্তপ্ত মুহূর্তে রামমোহন হঠাৎ কিছুটা নেপথ্যে চলে গেলেন। কিন্তু কেন? একটি সূত্রের ইঙ্গিত পাই 'দি স্কটসম্যান ইন দি ইস্ট' পত্রিকায়।

১৮২৪-এর এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি 'জে. এস' নামে এক ব্যক্তির নিজের চোখে দেখা একটি সতী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করে প্রসঙ্গত মন্তব্য করে, 'সচেতন দেশীয় ব্যক্তিদের হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী নিষ্ঠুর, অমানবিক এই পৈশাচিক প্রথা দমনের জন্য সরকারের কাছে এক আবেদন করতে উদ্যোগী হওয়া উচিত। আমরা যদিও তাই আশা করি, তবু মনে হয় এ-ধরনের আবেদন পেশ করার সময় এখনও আসেনি। আমরা একজন প্রতিভাসম্পন্ন বিশিষ্ট লোকহিতৈষী ব্যক্তিকে জানি যিনি একসময়ে একটি আবেদন পেশ করেছিলেন, কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদে তাঁর উদ্যম ব্যাহত হয়।' ('We understand a gentleman of talent and great philanthropy did at one time bring a petition forward, when the effort was lost by an opposing remonstrances.')[১৭]

এই প্রতিভাসম্পন্ন দেশহিতৈষী ব্যক্তিটি যে রামমোহন রায় তা না বললেও চলে—তাহলে কি তিনি শুধুমাত্র রক্ষণশীলদের প্রতিবাদে বিষয়টি সম্পর্কে নিস্পৃহতা অবলম্বন করেন? আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না।

আসলে ১৮২০-র পর থেকে রামমোহন ধর্ম সম্বন্ধে বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকেন, সমাজ সংস্কারে তাঁর আগ্রহ কিছুটা হ্রাস পায়। মনে হয়, এর পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ট্রাজেডি কাজ করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুখী নন। তাঁর মা তাঁর বিরুদ্ধবাদী, ভাই-ভাইপোর সঙ্গেও সম্পর্ক মধুর নয়। তিনটি বিয়ে করেছেন, একজন অল্পবয়সেই মারা গেছেন, বাকি দু'জনও তাঁর মানসসঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁদের জীবিত-কালেই তিনি তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন।[১৮] সান্ত্বনা খুঁজেছেন কখনও পানপাত্র হাতে নিক্কির নূপুরধ্বনিতে, কখন অন্যত্র আরো সজীব কিছুতে। কিন্তু না, 'তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।' তাই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি যে

ঈশ্বর-অনুভূতির মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজবেন এ-তো স্বাভাবিক। কিন্তু রামমোহন তো ধর্মসাধক নন, ধর্মযোদ্ধা। অনুভূতির রাজ্যে স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কখনও তাই নেমেছেন মিশনরি-সংহারে, কখনও রক্ষণশীলদের টিকি ধরে টান মেরে বলেছেন, যুদ্ধং দেহি।

সতী-আন্দোলনে এদেশীয়দের মধ্যে প্রধান পুরুষ নিঃসন্দেহে রামমোহন, কিন্তু একমাত্র পুরুষ নন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই এদেশীয় জনগণের মধ্যে সতীবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। ১. ৯ ১৭৮৯-এ 'ক্যালকাটা গেজেটে' জনৈক পত্রলেখক জানান, ভারতীয়রা অনেকেই এই প্রথার অবসান চান। পত্রলেখককে তাঁরা জানান, যদি মোটা জরিমানার ব্যবস্থা করা যায়— তাহলে অনেকে 'সতীদাহ' করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং ফলে এই প্রথা উঠে যাবে।[১৯] রামমোহন এ-বিষয়ে আগ্রহী হবার আগে থেকেই শিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিন্দুরা অশাস্ত্রীয় এই প্রথার নিন্দাবাদ করতেন—একথা ক্লড বুকাননের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি।[২০] বাঙালিসমাজের একাংশের সতীবিরোধী এই মনোভাবই উনিশ শতকের প্রথমদিকে রামমোহনের কার্যকলাপের ফলে রীতিমতো আন্দোলনের রূপ নেয়।

এই আন্দোলনের দুই অগ্রপথিক হিসাবে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (জানুয়ারি, ১৮৩০-এ মিঃ কেলডার বেনসনকে লেখা একটি চিঠিতে প্রসন্নকুমারকে 'useful opponent of the Suttee' হিসাবে চিহ্নিত করেন) নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সতী নিবারণে দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহনের বিশ্বস্ত সহযোগী। সমকালেই তাঁর এ ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছিল। হাউস অফ কমন্সে মিঃ এফ বাক্সটন সতী নিবারণে মিশনরিদের অবদানের কথা ঢক্কানিনাদ সহকারে প্রচার করলে 'বেঙ্গল ক্রনিকলে' জনৈক হিন্দু তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, এ ব্যাপারে রামমোহন ও দ্বারকানাথের বিশেষ অবদান আছে এবং তাঁদের কথা বাদ দিয়ে এ-ব্যাপারে যারা কিছু করে নি, তাদের কথা বলাটা ঠিক নয়। পরবর্তীকালে তিনি যখন ইংলণ্ডে যান, বেণ্টিঙ্ক-পত্নী তখন (১৮৪২-এ) একটি পত্রে সতী নিবারণে তাঁর ভূমিকার কথাপ্রসঙ্গে লেখেন, কলকাতার দেশীয়সমাজে রামমোহন রায় এবং আপনি ছিলেন এই ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী এবং এই বীভৎসপ্রথা দীর্ঘকাল দেশাচার বলে গণ্য হলেও তা যে শাস্ত্রসম্মত নয়—এই অতি প্রয়োজনীয় খবরটি সকলের গোচরে আনেন।[২১] রামলোচন ঘোষও এ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৮১৯-এ পাটনা সিভিল

কোর্টের সেরেস্তাদার থাকাকালীন একটি সহমরণ দেখাব পর এ-প্রথা নিষিদ্ধ হওয়াটাই ছিল তাঁর 'নিতান্ত বাসনা'।[২২]

১৮২০-র পর থেকে বামমোহনেব সতী-বিষয়ক কর্মপ্রয়াস ঈষৎ স্তিমিত হয়ে পড়ে—তা দেখে এসেছি। কিন্তু যে উন্মাদনা তিনি তাঁব অনুগামীদেব মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন, তা স্তিমিত হল না। ১৮২১-এর ডিসেম্বরে লোকহিত সাধনের উদ্দেশ্যে তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ কবলেন। পত্রিকার প্রথম আটটি সংখ্যায় সতীবিষয়ে একটি লাইনও লেখা হয় নি। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশেব দু'তিন মাস পবে তাবাচাঁদ দত্তের পুত্র হবিহর দত্ত এর সহকাবী নিযুক্ত হলে অবস্থা অন্যবকম দাঁড়ায়। বামমোহন-ভক্ত হরিহর তাঁব পত্রিকায় সহমবণেব সমালোচনায় ব্রতী হলে, পত্রিকা-প্রকাশক ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌমুদীব সংস্রব ত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' বাব কবেন। সহমরণ-বিবোধী মতামত প্রকাশেব জন্য দেশীয়সমাজ 'কৌমুদী'কে সুনজবে দেখত না। ফলে পত্রিকাটিকে বীতিমতো সংগ্রাম কবে নিজেব অস্তিত্ব বজায় বাখতে হয়েছিল। শুধু পত্রিকাব পৃষ্ঠাতেই নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও হরিহব দত্ত সতীকে মনে করতেন 'স্ত্রী হত্যা'। জনৈক ইউবোপীয়ের কাছে লেখা একটি পত্রে তাঁর এ সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশিত। এই চিঠিটির শেষ অনুচ্ছেদে তিনি লেখেন

'I earnestly Pray to the Almighty Merciful Father, that he may extend his holy blessing to my countrymen in general, by impressing on their minds, the necessity of these notions—'Relieve the oppressed, Judge the fatherless, Plead for the widows.'[২৩] তাঁর সম্পাদিত উর্দু পত্রিকা 'জাম-ই-জাহান্-নুমা'-তেও তিনি সতী নিবারণেব পক্ষে বক্তব্য বাখেন। সহমবণ নিষিদ্ধ হবার পর তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন এরফলে 'দেশের বিশেষ কল্যাণ' হয়েছে। লোকমুখে এ খবর পেয়ে তাঁব বাবা তারাচাঁদ দত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন।[২৪]

আব এক বামমোহন-অনুরাগী ব্রজমোহন দেব তাঁর 'পৌত্তলিক প্রবোধে' লিখলেন :

'যুবতী অথবা বৃদ্ধা ভগিনী কিম্বা পিতামহী কন্যা বধূ ইত্যাদিকে স্বর্গ প্রলোভ দেখাইয়া রজ্জু ও বাঁশ দিয়া বন্ধনপূর্বক দাহ করিয়া থাকহ এরূপ… স্ত্রীহত্যা…সর্বদা অন্যকে করিতে দেখিলে স্বভাবসিদ্ধ বারণ করিতে অবশ্যই

হয়।'[২৫] মনে হয়, যেন রামমোহনের কথাই শুনছি ব্রজমোহনের বকলমে। 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশও রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সতীপ্রথার বিরোধিতা করেন এবং লাটভবনে প্রকাশ্যে ৪/৫ হাজার লোকের সামনে 'সহমরণ নিবারণের যুক্তি তেজোদ্দীপ্ত ভাষায়' সমর্থন করেন।[২৬] এজন্য বেণ্টিঙ্ক পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেন।

এঁরা ছাড়াও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হারিয়ে যাওয়া অনেক অজ্ঞাত, অখ্যাত বাঙালিও এই পর্বে এই প্রথাকে সহ্য করতে পারেন নি। একে ধিক্কার দিয়ে কায়মনোবাক্যে চেয়েছেন এর বিলুপ্তি, পাছে স্ত্রী সতী হয় এই ভয়ে কেউ-কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ে পর্যন্ত করেন নি।

সতী-বিষয়ে দেশীয় চিন্তাও যে যথেষ্ট এগিয়েছিল, তা বোঝা যায় 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত তিনটি চিঠিতে একবার চোখ বুলোলে। প্রথম চিঠিটি ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা। তাঁর শ্বশুর মারা গেলে শাশুড়ি সহমরণে যাবার সঙ্কল্প করেন। ব্রজমোহন এর একান্ত বিরোধী হলেও একপক্ষে তিনি একা, অন্যপক্ষে সবাই। তাঁর মামাশ্বশুর রূপনারায়ণ ঘোষালের মতে তাঁর বোন সতী হতে এসে পেছিয়ে গেলে তাঁর জাত যাবে। এইরকম অবস্থায় অনুষ্ঠানে দর্শক হওয়া ছাড়া ব্রজমোহনের আর করার কিছু নেই।

২৭ ১ ১৮২৬-এ হরকরা-সম্পাদককে এক চিঠিতে মদনমোহন মল্লিক ব্রজমোহনের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে লিখলেন, এ-প্রথা অমানবিক হলেও ব্রজমোহনের শাশুড়ির সহমরণের ব্যাপারে ব্রজমোহনের করার তো কিছুই ছিল না। কিন্তু রূপনারায়ণ ঘোষালকে তাঁর কাজের জন্য সরকারি কর্মচ্যুত করে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত করা হোক। প্রসঙ্গত তিনি জানান, হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও এ কথা লেখা নেই যে, শেষমুহূর্তে কেউ সতী হতে না চাইলে তার আত্মীয়রা জাতিচ্যুত হবে।

৩১. ১. ১৮২৬-এ লেখা আর একটি চিঠিতে শ্যামচরণ শীল মদনমোহনের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করে বলেন, সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণার পর যদি সরকারি আদেশে মেয়েটিকে বোঝানোর ভার কোনো ইউরোপীয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার আত্মীয়দের তার সঙ্গে কথা বলার বা মাদকপ্রয়োগের সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে কখনই মেয়েরা এরকম অমানবিক মৃত্যুকে বরণ করবে না। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি জানান, ছ'বছর তিনি বিপত্নীক হয়েছেন, কিন্তু পাছে তাঁর স্ত্রী সতী হন—এই আশঙ্কায় তিনি পুনর্বিবাহ করেন নি। কারণ, হিন্দু

মেয়েদের তো কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, মা-ঠাকুমার কাছে তারা শুনে আসছে—সতী পরম পুণ্যকর্ম। এরফলে কেউ যদি সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে বসে, তাহলে তার হৃদয়হীন আত্মীয়রা ঐ বিধবাটিকে মৃত্যুর সামনে ঠেলে না দেওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি পায় না।[২৭]

শ্যামচরণ এ-প্রথার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন কিনা তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমাদের কৌতূহল তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে নয়, তাঁর বক্তব্যকে নিয়ে। অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমদিকেই বাঙালিসমাজে ধীরেধীরে হলেও সতী-বিরোধী মনোভাব জেগে ওঠার লক্ষণ রীতিমতো পরিস্ফুট। বাঙালি-সমাজের একাংশের সতীবিরোধী এই মনোভাব বিদেশিদের চোখেও ধরা পড়েছিল। ৪.১১.১৮২৩-এ 'জন বুল' এই প্রসঙ্গে লেখে 'It is well known to be reprobated by very many of the superior Natives and not to be a fundamental part of their religion, but to all intents and purposes an interpolation.' ১৯.৩ ১৮২৮-এ 'থিওফিলাস' নামান্তরালে এক ব্যক্তি 'বেঙ্গল ক্রনিকলে' একটি পত্রে লেখেন, শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্তিবা এই প্রথাকে অমানবিক জ্ঞান করেন। পত্রলেখক আশা প্রকাশ করেন 'The time is not far distant when they will come forward like men, and petition the British Govt. to put an entire stop to the revolting practice' ১০. ১১ ১৮২৮-এ গবর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীব ৫৩ জন বিশিষ্ট অফিসারের কাছে সতী-নিবারণ সম্পর্কে যে মতামত জানতে চাওয়া হয় তার উত্তবে বিগ্রেডিয়ার জেনাবেল জেমস প্রাইস একজন বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি আশা করতেন—সবকার সময়মতো অবশ্যই এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেবেন। লেপ্টে কর্নেল ই সিমন্স এদেশে তাঁর ২৮ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানান, অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক এই প্রথা নিষিদ্ধ করলে হিন্দুসমাজেব বৃহত্তর অংশই একে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবে এবং প্রগতিশীল এই সরকাবের প্রতি তাদের আস্থাও যাবে বেড়ে।[২৮] এই মনোভাব যে মুখ্যত রামমোহনের নিরলস প্রয়াসে গড়ে উঠেছিল তা না বললেও চলে। যে কারণে শ্রীরামপুর মিশনরিদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠার পরও ডাঃ মার্শম্যান বিশপ হেবারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সতীবিষয়ে অনেক ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও যে অশাস্ত্রীয় এই প্রথা সম্পর্কে প্রকাশ্যে রামমোহনের মতামতকে সমর্থন করেন তা না বলে

পারেন নি।[২৯] 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এর সম্পাদক ডি. এল রিচার্ডসন প্রসঙ্গক্রমে লেখেন :

'Many well informed natives among whom we believe is the learned and philanthropical Rammohan Roy have objected to the custom as not only abhorent to humanity, but as contradictory to the true doctrines of the faith'[৩০] রিচার্ডসনেব বক্তব্যের সমর্থন পাই কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জে. কেলভারের উক্তি থেকে। এদেশে তাঁর দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সবকারকে জানান, এ-প্রথা নিষিদ্ধ হলে হিন্দুদেব মধ্যে গভীব অসন্তোষের সৃষ্টি হবে এ ধারণা নিতান্তই অমূলক। 'On the contrary the practice is loudly condemned by many of the most respectable among them for learning, power and wealth…'[৩১] দেখেশুনে 'জন বুল' সম্পাদক ম্যাকনাক্লেন তাই আশ্বস্ত হয়ে বলেছিলেন, দিন দিন এদেশীয় অধিবাসীরা এ-প্রথার বীভৎসতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, এবং কালক্রমে এ ভাবেই এ-প্রথা লুপ্ত হবে।

নবজাগ্রত এই জনমতের সামনে রক্ষণশীলবাও সতীপ্রথা নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। ১৮২২-এ কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দুবা লর্ড হেস্টিংসকে তাঁর বিদায় নেবার প্রাক্কালে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এক সভায় মিলিত হন। সভায় উত্থাপিত ধন্যবাদ প্রস্তাবটিতে বাধাকান্ত দেব একটি সংশোধনী এনে বলেন, স্বামীর সঙ্গে সহমরণের প্রাচীন প্রথাকে রক্ষা ও উৎসাহিত করার জন্য হেস্টিংসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হোক। অধিকাংশ সভ্য প্রস্তাবটির সমর্থক হলেও রামকমল সেন এবং রসময় দত্ত এই বীভৎস প্রথার নিন্দা কবে বলেন, এ-প্রথা আমাদের দেশের পক্ষে কলঙ্কজনক এবং এরকম একটি প্রথাকে অব্যাহত রাখার জন্য গবর্নব জেনারেলকে ধন্যবাদ জানানো নিরর্থক। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু হওয়ায় মতপার্থক্যটি আপোসে নিষ্পত্তি হয় এবং সতীপ্রথার আলাদাভাবে উল্লেখ না করে এদেশীয়দের ধর্মীয় আচার সম্পর্কে সহিষ্ণু নীতির জন্য লর্ডকে ধন্যবাদ জানানো হয়।[৩২] রাধাকান্ত দেবের (ক্যালকাটা জার্নালের ভাষায় 'The great champion of Suttees') উত্থাপিত এই প্রস্তাব সম্পর্কে 'ক্যালকাটা জার্নাল' ২৫. ১২. ১৮২২-এ মন্তব্য

করে, তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত শ্রোতারা করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিল কিনা আমরা জানি না। কিন্তু 'How will this be received in the British Parliament, where it will probably ere long be quoted when mention is made there of the benevolent exertions making to improve the Natives of India?' 'ক্যালকাটা জার্নাল' বা অন্য কে কি মনে করলেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রাধাকান্তের দল পরমাগ্রহে 'ধর্মরক্ষা' করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বেন্টিঙ্ক এদেশে এসে পৌঁছেছেন, এ-প্রথার নানাদিক সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে এ-বিষয়ে একরকম মনস্থিরও করে ফেলেছেন দেখে এসেছি। রামমোহন রায় ও অন্যান্য 'মডারেট রিফর্মার'দের তিনি আগে থেকেই চিনতেন। এদেশে আসার পর তিনমাস অন্তর শ্রী ও শ্রীমতী বেন্টিঙ্ক কলকাতার ৪০/৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ইভনিং পার্টিতে মিলিত হতেন। অন্যান্যদের সঙ্গে রামমোহন রায়ও এইসব সান্ধ্যপার্টিতে উপস্থিত থাকতেন। সতী-বিষয়ে রামমোহনের কার্যকলাপ তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে বেন্টিঙ্ক অবশ্য রামমোহনকে খুব পছন্দ করতেন না।* রামমোহনকে যত দেখছিলেন, ততই তিনি তাঁর ওপর আস্থা হারাচ্ছিলেন: 'Rammohan struck him as 'slow and timid' in speech and unimpressive on paper; perhaps there was something too ambiguous about this Unitarian, who was yet a Hindu revivalist of sorts.'[৩৩] ব্যক্তিগত ধারণা যাই হোক, সতী-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে বাঙালিসমাজে সতীবিরোধী প্রধান নেতার মতামত জানা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল। বেন্টিঙ্কের অনুরোধে রামমোহন লিখিতভাবে নিজের মতামত পেশ করলেন। এতে তৃপ্ত হলেন না বেন্টিঙ্ক। চাইলেন তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে মুখোমুখি আলোচনা করতে। তৎকালীন পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এ-বিষয়ে যে সংবাদ বেরোয় তা উদ্ধৃত করছি:

* রামমোহন অবশ্য বেন্টিঙ্ক সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রদত্ত ভোজসভায় বেন্টিঙ্ক প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার পর তিনি বলেন, 'He felt proud and grateful at what India was experiencing, and he trusted that so long as she would be ruled by a Governor equally popular and distinguished by similar acts of kindness, conciliation and humanity'—*Dinner of the E. I. Company to Rammohun Roy, The Govt. Gazette 10.11.1831*

'An eminent native philanthropist, who has long taken the lead of his countrymen on this great question of humanity and civilized government, has been encouraged to submit his views of it in a written form, and has been subsequently honoured with an audience by the Governor-General, who, we learn, has expressed his anxious desire to put an end to a custom constituting such a fowl blot on the character of our native subjects, as well as on that of the British Indian government which permits and sanctions it.'[৩৪]

মাসটা সম্ভবত জুলাই, ১৮২৯। গবর্নর হাউসে দুটি মানুষ মুখোমুখি—ভারতভাগ্যবিধাতা বেণ্টিঙ্ক আর সতী-বিরোধী বাঙালি[illegible]বিরের অবিসংবাদিত নেতা রামমোহন। চিন্তাকুল মুখে দুজনে কথা ব[illegible]ছেন অমানবিক সতীপ্রথা সম্পর্কে। এ-প্রথাব উচ্ছেদ একান্তভাবে কামনা করেও রামমোহন কিন্তু আইন করে এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার ব্যাপাবে মত দিতে পারলেন না।* বেণ্টিঙ্ককে তিনি বললেন, 'না, বলপ্রয়োগে একে নিষিদ্ধ করা হলে লোকে আমাদের উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝবে। বরং আবো বিধিনিষেধ জারি করে. এবং পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে এ-প্রথা অনায়াসে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি না করেই নিষিদ্ধ করা সম্ভব। এ-বিষয়ে আইন পাশ হলে লোকেব মনে হবে, ইংরেজরা একচ্ছত্র ক্ষমতা পেয়ে আমাদের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবে আমাদের ওপর তাদের ধর্ম চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত।'

রামমোহন—বেণ্টিঙ্ক যাঁকে 'a warm advocate for the abolition for the suttees' বলেছেন, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এরকম মতামত প্রত্যাশা

* It was his opinion that the practice might be suppressed, quietly and unobservedly by increasing the difficulties, and by the indirect agency of the police. He apprehended that any public enactment would give rise to general apprehension, that the reasoning would be, 'while the English were contending for power they deemed it politic to allow universal toleration and respect our religion, but having obtained the supremacy their first act is a violation of their profession, and next will probably be, like the Muhammadan conquerors, to force upon us their own religion'—*Minute by Lord William Bentinck, 8.11.1829*, Boulger's Bentink, P. 101.

করেন নি। ভেবেছিলেন, অন্তত ভেবে থাকাটা অসঙ্গত নয়, যে দেশীয়সমাজে কট্টর সতীবিরোধী এই মানুষটি অন্তত তাঁর আইন প্রণয়নের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন। হতাশ হয়েছিলেন বেন্টিঙ্ক, কিন্তু পেছিয়ে যাননি। সতীপ্রথাকে উচ্ছেদ তিনি করবেনই। কিন্তু সেই শুভদিন কবে আসবে—আর কতদিন দিকে দিকে সতীর চিতা জলবে ?

১১। সতী নিবারণ—সমকালীন প্রতিক্রিয়া

রামমোহন-বেণ্টিঙ্ক সাক্ষাৎকারের পর থেকেই শহর কলকাতায় জোর গুজব—সরকার যে কোনোদিন আইন করে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন। রক্ষণশীল শিবির সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এ-ব্যাপারে রামমোহনের মত যে 'প্রামাণ্য' ও বিশ্বাস্য হতে পারে না সবিনয়ে তা নিবেদন করে বেণ্টিঙ্ক সাহেব 'চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না' বলে আশা প্রকাশ করে। পত্রপত্রিকাগুলি বিষয়টি নিয়ে মেতে ওঠে। ৭.১১.১৮২৯-এ 'বেঙ্গল হেরাল্ড' লিখল, সরকার সতী নিবারণের সঙ্কল্প নিয়েছেন. কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই এ-প্রথার বিলোপ হবে। দু দিন পরে 'বেঙ্গল হরকরা'ও বলল, অল্পদিনের মধ্যেই সরকার নির্মম সতীপ্রথাকে বেআইনী ঘোষণা করে ব্যবস্থা নিতে কৃতসঙ্কল্প।[১] এই মাসের ২৬ তারিখে 'বেঙ্গল ক্রনিকল' লিখল, আমরা নিশ্চিত যে খুব শীঘ্রই আমরা পাঠকবর্গ ও জনসাধারণকে কাউন্সিলে সতী নিষিদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে খুশি করতে পারব। এ ব্যবস্থার ফলে সারা ইউরোপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সরকারের প্রশংসামুখর হয়ে উঠবে, কালক্রমে হিন্দুরাও এরজন্য কৃতজ্ঞবোধ করবে। এ ব্যবস্থা নিলে বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই, আর যদি বিরোধিতার কোনো আশঙ্কা থাকেও —এই ব্যবস্থার ফলে যে মঙ্গল হবে, সে কথা স্মরণ করে অতি ভীরু শাসকও এরকম ক্ষেত্রে আরো বেশি ঝুঁকি নিতে পারে।[২] ঐ একই দিন 'জন বুল' লিখল, আশা করি শীঘ্রই আমরা ব্রিটিশ রাজত্বে নির্মম ও অমানবিক সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হবার কথা ঘোষণা করতে পারব।[৩]

সতী-নিবারণের জন্য সরকার ভেতরে-ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছেন, ইংরেজি কাগজগুলি দলমত নির্বিশেষে সতী নিবারণের পক্ষে বলছে, এমন এক সঙ্কট মুহূর্তে এ-প্রথাকে টিঁকিয়ে রাখার শেষ লড়ায়ে নামলেন ভবানীচরণ—আর তাঁর পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা।'

সতী নিবারণ করা হবে একথা শুনে ১৯.১১.১৮২৯-এ ভবানীচরণ লিখলেন, আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন,

ভীত, বিস্মিত। এমনকি অত্যাচারী মুসলমান শাসকরাও আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নি, ন্যায়পরায়ণ কোনো সরকারের আমলে যদি তা করা হয়, তাহলে তারচেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে। মনে হচ্ছে, হিন্দুধর্মের শেষ অবস্থা উপস্থিত।

অবশ্য তখনও চন্দ্রিকাকারের আশা সরকার সতী নিষিদ্ধ করবেন না, কারণ এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্ববর্তী কোনো গবর্নরও এতে হস্তক্ষেপ করেন নি। অনেক হিন্দু এ-প্রথা সমর্থন করেন না. এবং এ-প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়—এ অভিযোগও 'চন্দ্রিকা' মানতে রাজি নয়। কয়েকজন নাম-কা-ওয়াস্তে হিন্দু আর সাহেবদের ধামাধরা কয়েকজনের কাছে আমাদের শাস্ত্রের নিন্দাবাদ শুনে এই পবিত্র প্রথা নিষিদ্ধ হলে তা গভীর ক্ষোভের বিষয় হবে। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' মত প্রকাশ করে যে কলকাতার বহু হিন্দু এ-প্রথা নিবারণের পক্ষে—ভবানীচরণ লিখলেন: কোন মূর্খ তাঁকে এ-কথা বলেছে? কলকাতার জ্ঞানী গুণী ধনী ভদ্র নম্র ব্যক্তিরা এ-প্রথা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে কৃতসংকল্প। খুব শীঘ্রই এই আবেদন পেশ করা হবে। আর কলকাতার অধিবাসীদের ওপর আরোপিত কলঙ্কের তাই হবে যথাযোগ্য উত্তর।[৪]

বিষয়টি নিয়ে ২৬. ১১. ১৮২৯-এ ভবানীচরণ আবার কলম ধরলেন। একদিকে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' বলছে, কলকাতার অনেক হিন্দু এ-প্রথার বিপক্ষে; 'সমাচার দর্পণ' এর ওপর ফুট কেটে বলছে, কলকাতার দু'চারজন বাঙালি এ-প্রথাকে আঁকড়ে থাকলেও, অনেকেই একে অমানবিক মনে করেন। সাহেবদের কাগজ 'জন বুল,' 'বেঙ্গল হরকরা', 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সবাই বলছে দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকেই এ-প্রথা সমর্থন করেন না। কাজেই চন্দ্রিকাকার কেমন করে চুপ থাকেন? এদেশীয় অনেক ব্যক্তি এ-প্রথা নিন্দনীয় মনে করেন —দর্পণকারের এ মন্তব্যকে চালেঞ্জ করে ভবানীচরণ এইসব ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে বললেন। শিক্ষিত বৃটনরা কোনো দেশীয়প্রথার লোপ দেখে খুশি হবেন না একথা বলে তাঁর সিদ্ধান্ত: সমস্তরকম ক্ষতির মধ্যে হিন্দুর কাছে ধর্মনাশই সবচেয়ে গুরুতর—কারণ ধর্ম একবার নাশ হলে আর ফেরে না। এবং সতী নিষিদ্ধ হলে হিন্দুর সেই ধর্মনাশই হবে।[৫]

চন্দ্রিকাকারকে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দর্পণকার ২৯.১১.১৮২৯-এ বললেন, মনু সতীর কথা বলেন নি, হিন্দুশাস্ত্রমতেও কাম্যমরণ উঁচুদরের ব্যাপার

নয়। অমানবিক নিষ্ঠুর এ-প্রথা নিষিদ্ধ হলে হিন্দুধর্মের কোনো হানি হবে না, এবং কেউ একে হিন্দুদের ধর্মনাশের চক্রান্ত মনে করবেন না।[৬]

পরের দিনই (৩০.১১.১৮২৯) এর উত্তর দিলেন ভবানীচরণ। বললেন, মনু তো কোথাও সতীপ্রথাকে নিষিদ্ধ করেন নি। দুর্গাপুজো, দোল ইত্যাদির কথাও তো তিনি কোথাও বলেন নি, তাহলে যারা এগুলি করে তারা কি মনুকে মান্য করে না? আসলে সতী-বিষয়ে মনুর নীরবতা তাঁর এ বিষয়ে সম্মতির লক্ষণ। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত মনুর এক সংস্করণ থেকে সতীবিষয়ক একটি বচন উদ্ধার করে মনু যে একে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি তা দেখান। ধর্মীয় কৃত্য বলে এতে অংশগ্রহণকারীদের অমানবিক বলতেও তিনি রাজি হলেন না।[৭]

চন্দ্রিকাকারের এ-সব যুক্তিকেই খণ্ডন করলেন দর্পণকার। অন্যান্য যুক্তিকে খণ্ডন করার পর তিনি বললেন, চন্দ্রিকাকার আমাদের কলকাতার সতীবিরোধীদের নাম প্রকাশ করতে বলেছেন। কিন্তু তা করে আমাদের কাগজ ভরাতে আমরা চাই না। চন্দ্রিকাকার সতীপ্রথার সমর্থকদের নাম প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যাদের নাম তাঁর তালিকায় নেই, তারাই সতীপ্রথার বিরোধী। আর তা করলে সহজেই তিনি আমাদের মতানুসারী ব্যক্তিদের পেয়ে যাবেন।[৮]

সতীপ্রথার পক্ষ সমর্থনে ভবানীচরণের দোসর হয়ে দেখা দিলেন ইংরেজি শিক্ষিত জনৈক ব্রাহ্মণ। 'বেঙ্গল হরকরা'য় চিঠি লিখে তিনি সরকারের সতী নিষিদ্ধ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হবে এবং এর ফলে আদৌ কোনো উপকার হবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ করে বললেন, স্বামী মারা যাবার পর মেয়েদের আর বেঁচে থেকে লাভ কি! এ-প্রথা নিষিদ্ধ করা হলে বেশ্যাসংখ্যা বাড়বে—আর তা হবে সরকারের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ।[৯] ব্রাহ্মণকে অবশ্য তাঁর মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন হরকরা-সম্পাদক।

তখনও কিন্তু আশা ছাড়েন নি ভবানীচরণ। ৩.১২.১৮২৯-এ তিনি লিখলেন, গবর্নর জেনারেল 'শাস্ত্রবিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না, এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে তা গোলযোগমাত্র।'

কিন্তু 'যে সকল কথা উঠিয়াছে' তা যে 'গোলযোগমাত্র' নয়, তাই প্রমাণিত হল পরদিন।

॥ ২ ॥

পরদিন শুক্রবার। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২৯। কাউন্সিলে সতীপ্রথা 'illegal and punishable by the criminal courts' বলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ১৮২৯-এর ১৭ নং রেগুলেশন এটি। বেন্টিঙ্ক ছাড়া চার্লস মেটকাফ, ডাবলিউ বি. বেলি ও কম্বারমেয়র এইসময় কাউন্সিলের সদস্য। সতী আইনের মুখবন্ধে বলা হল:

সতীপ্রথা মানবিক অনুভূতির পরিপন্থী। হিন্দুধর্মে একে কোথাও আবশ্যিক বলা হয় নি, বরং ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপণই বিধবার পক্ষে বিধেয়। সারা ভারতের জনসংখ্যার বিরাট অংশ এ-প্রথা পালন করে না। দেশের অভ্যন্তরে অনেক প্রদেশে এ-প্রথার চল নেই। যেসব অঞ্চলে এ-প্রথা সবচেয়ে প্রচলিত, সেখানে অনেকসময় বলপ্রয়োগ করা হয়—হিন্দুদের নিজেদের কাছেই যা বীভৎস, অশাস্ত্রীয় ও নিষ্ঠুর। এ পর্যন্ত এ-প্রথা দমনে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যর্থ হয়েছে, এবং সপার্ষদ গবর্নর জেনারেল এ বিষয়ে একমত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা ছাড়া এ-প্রথাজনিত অমঙ্গল দূর করা সম্ভব নয়। এইসব বিবেচনা করে সপার্ষদ গবর্নর জেনারেল ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি সর্বশ্রেণীর লোকের ধর্মীয়কৃত্য (যতক্ষণ না তা ন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে) পালনের স্বাধীনতার কথা মনে রেখে নিম্নলিখিত আইন এখন থেকে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে বলবৎ করতে মনস্থ করেছেন।

সতী সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা প্রকাশ হতে হতে আরো দু'তিনটি দিন চলে গেল। ৬. ১২. ১৮২৯-এর সকালে সরকারি ঘোষণার অনুলিপি অনুবাদের জন্য সরকারের বাংলা অনুবাদক কেরীর হাতে পৌছয়। কেরী তাঁর রবিবারের প্রার্থনা প্রস্তুতের কাজ স্থগিত রেখে কাজে লেগে যান এবং দিন ফুরোবার আগেই তা শেষ করেন।[১০] সোমবার ৭. ১২. ১৮২৯-এ 'বেঙ্গল হরকরা' লিখল, 'সতী নিষিদ্ধ করে সরকারি ঘোষণা আজ থেকে বলবৎ হবে, অনুভূতিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ যে বিষয়টিতে উৎফুল্ল হবে, বলাই বাহুল্য।' এইদিন সন্ধ্যাবেলা 'গভর্নমেন্ট গেজেট' আইনটির পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলল, 'আমাদের আজকের গেজেটে এমন একটি দলিল প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে প্রত্যেকটি মানবীয় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশেষে আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে ভারতের দেশীয় ও ইউরোপীয় বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করছি—বীভৎস সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। এই অমানুষিক প্রথা, যার কথা চিন্তা

করলে পর্যন্ত শিউরে উঠতে হয়, ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণা ছাড়া আর তার কথা শুনতে পাওয়া যাবে না। আজকের পর থেকে যে এ-বিষয়ে সাহায্য করবে, অথবা নিবৃত্ত করার চেষ্টা না করে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকবে, তাকে বিচারালয়ে অপরাধীর বেশে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।' সতী নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে পুলিশের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল।

এ-বিষয়ক সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি সংবাদ-পত্রগুলি সমস্বরে সরকারকে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য অভিনন্দন জানাতে লাগল। 'জন বুল' সর্বান্তকরণে এই নির্মম অমানবিক প্রথা দমনকারী আইনটির সাফল্য কামনা করে এই উপলক্ষে বিশেষকবে হিন্দুদের অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'এ-প্রথার দমনকামনা বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী হিন্দুরা দীর্ঘদিনই করে আসছিলেন, আশা করি এমনকি রক্ষণশীলরাও শীঘ্রই এ ব্যাপারটিকে স্বাগত জানাবেন।'[১১] 'বেঙ্গল হরকরা' লিখল, স্থানীয় সরকারের আর কোনো কাজ এর আগে আমাদের এত অকৃত্রিম পরিতৃপ্তি দেয় নি।

সতী নিবারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেণ্টিঙ্ক যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্য চতুর্দিক থেকে তাঁর ওপর অভিনন্দন বর্ষিত হতে লাগল। আইনটি প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যে কলকাতার খ্রীস্টান অধিবাসীদের তরফ থেকে গবর্নর জেনারেলকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হল। এই অভি-নন্দনপত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে ডেভিড হেয়ার, এইচ. এল ভি. ডিরোজিও, রুস্তমজি কাওাসজি প্রভৃতি স্বাক্ষর করেন।[১২] হিন্দু কলেজের তরুণ ইউরেশিয়ান শিক্ষক ডিরোজিও* এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে এই অবিস্মরণীয় কাজের জন্য বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, '*Thy memory shall be blessed as is the morning star*'. বেণ্টিঙ্কের কীর্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে 'বেঙ্গল হেরাল্ডে' সনেট প্রকাশিত হল। কলকাতার মহিলাদের পক্ষ থেকেও এজন্য গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানানোর কথা শোনা যেতে লাগল।[১৩] মুসল-মানদের পক্ষ থেকেও গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তুতি চলতে

* ডিরোজিও সতীপ্রথার সমর্থক না হয়েও, এই অমানবিক প্রথাপালনে হিন্দুদের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন 'It is however our firm and sincere wish that the day may soon come when the rays of intellectual greatness will awaken the benighted natives of India from their long trance of bigotry and error.' *The Poetical Works of H.L.V. Derozio*, 1871, P. 25.

লাগল, শেষপর্যন্ত অবশ্য কিছু হয়ে ওঠে নি। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ বেণ্টিঙ্কের কাজকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান উইলিয়ম এসটেল ও বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট চার্লস গ্রাণ্ট উভয়েই এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। লণ্ডনের 'খ্রীশ্চান অবজার্ভার' পত্রিকা এই সংবাদ পেয়ে এপ্রিল ১৮৩০-এ লিখল 'Tens of thousands of human beings will live to bless the present benevolent and enlightened governor general of India for this enactment.'[১৪] তাঁর কাজকে অভিনন্দন জানিয়ে ৪ ৬. ১৮৩০-এ হাউস অফ কমন্সে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। চার্লস গ্রাণ্ট ২০. ১০. ১৮৩১-এ এক চিঠিতে বেণ্টিঙ্ককে লিখলেন, কাজটি যে কোনো সরকারকে অমরত্ব দেবার পক্ষে যথেষ্ট।[১৫]

অন্যদিকে সতী নিষিদ্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গে দেশীয় সমাজপতিদের একাংশ চকিত হয়ে উঠলেন। রক্ষণশীলরা একে তাঁদের ধর্মহানির চক্রান্ত মনে করে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এ-প্রথা উঠে যাওয়ায় আনন্দিত চিত্তে রাজচন্দ্র তাঁর পত্নী রানী রাসমণিকে এ সংবাদ জানালে তিনি বলেন 'আমাদের দেশের কামিনীদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহা প্রচলিত থাকাই ভাল।'[১৬]

শুধু রানী রাসমণিই নয়, আরো অনেকেই সে যুগে এ-প্রথা প্রচলিত থাকাই ভাল মনে করেছিলেন। এদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ, সমাজপতি গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব ইত্যাদিরা শলা-পরামর্শ করে গবর্নর জেনারেলের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সতী সমর্থকদের পক্ষ থেকে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর সমন্বিত দুটি আরজি পেশ করলেন। এই দুটি আরজির প্রথমটি কলকাতার ৬৫২ জন বিষয়ী ও ১২০ জন পণ্ডিত স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র, দ্বিতীয়টি বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ প্রভৃতি স্থানের ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোক ও ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষরযুক্ত। আবেদনকারীদের বক্তব্য, সতীপ্রথা ধর্মীয়কৃত্য, এতে হস্তক্ষেপ অন্যায় ও অনায্য। মুসলমান আমলে ও পূর্বতন ব্রিটিশ শাসনকালেও এতে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। এদেশীয়দের ধর্মীয় আচারপালনে স্বাধীনতা দিতে পার্লামেণ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শাস্ত্রমতেই এ-প্রথা যে শাস্ত্রীয় ও আবশ্যিক আবেদনকারীরা হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। প্রথম আবেদনপত্রটিতে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার, কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ, সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ

আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় ও কলকাতার বিশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে মহারাজা গিরিশচন্দ্র, মহারাজা শিবকৃষ্ণ, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, মহারাজা গৌরবল্লভ, রাজা রাজনারায়ণ রায়, বাবু গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, প্রমথনাথ দেব, তারিণীচরণ মিত্র, মতিলাল শীল, আশুতোষ দে, মৃত্যুঞ্জয় দেব শর্মণাম, রামকমল সেন (৭ বছর আগে যিনি সতীপ্রথার বিরোধিতা করেন), শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বাক্ষর করেন। এই আবেদনপত্রটির বক্তব্যের সঙ্গে সহমরণ বিষয়ে চন্দ্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যের আশ্চর্য মিল দেখে মনে হয়, চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণই এটির রচয়িতা।

এটি দেবার ২ দিন পরে নীলমণি দে বেন্টিঙ্ককে একটি চিঠি লিখে বললেন, সতীবিষয়ে অসুবিধাজনক ও অন্যায্যভাবে কঠোর কোনো ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে আবেদনকারীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দূর করার জন্য তাঁকে যদি গবর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তিনি তাঁর সঙ্গে এ-প্রথা নিবারণের কোনো ভাল উপায় (যাতে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হবে না) সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।[১৭] এ চিঠি পেয়ে বেন্টিঙ্ক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন—এমন কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

এই আরজির উত্তরের প্রত্যাশায় বৃহস্পতিবার ১৪.১.১৮৩০-এ নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামগোপাল মল্লিক ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী গবর্নমেন্ট হাউসে উপস্থিত হলে বেন্টিঙ্ক তাঁর উত্তর সম্বলিত কাগজ তাঁদের দিলেন। তাঁর বক্তব্য সহমরণ অপেক্ষা বিধবার ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ, এবং অনেক বিবেচনা করেই তা রহিত করা হয়েছে। 'কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডরাজার কৌন্সেলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথায় প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন।'

বেন্টিঙ্কের উত্তর রক্ষণশীলদের নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল। কিন্তু হাল ছেড়ে না দিয়ে পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করতে তাঁরা সংস্কৃত কলেজে এক সভায় মিলিত হলেন।

রবিবার, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৩০। সংস্কৃত কলেজের সামনের রাজপথে শীতের

দুপুরে গাড়ির মেলা। একে একে নামছেন রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, হরিমোহন ঠাকুর, রামকমল সেন, গোকুলনাথ মল্লিক প্রভৃতি কলকাতার মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মুখ তাঁদের গম্ভীর থমথমে। সকলে সমবেত হলে সংস্কৃত কলেজে সভার কাজ আরম্ভ হল। রাধাকান্ত দেবের মুখে সতী বিষয়ে আরজি সম্পর্কে বেণ্টিঙ্কের উত্তর শুনে সভ্যরা বললেন, 'সতীবিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্ত্তব্য যে পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে।'[১৮] সভায় এই আরজি প্রস্তুত ও অন্যান্য রীতিক্রম ঠিক করার জন্য রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ সরকার, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও নীলমণি দে—এই ১২জন বিবেচককে নির্বাচন করা হল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মনির্বাহক মনোনীত হলেন। হিন্দু ধর্মরক্ষার জন্য সমবেত ব্যক্তিদের কাছে সভাস্থলেই ১১,২৬০ টাকা পাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল (প্রতিশ্রুত অর্থ শেষপর্যন্ত অবশ্য অনেকেই দেন নি)। বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক নিযুক্ত হলেন। সভা যখন ভাঙল, দিন তখন শেষ হয়েছে, অন্ধকার নামছে। সভ্যদের মুখ কিন্তু আশার আলোয় উদ্ভাসিত। সতী নিবারণ রদ আমরা করবই। আমাদের ধর্ম রক্ষা করবে ধর্মসভা।

রবিবার রবিবার সভার অধিবেশন বসতে লাগল। সভার দিন গাড়িতে গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হয়ে যেত। উত্তপ্ত আলোচনা চলত সেখানে, কেমন করে সতীপ্রথা পুনঃস্থাপন করা যায়, ভেবে ভেবে অনেকের মাথাব্যথাও দেখা দিল। শুরু হল সতী সমর্থকদের সামাজিকভাবে বয়কট করা। হিন্দুধর্মের নিন্দাসূচক গ্রন্থ বা পত্রিকাদি সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা। এপ্রিল, ১৮৩০-এর মধ্যে বিলাতে পাঠাবার জন্য সতীপক্ষীয়দের আরজির খসড়া তর্কভূষণ ভট্টাচার্য প্রস্তুত করে ভবানীচরণের হাতে দেন। রাধাকান্ত দেব তা ইংরেজিতে রূপ দেবার পর কোনো 'প্রধান ইংরেজের' কাছে তা সংশোধনের জন্য পাঠান স্থির হল। রাধাকান্ত দেবই সে ভার নিলেন। তারিণীচরণ মিত্র সতীর পক্ষীয় আরজি হিন্দী ও বাংলায় অনুবাদ করলেন।

সভা দিব্যি চলছিল। রবিবার দিনটা 'ধর্মসভা'র ধার্মিকদের ভালোই কাটত। রঙীন গেলাস হাতে পোষা মেয়েমানুষের নাচ দেখার চেয়ে এর

উত্তেজনা কম নয়! লোকের কাছে ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে ধর্মরক্ষার চাঁদা আদায় করার মজাদার ব্যাপারটা তো ছিলই। কিন্তু একটি লোক 'ধর্মসভা'র জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করে বসলেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা অন্যদের নজর এড়াল না। জুলাই, ১৮৩০-এ অনুষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র এক অধিবেশনে রামকমল সেন সব কাজ শেষ হলে বললেন: 'ধর্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান কর্ম সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে তথাপি আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ স্বীকারপূর্বক ইহাঁকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইহার পরিশ্রম ও আপন ক্ষতিস্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যদ্যপিও অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহা জ্ঞাত করাই।'

লজ্জা পেলেন ভবানীচরণ, বললেন, না, না, যা করেছি, কর্তব্য জেনেই করেছি, এজন্য ধন্যবাদ দেবার কি আছে।

রাধাকান্ত দেব ও উমানন্দন ঠাকুর বললেন, এ কথায় ভবানীচরণের সৌজন্যই প্রকাশ পাচ্ছে, 'কিন্তু কালসহকারে কর্ত্তব্য কর্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়।' সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন মহারাজা কালীকৃষ্ণ। বললেন, আমাদের উচিত এক প্রশংসাপত্র লিখে তাতে সকলে সই করে প্রকাশ করা, এবং 'ধর্ম-সভা'র নিজস্ব বাড়ি তৈরি হলে ভবানীচরণের প্রতিমূর্তি সেখানে স্থাপন করা।

কালীকৃষ্ণ যে সে লোক নন, তার কথার গুরুত্বই আলাদা। কাজেই জল্পনা শুরু হল মূর্তিটি কি দিয়ে তৈরী হবে তাই নিয়ে। 'বেঙ্গল হরকরা'য় একজন লিখলেন, মূর্তিটি নিশ্চয়ই কাঠ বা পাথর ছাড়া অন্য কিছুতে তৈরি হবে না। প্রতিবাদ করলেন 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' 'এন. ডি' নামান্তরালে এক পত্রলেখক। বললেন, 'তা কেন, এটা সম্পূর্ণ বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি করার পর তার ওপর কাদা আর বিষ্ঠার (আসল মানুষটির খুলির একমাত্র পদার্থ) প্রলেপ দেওয়া হবে। এটি নির্মাণের ভার দেওয়া হবে নদীয়ার নামকরা শিল্পী কলি পালকে। আর শেষ হলে হিন্দুদের শবদাহের জন্য সদ্যনির্মিত শ্মশানঘাটের মাঝখানে এটাকে স্থাপন করা হবে। মূর্তিটির একহাতে থাকবে প্রকাণ্ড এক বাঁশ, অন্যহাতে একটুকরো দড়ি—'সতীদাহের' প্রধান দুই উপকরণ।'[১৯]

'ধর্মসভা'র পরিবেশ সবসময়ই উত্তপ্ত থাকত, তাই লোকমুখে এর নাম হয়েছিল 'গুড়ুমসভা'। 'ধর্মসভা' আর তার সমর্থকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করাটা হয়ে দাঁড়ায় রোজকার ব্যাপার। ভবানীচরণের নতুন নামকরণ হল কাঙালীচরণ।

'ধর্মসভা'র একটি ব্যঙ্গচিত্রে এই সভার নিয়মাবলীর যে ফিরিস্তি দেওয়া হয় তা রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারলাম না :

1. That any individual intending to be a member of this Shubha, pay five and twenty rupees to the Secretary for his private expenses, and five hundred to the Meeting, and that he also subscribe to the Secretary's newspaper, and to no other.

2. That none be allowed to become a member of this Shubha who cannot burn his finger in redhot fire, without giving any signs of uneasiness.

3. That every member on entering the hall, where the meeting is held, swear that he has sacredly observed the rites and ceremonies of fire worship. That he has everyday drank hotwater only, that he has fed the God of fire before he has taken his dinner, that he has never made use of any cool water, nor even that of the Ganges, and that he has taken no meal that has been kept cooling for sometime.

4. That if any member, be found not to have kept a fire in his house any day, he be no longer considered one of our Shubha.

5. That if it be found that any member has paid a cool regard to what Baboo Kangaleechurn, our secretary, says, he be kicked out of the Association, and that no fire be ever allowed to be taken to his house.

6. That every member be required to subscribe to the newspaper Kundrika, and to all works which come from that press.

7. That the members be obliged to smoke within doors, in order to keep themselves as well as the hall warm, during the hours of debate.

8. That the members be not allowed to read any works in which fire-worship is treated with disrespect ; but that the Editor of the Kundrika be privileged to read all sorts of books.

9. That no member have those clothes which he used for the purposes of worshipping fire, made or mended by any but the Secretary of the Society.

10. That any member having any conversation with persons connected with Sheetul Shubha, be expelled (from) the association.[২০]

'ধর্মসভা'র কার্যকলাপ নিয়ে একদিকে যখন মজাদার আলোচনা চলছে, অন্যদিকে 'গুড়ুম সভা'র সভ্যরা গাম্ভীর্যের মুখোস এঁটে প্রচণ্ডরকম কর্মব্যস্ত। এদিকে সতীপক্ষীয়দের আবেদনটির চূড়ান্ত রূপ দিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্ম রাখতে রাখতে সভার ১৯টি অধিবেশন বসল, নয়-নয় করেও কেটে গেল ৬টি মাস।[২১] পার্লামেন্টে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত আবেদনপত্রটি এক বিজ্ঞ ইংরেজের কাছে পাঠানো হলে, তিনি তা পড়ে 'পরম সন্তুষ্ট' হয়ে এর প্রস্তুতকারী বাবুর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। 'ধর্মসভা'র সভ্যরাও তাঁকে এজন্য আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ জানান। এই 'বিজ্ঞ ইংরেজ'টি কে আমরা জানি না। সবই তো হল, কিন্তু আবেদনপত্রটি নিয়ে ইংলণ্ডে যাবেন কে? হিন্দুরা তো কেউ যেতে পারবেন না। কারণ সাগরপারে গেলে তাঁদের জাতের দফা হবে রফা। সমস্যার সমাধান হল অল্পদিনেই। এগিয়ে এলেন একজন ইংরেজ—কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের নামকরা এটর্নী মিঃ ফ্রান্সিস বেথি। মাত্র ৫০,০০০ টাকা পেলেই সব করতে তিনি প্রস্তুত! দর্পণে একজন লিখলেন, হায় রে কপাল! পরম পুণ্যের সতীপ্রথা পুনঃস্থাপনের জন্ম শেষপর্যন্ত একজন ইংরেজের ওপর নির্ভর করতে হবে! বেথি আজকের দিনের ভাষায় চালু লোক। কোনখানে কাকে কি বলতে হবে, তা তিনি ভালোই জানতেন।

ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি বেথির আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগল। একজন ইংরেজ, একজন খ্রীস্টান তার কিনা এই কাজ! ইংরেজের গুণমুগ্ধ ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, বেথির কলঙ্কিত কাজকে প্রকাশ করার মতো ভাষা তাঁর জানা নেই। অর্থলালসায় মানুষ এত নীচেও নামতে পারে!

এতো গেল 'গুড়ুমসভা'র কথা। কিন্তু 'শীতল সভা'র (ব্রাহ্ম সভা) সভ্যরা—মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করাই যাঁদের বিশেষত্ব, তাঁরা কি সতী নিবারণের পর নিছক দর্শকের ভূমিকা নিলেন? না, তা কেন। তাঁরাও প্রস্তুত হলেন গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিলেন রামমোহন রায়। জানুয়ারি ১৮৩০-এ জেমস কেলডার ক্যাপ্টেন বেনসনকে যে চিঠি লেখেন তাতে দেখি, 'Rammohan is entirely occupied in getting signatures for the native address.'[২২]

১৬.১.১৮৩০-এ 'সহমরণ বিষয়ক প্রশংসাসূচকপত্র দেওনার্থে' রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সত্যকিঙ্কর ঘোষাল, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, কুঞ্জবিহারী রায় ও হরিহর দত্ত গবর্নমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হন (পারিবারিক একটি মৃত্যুর জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর অনুষ্ঠানে আসতে পারেন নি)। গবর্নমেণ্ট হাউসের দোতলায় দরবারশালাতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, শ্রী ও শ্রীমতী বেণ্টিঙ্ক, তাঁর অমাত্যবর্গ ও কয়েকজন মহিলা সেখানে উপস্থিত। রামমোহন রায় বেণ্টিঙ্ককে তাঁদের আসার কারণ জানালেন। কালীনাথ রায় প্রায় ৩০০ হিন্দু প্রজার স্বাক্ষরযুক্ত বাংলা অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করলেন, হরিহর দত্ত পড়লেন এর ইংরেজি তরজমা। এই অভিনন্দনপত্রে 'মনুষ্যস্বভাবের ও করুণার সর্বথা বিরুদ্ধ' সতীপ্রথা আইন করে নিবারণের জন্য বেণ্টিঙ্কের কাছে তাঁরা তাঁদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বেণ্টিঙ্কও এর যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন। আগেই বলেছি, বেণ্টিঙ্ককে এদেশীয়দের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তার নেতৃত্ব দেন সতীবিরোধী আন্দোলনের নেতা রামমোহন রায়। অথচ আগে দেখেছি, এই মানুষটিই বেণ্টিঙ্ককে আইন করে এ-প্রথা রদ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন। মনে স্বভাবতই তাই প্রশ্ন জাগে, সহমরণ নিবারণে রামমোহনের প্রকৃত ভূমিকাটি কি?

সহমরণ নিবারণের সঙ্গে রামমোহন রায়ের নামটা যে জড়িয়ে গেছে, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সহমরণ নিবারণের প্রকৃত গৌরব কতখানি তাঁর প্রাপ্য, এ প্রশ্নকে আজকের দিনে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

সতী নিবারণে রামমোহনের ছিল আন্দোলন সৃষ্টির ভূমিকা। চিন্তা বা কথায় রামমোহন নতুন কিছুই করেন নি। তাঁর এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আগে থেকেই দেশীয়সমাজের একাংশ এ-প্রথার প্রতি বিমুখ ছিলেন—তা দেখে

এসেছি। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জনকও তিনি নন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ-প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এজন্য ঘরে বাইরে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। কিন্তু এই মানুষই আইন করে এ-প্রথা নিবারিত হোক তা চাননি। কিন্তু কেন ?

আসলে রামমোহন উগ্রপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। আইন করে রাতারাতি সামাজিক পরিবর্তন আনতে তিনি চান নি। জীবনের মতো সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করতেন। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'এনকোয়েরার' তো এইজন্যই তাঁকে 'হাফ লিবারালে'র বেশি কিছু ভাবতে পারে নি।

অন্যদিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনে আস্থাবান। তাঁর আশঙ্কা ছিল আইন করে এই প্রথা রদ করা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। আর তা যাতে না হয়, সেইজন্যই তিনি আইন করার প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে বেন্টিঙ্ককে আরো বিধিনিষেধ ও পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে এ-প্রথা বিলোপ করার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ শুনে বেন্টিঙ্ক যদি আইন প্রণয়ন না করতেন, তাহলে রামমোহন নির্দেশিত পথে সতীপ্রথা আদৌ নিবারিত হত কিনা সন্দেহ। আমরা দেখেছি, সরকারি বিধিনিষেধগুলি অনেকসময়ই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকত, এবং সরকারি বিধিনিষেধগুলি মেনে নিয়েই প্রচুর সংখ্যক মেয়ে প্রতিবছর স্বেচ্ছায় সতী হত। এমনকি আইন পাশ হবার পরও গণ্ডগোলের আশঙ্কা তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। যে কারণে বেন্টিঙ্ক যখন এ-ব্যাপারে রক্ষণশীলদের সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন রামমোহন কাপ্টেন বেনসনকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন।[২৩] কিভাবে রক্ষণশীলদের মোকাবিলা করা উচিত তাও চিঠি লিখে গবর্নর জেনারেলকে জানাতে তিনি ভোলেন নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়াই যখন হল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও কোনোভাবে বিপন্ন হয়ে উঠল না, তখন তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এগিয়ে এলেন গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে! শুধু তাই নয়, এ আইনকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানালেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে '*Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows, Considered as a Religious Rite*' প্রকাশ করে অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথাকে 'স্ত্রীহত্যা' আখ্যা দিয়ে ধর্মের আবরণে স্ত্রীহত্যা নিবারণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ জানান। সতী

নিবারণের পর প্রতিক্রিয়ার সমস্ত আঘাতও তিনি অবিচলিতভাবে সহ্য করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লোকের শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে জানিয়েছেন, রামমোহন উপাসনা মন্দিরে আসার সময় হেঁটে আসতেন, ফেরার সময় ফিরতেন গাড়িতে। 'গাড়িতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন লোকে ইঁট, পাথর, কাদা ছুঁড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন "কোচম্যান হেঁকে যাও।"[২৭] এসময় এমনকি তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কাও যে দেখা দিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে সমকালীন সংবাদপত্রেই।

রামমোহনের সঙ্গে দিল্লিসম্রাটের দৌত্যকার্যে ইংলণ্ডে যাবার জন্য মিঃ মণ্টগোমারি মার্টিন চাঁদপাল ঘাটে একটি নৌকায় থেকে প্রতিদিনই যাবার প্রতীক্ষা করছেন। সতী নিবারণ ইত্যাদি কারণে যাত্রা দিনকয়েক পেছিয়ে যায়। ২রা জানুয়ারি, ১৮৩০ নাগাদ নানা খবর কানে আসায় মিঃ মার্টিনের রামমোহনকে গুপ্তহত্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রামমোহনের বাড়িতে উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গুপ্তঘাতকের দল রামমোহনের প্রাণনাশের সুযোগ সন্ধান করছে, খবর পেয়েই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রামমোহনের বাড়িকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বন্দুক, বারুদ, ছোরা ইত্যাদি অবিলম্বে যোগাড় করা হল, বাড়ি পাহারা দেবার জন্য বরকন্দাজ মোতায়েন করা হল। নীরবে ভেতরে-ভেতরে এতসব প্রস্তুতি চলল। মিঃ মার্টিন একটি দোনলা, একটি একনলা বন্দুক, তিনজোড়া পিস্তল, একটি বাঁকা তরোয়াল, তিনটি গুপ্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন। বরকন্দাজদের রীতিমতো বন্দুকচালনা শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল, একজনকে যুদ্ধ কুড়ুলে সজ্জিত করা হল, এইভাবে গোটা বাহিনীকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হল। এই বিপদসঙ্কুল দিনে রামমোহন যখন বাইরে বেরোলেন, তখন তাঁর অনুরোধে মিঃ মার্টিন একজোড়া পিস্তল ও হাতে গুপ্তি নিয়ে তাঁর সঙ্গে চললেন। রামমোহনও তাঁর পকেটে একটি ছোরা ও হাতে একটি গুপ্তি রাখলেন, তাঁর অনুচরদেরও ভালোমতো অস্ত্রসজ্জিত রাখা হল। পত্রিকাটি জানিয়েছে, এই বিপদের আশঙ্কা সতী-সমর্থকদের কাছ থেকে। তাদের শত্রুতার কারণ 'The Part that the Envoy had taken in obtaining from Govt the suppression of the most cruel and horrid custom.'[২৫] ব্যাপারটা যে নিছক উড়িয়ে দেবার মত নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে।

রামমোহনের প্রাণনাশের চক্রান্ত হয়তো 'গুড়ুম সভা'র সভ্যদেরই

পরিকল্পনা। যাই হোক, কেন যে এইসময় রামমোহন 'অস্ত্র সমভিব্যাহার ব্যতীত গৃহ হইতে বহির্গত' হতেন না, তার কারণটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

শুধু গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানিয়ে আর সতী নিবারণকে সমর্থন করেই রামমোহন ক্ষান্ত হলেন না। 'গুড়ুম সভা'র দল সতীপ্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে আপীল করছে, মিঃ বেথি বিলাতে যাচ্ছেন তাঁদের হয়ে ওকালতি করতে। রামমোহন ভাবলেন বটে, ঠিক আছে ওরা গবর্নরের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করুক, আমিও সেখানে গিয়ে গবর্নর জেনারেলের কাজকে সমর্থন করে পাল্টা আবেদন করব। মোটকথা সতী যখন নিবারিত হয়েছে, তখন কিছুতেই তাকে পুনঃস্থাপন করতে দেব না।

'গুড়ুম সভা'র দল কাজ করত হৈ চৈ করে, 'শীতল সভা'র স্বভাবই ছিল সর্বাবস্থায় শান্ত অনুত্তেজিত ভাবটি বজায় রাখা। তাই 'গুড়ুম সভা' যখন ঢাক পিটিয়ে নিজেদের কাজকর্মের জানান দিচ্ছে, 'শীতল সভা'য় তখন নীরব প্রস্তুতি। সতীপ্রথা পুনঃস্থাপনের জন্য ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে বেথি সাহেব বিলাত যাচ্ছেন—এ সংবাদ পেয়ে ৬৩০ সংখ্যা 'সমাচার দর্পণে' সম্পাদক প্রশ্ন তুললেন, যাঁরা 'ধর্মসভা'র সমর্থক নয়, তাঁরা কেন তাঁদের পক্ষের শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলি পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছেন না? উত্তর দিলেন কৌমদী-সম্পাদক। তিনি লিখলেন, সম্পাদক বোধহয় জানেন না যে পরম পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রচুর পরিমাণে সতী-নিষেধক উক্তি সংগৃহীত হয়েছে, এবং এজন্য যে সামান্য অর্থ লাগবে তাও। তবে এরা 'ধর্মসভা'র মতো আদাজল খেয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহে বা অর্থ সংগ্রহে নামেন নি, কারণ উদ্দেশ্য তাঁদের একটাই। যে ভদ্রলোকটি এইসব কাগজপত্র নিয়ে ইংলণ্ডে যাবেন, তাঁকে তাঁর যাবার খরচ হিসাবে ৫,০০০ টাকা দিতে চাওয়া হয়। কিন্তু এদেশীয় মেয়েদের প্রাণরক্ষার আবেদন নিয়ে যাবার মতো একটি ন্যায়সঙ্গত কাজের জন্য তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সতীপ্রথার বিলুপ্তি দেখতে পেলে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হবেন। ইংলণ্ডে এই আবেদনটি নিয়ে খুব শীঘ্রই যাত্রা করার জন্য তিনি প্রস্তুত।[২৬]

মানুষটির নাম যে রামমোহন রায়, তা না বললেও চলে।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন রামমোহন। একজন হিন্দু সমুদ্রযাত্রা করছেন—নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিলাতে গিয়েও সতী নিবারক আইন যাতে বলবৎ থাকে তার জন্য তাঁর প্রয়াসকে আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব। দেখতে পাব,

খাস ইংলণ্ডের বুকে সতী নিবারণে তাঁর ভূমিকার কথা সাহেবরা পর্যন্ত কেমন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছে। দেখব, ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রিভি কাউন্সিলে সতীপক্ষর চূড়ান্ত পরাজয়ের পরে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে আয়োজিত জয়োল্লাস-সভায় রামমোহনের ঘোর বিরোধী ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনকে কেমন উচ্ছ্বসিতভাষায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' সতী নিবারণে তাঁর ভূমিকাকে স্বীকার করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে 'brightest ornament of Bengal' বলে অভিহিত করে সতী নিবারণে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে পত্রিকাটি লেখে :

'... as early as 1820 he turned his thoughts to the abolition of the suttee rites in which he has acted so prominent a part ···It is so his learning and exertions chiefly that we are indebted for that lucid exposition of our doctrines affecting female sacrifice which has saved millions of our fellow creatures from a most cruel suffocation.'[২৭]

আর এক ইয়ংবেঙ্গল রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহনের মৃত্যুর পর টাউন হলে আয়োজিত স্মরণসভায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সতী নিবারণে তাঁর ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন :

'No doubt most of our countrymen will object to Rammohun Roy on account of the pre-eminent part he took in the abolition of the suttee. It has been well observed, that he was almost alone in the cause of humanity. It may be said that he thereby injured the religious feelings of his countrymen, and induced the govt. to do that which it had no right to do—to encroach on the religious rites of the country. Whatever may be the opinion of my countrymen on the subject, it will not, I hope, be doubted that even in this he was not only the great man he was supposed, but also a good man, the friend of humanity and of his country, the saviour of the lives of many of his species'[২৮]

সব মিলিয়ে এ-বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা রামমোহন করেছিলেন

সত্য, কিন্তু এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে সমাজকে নাড়া দেবার, আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার ও আইনকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য লড়ায়ে নামার গৌরব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। তাঁর এ কৃতিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি। সতী নিষেধক আইন পাশ হলে সাধারণ মানুষ একে কি ভাবে নিল, কি চোখে দেখল, তা তো এখনও দেখি নি।

আইন পাশ হলে দেশে বা সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ কোনো অসন্তোষ দেখা দেয় নি। আসলে দেশের বৃহত্তর জনসমাজে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়াই হয় নি। মার্শম্যানের মতে এই আইন প্রণয়নের পরে বাংলা দেশে আইন অমান্য করে জনা ২৫ মেয়ে সতী হবার চেষ্টা করলেও, শেষপর্যন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে তারা রক্ষা পায়। জানি না, কোন সূত্র থেকে মার্শম্যান এই খবর যোগাড় করেছিলেন এবং তাঁর খবর কতখানি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সতী নিবারিত হবার পর প্রায়দিনই একটি না একটি সহমরণোদ্যতা নারীকে নিবৃত্ত করার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত।

'এম' স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি 'বেঙ্গল হরকরা'য় এক চিঠি লিখে কালীঘাটের কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সহমরণোদ্যতা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মার্স্টার্সের তৎপরতায় তার নিবৃত্ত হবার ঘটনা বর্ণনা করে প্রসঙ্গত জানান, কল্যাণকর সতী আইন পাশ হবার পর থেকে এই বিধবাটি ও আরো প্রায় ২০ জনকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছে।[২৯]

কয়েকদিন পরে 'জন বুল' মানিকতলার মানিক মণ্ডলের স্ত্রীর সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত হবার ঘটনা বর্ণনা করে। ঘটনাটি বলি :

আপার সার্কুলার রোডের কাছেই ৭নং বাউণ্ডারি গার্ডের উল্টোদিকে থাকত মানিক মণ্ডল। ২৩ ডিসেম্বর, ডোমতলা লেনে গাড়ি চাপা পড়ার পর ২৫ তারিখে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী দাসী তার সঙ্গে সহমরণে যাবার কথা বলে। কিন্তু মানিকতলার থানাদার তার সঙ্কল্পে বাদ সাধে এবং কলকাতার শহরতলীর ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতায় তার প্রাণ রক্ষা পায়। দাসী আবার ঘরে ফিরে আসে। ঘটনাটি বর্ণনা করে 'জন বুল' মন্তব্য করে, এই সুন্দর ও মানবীয় আইনের ফলে সরকারি হস্তক্ষেপে অনেক মেয়েই বীভৎস ও নির্মম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।[৩০]

এই মাসেই 'হরকরা'য় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী কলকাতার কাছেই একটি মেয়ে সতী হতে উদ্যত হলে থানার কনস্টেবল তাকে জানায় কাজটি সরকারি আইনবিরুদ্ধ। একথা শুনে সে নাকি উৎফুল্ল হয়ে উঠে আনন্দের সঙ্গে বাড়ি ফেরে।[৩১]

এইমাসেই হুগলির রাজপুর থানার মৌরী গ্রামের জিতনারায়ণ ঘোষের স্ত্রীকে বা পানিহাটির মৃত্যুঞ্জয় সরকারের স্ত্রীকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। দু'একটি মেয়ে অবশ্য আইনের বাধা না মেনে শেষপর্যন্ত সতী হয়। এরকম একটা ঘটনার কথা বলি :

শুক্রবার, ২৬ বৈশাখ, ১২৩৭-এ শাহাবাদের আরা পরগণার পিরোটা গ্রামের শিবনারায়ণ সিং নামে এক শ্রীবাস্তব কায়স্থ ৩২ বছর বয়সে মারা গেলে তাকে সংকারের জন্যে নদীতীরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার ১৮/১৯ বছরের সদ্যবিধবা বউটি সেখানে উপস্থিত থাকলেও, সে যে সতী হবে এমন কথা কিছু বলেনি। বেলা দুটো নাগাদ মৃতদেহে অগ্নিসংযোগের পূর্বমুহূর্তে সে একজন বামুনকে সহমরণের শাস্ত্রাচারটি করতে বলে। একটু ইতস্তত করে সে তা করে। অল্পক্ষণ পরে চারিদিকে তাকিয়ে যথাবিহিত অনুষ্ঠান পালন না করেই মেয়েটি জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দারোগা যখন ঘটনাস্থলে আসেন, সতীদেহ তখন প্রায় অর্ধেকের বেশি পুড়ে গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১০/১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান দেওয়া হয়। ঘটনাটি সম্পর্কে 'চন্দ্রিকা' মন্তব্য করে 'বিধিলিপির অন্যথা হয় না অর্থাৎ ৺ইচ্ছায় সতীর ভাগ্যে ছিল সহমরণ হইবেক তাহা কে খণ্ডিতে পারে এক্ষণে তাহার পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহা হইবেক।'[৩২]

দু'একটি ক্ষেত্রে পুলিশি অপদার্থতার সুযোগেও মেয়েরা সতী হত। ত্রিহুতের রূপাস গ্রামে এক প্রভাবশালী রাজপুত ১৫ জানুয়ারি নাগাদ মারা গেলে তার স্ত্রী সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। খবর পেয়ে দারোগা কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে মৃতের আত্মীয়রা লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করে। দারোগাবাবু নিপাট ভালোমানুষ, ঝগড়াঝাঁটি না করে ফিরে এলে মেয়েটি নির্বিঘ্নে সতী হয়, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর পৌঁছলে তিনি দারোগাকে বরখাস্ত করেন।[৩৩]

রক্ষণশীলদের পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' আইন অমান্য করে যারা সতী হত

মহা উৎসাহে তাদের খবর ছাপত, মাঝে মাঝে উৎসাহধিক্যে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করত। 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এ ধরনের একটি ঘটনা নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল :

হুগলি জেলার ভুরসুট পরগণার বৈকুণ্ঠ গ্রামের রাধারমণ নন্দীর বাবা রবিবার ৭ আষাঢ়, ১২৩৭-এ বেলা ভুটোর সময় গঙ্গাতীরে মারা গেলে তাঁর স্ত্রী সজ্ঞানে সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। রাধারমণ গ্রামের প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের কাছে মার ইচ্ছা জানিয়ে তাদের অনুরোধ জানায়, 'আমার মা আমার বাবার সঙ্গে সহমরণে যাবেন—এজন্য সরকার আমাকে যা খুশি শাস্তি দেয় দিক, কিন্তু আপনারা আমার সহায় হন।' গ্রামবাসীরা ভদ্র, নম্র, শান্তিপ্রিয়। তাকে সাহায্য করলে পাছে শাস্তিভোগ করতে হয় এই ভয়ে তারা বলল, 'এখন তো এ-বিষয়ে কড়াকড়িভাবে সরকারি আদেশ আছে, কাজেই তোমার মা কেমন করে সতী হবেন? বরং তোমার মাকে না জানিয়ে তোমার বাবার শেষকাজ সম্পন্ন করো।' গ্রামবাসীদের কথা শুনে তার শেষ আশা তিরোহিত হল। সে একজন সামান্য কলু, কিই-বা তার সামর্থ্য। ঘটনাটির পর সেই সতীসাধ্বী ১৮ দিন অনাহারে থেকে গত বুধবার বেলা তিনটা নাগাদ স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

রাধারমণের চিঠিটি প্রকাশ করে চন্দ্রিকাকারের সে কি শোকোচ্ছ্বাস। 'এ সংবাদে আমরা কতদূর মর্মাহত তা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য। এক্ষেত্রে একজন সতীসাধ্বী সতীপ্রথায় সরকারি নিষেধের জন্য অনির্বচনীয় মানসিক কষ্ট সহ্য করে প্রাণত্যাগ করেছে। কিন্তু দেহত্যাগের পর সে নিশ্চয়ই পরমানন্দের সন্ধান পেয়েছে। কারণ স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা। এই মহিলাটি স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হতে না পারলেও শোকাচ্ছন্ন হয়ে স্বামীকেই তার একমাত্র দেবতা জেনে এই পার্থিব জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছে। ঘটনাটি আমাদের কাছে অতীব দুঃখের। তার মৃত্যুর পর তার শিশুসন্তানরা কিভাবে প্রাণধারণ করবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। মানুষ সন্তানকামনা করে দুটি কারণে। প্রথমত পিতামাতার জীবৎকালে তারা তাদের সেবা করবে, এবং মৃত্যুর পর শাস্ত্রানুসারে শেষ-কৃত্য করবে। এই সাধ্বীর সন্তানদের পক্ষে তাদের মাকে সতী হতে দেওয়া ছিল ক্ষমতার বাইরে। মানুষ গভীর বিপদে পড়লে রাজাকে তা জানায়, কিন্তু স্বয়ং রাজাই যেখানে এই প্রথার উচ্ছেদকর্তা সেখানে কি উপায়? বর্তমানে স্বস্তির

কোনো লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, শেষভরসা পরমেশ্বরের কৃপা—যে ধর্ম তাঁর সৃষ্টি একমাত্র তিনিই তা রাখতে পারেন।'[৩৪]

তিনি এত কাঁদুনি গাইবার পরও চন্দ্রিকাকারকে বসিয়ে দিল 'সংবাদ কৌমুদী।' ১৯ শ্রাবণ, ১২৩৭-এ 'কৌমুদী' জানাল, অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, ঘটনাটি ডাহা মিথ্যা, বৈকুণ্ঠপুরের নন্দীর বউ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, এবং তার স্বামীর শ্রাদ্ধের যোগাড়যন্ত্র করছে। চন্দ্রিকা-সম্পাদককে 'কৌমুদী' অনুসন্ধান করে ভুল স্বীকার করতে পরামর্শ দেয়। চন্দ্রিকার এইসব গালগল্প দর্পণকার বিশ্বাস করে তাঁর কাগজে স্থান দেওয়ায় 'কৌমুদী' বিস্ময়প্রকাশ করে।[৩৫] ঘটনার প্রকৃত রূপটি প্রকাশ করে 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' মন্তব্য করে, আশা করি ভবিষ্যতে চন্দ্রিকাকার এ-বিষয়ে আরো সতর্ক হবেন। বিস্ময়ের সঙ্গে পত্রিকাটি প্রশ্ন তোলে 'What kind of a cause must that be which requires to be bolstered up by such figments.'[৩৬]

এদিকে দিন যায়। ইংলণ্ডে যাবার প্রস্তুতিপর্ব শেষ, এখন শুধু যাবার প্রতীক্ষা। ২৭ জুলাই 'আলেকজাণ্ডার' ছাড়বে। তাতে মিঃ বেথি পাড়ি জমাবেন সতীপ্রথাকে পুনঃস্থাপন করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে। যাবার আগে 'ধর্মসভা'র বৈঠক বসল। হ্যাঁ, ২৫ জুলাই-এর এই বৈঠকে বেথি সাহেবও উপস্থিত ছিলেন বইকি। সবাইকে মধুরস্বরে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন:

'I am now proceeding to England on your behalf, and to fulfil your wishes will spare no labor either of body, mind or speech. I take God to witness that there shall be no negligence on my part. After having carefully persued your petition, and the legal opinions and documents with which it is supported, I feel a firm conviction that your request will certainly be granted.'[৩৭]

একদিকে বেথি যখন 'ধর্মসভা'র সভ্যদের এইভাবে আশ্বস্ত করছেন, অন্যদিকে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণও প্রস্তুত হচ্ছেন সমুদ্রযাত্রায়। তিনিও যাবেন ইংলণ্ড রাজদরবারে সতীপ্রথা সম্পর্কে হিন্দুদের একাংশের মতামত পৌঁছে দিতে। তাঁর জাহাজের নাম 'এলবিয়ন'। কলকাতা ছাড়বে ১৯ নভেম্বর। যাত্রার দিনকয়েক আগে পাণ্টা আবেদনপত্রের একটি কপি তিনি 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র

প্রতিনিধির হাতে দিয়ে তিনি যাত্রা করার পর তা পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দেন। সতী-বিরোধী এই আবেদনে বলা হয় :

'নিষ্ঠুর অমানবিক সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবাসীর অপরিমেয় কল্যাণ করেছেন। অনেকেই এ-আইনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছে। যদিও অধিকাংশ দেশীয় ব্যক্তিই বিষয়টি সম্পর্কে নিস্পৃহ ও উদাসীন। এ আইন জারির পর প্রায় ১২ মাস কেটে গেছে। এ-প্রথা নিবারণের জন্য দেশীয় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন (এই অভিনন্দনপত্রটি আবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়)।

আবেদনকারীরা জানতে পেরেছেন, প্রাচীন রীতিনীতির ভক্ত কিছুসংখ্যক দেশীয় ব্যক্তি এক আবেদন পেশ করে সতীপ্রথা পুনঃস্থাপনের প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁদের মতামত সমগ্র দেশীয়সমাজের মতামত নয় ; এবং আবেদনকারীরা তাই সবিনয়ে স্থানীয় সরকারের আদেশকে স্থায়ীভাবে বহাল রাখার আবেদন জানাচ্ছেন।

আবেদনকারীরা মনে করেন সমস্তরকম প্রাকৃতিক, সামাজিক ও কল্যাণ-কামী সরকারি নীতির বিরোধী এই প্রথা কখনও অনারেবল হাউসের অনুমোদন পাবে না এবং এ-প্রথা পুনঃস্থাপন করে তাঁরা কখনও ব্রিটিশ নাম ও চরিত্রকে কলঙ্কিত করবেন না।

আবেদনকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস অনারেবল হাউস স্থানীয় সরকারের এ-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে বলবৎ রাখবেন।'[১৩৮]

দেখা যাচ্ছে, লড়াই বেশ জমে উঠেছে। হিন্দুরা নিজেরাই এ ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। পত্রপত্রিকাগুলি উত্তপ্ত। চতুর্দিকে সাজো সাজো রব। সবাই বসে আছে শেষ বিচারের আশায়। সে আসর বসবে ইংলণ্ডে।

অতঃপর ইংলণ্ড—স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ড।

১২। ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

দুটি জাহাজ—'আলেকজাণ্ডার' আর 'আলবিয়ন'।

'আলেকজাণ্ডার' ছাড়বে আগে, 'আলবিয়ন' পরে। ২৭ জুলাই, ১৮৩০-এ 'আলেকজাণ্ডারে' চড়ে 'ধর্মসভা'র পক্ষে মিঃ ফ্রান্সিস বেথি ইংলণ্ডে পাড়ি জমালেন। যাত্রা কিন্তু শুভ হল না।

কিছুদূর যাবার পর কেডগিরির কাছে একটি ফুটো দিয়ে জাহাজে প্রবলবেগে জল ঢুকতে আরম্ভ করে। ৬ আগস্ট বিকেলের দিকে জাহাজের ডুবুডুবু অবস্থা, জাহাজের খোলে ৯ ফুটের মতো জল। বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেন বুদ্ধি খাটিয়ে জাহাজ তীরের কাছে ভেড়ান। যাত্রীরা মাটিতে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বেথি সাহেবও বাধ্য হয়ে সতী দরখাস্তসহ আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

সতীবিরোধীরা স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, এমনটি ঘটবে এতো জানা কথা। রামমোহনপন্থীদের পত্রিকা 'সংবাদ কৌমুদী' লিখল, 'সতীপ্রথা পুনঃস্থাপনের জন্য যে আবেদন ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছিল, তা আমাদের দেশের নারীজাতির সুকৃতি ও পুণ্যের ফলে আবার ফিরে এসেছে। যে জাহাজ এটি নিয়ে যাচ্ছিল, পথে তা প্রায় ডুবতে বসেছিল।' এন. ডি. স্বাক্ষরে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' একজন মন্তব্য করলেন, 'এরকম একটা আবেদন বহন করে নিয়ে যাবার জন্যই জাহাজটির ভাগ্যে এই দুর্ঘটনা! দুষ্ট লোকে বলছে, জাহাজের ক্ষতির বহর দেখে 'আলেকজাণ্ডারে'র ক্যাপ্টেন আবার এই আবেদনপত্রটি নিয়ে যেতে শঙ্কিত হচ্ছেন। তাই বহুজনের মুখ চেয়ে পুনর্যাত্রার আগে প্রথমেই তিনি আবেদনপত্রসহ এর বাহককে জাহাজ থেকে নেমে নিজের পথ দেখতে বলবেন।'

দুর্ঘটনার ফলে রক্ষণশীল শিবির একটু মুষড়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু খাড়া হয়ে দাঁড়াতেও তাদের দেরী হল না। মুখ খুললেন প্রথমে মিঃ বেথি। বললেন, 'এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে সাধারণত প্রাণহানি হয়, কিন্তু

সতী-আবেদনের বাহক হিসাবে আমাকে ও আমার সহযাত্রীদের ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।'

'সমাচার দর্পণ' এইরকম আবেদনপত্র জাহাজে থাকার জন্য দুর্ঘটনা ঘটেছে, অথবা এরই জন্য যাত্রীদের প্রাণরক্ষা পেয়েছে—তা স্থির করার ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দেয়।

'ধর্মসভা'র মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' ঘটনাটিতে দুঃখমিশ্রিত আনন্দ প্রকাশ করে বলল, যাঁরা এই আবেদনে তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত করতে চান, চূড়ান্ত-যাত্রার পূর্বে ডাকযোগে তাঁরা তা করতে পারেন। মিঃ বেথি পুনর্যাত্রা করার জন্য খুবই উৎসুক। যাই হোক, এই বিলম্বের ফলে আমাদের উৎসাহ বর্ধিত হয়েছে, এবং এই দুর্ঘটনার জন্য প্রকারান্তরে আমরা কৃতজ্ঞ।[১]

পেছিয়ে গেলেও বেথির যাওয়া কিন্তু বন্ধ হল না। ১২. ৫. ১৮৩১-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা' জানাল, 'শ্রীযুত এফ. বেথি সাহেব যিনি সতীর পক্ষে উকিল হইয়া আলিকৃজাণ্ডার নামক জাহাজারোহণে বিলাত গমন করিতেছেন তিনি সেণ্ট হেলেনা নামক স্থান হইতে গত ১৮৩০ সালের ২১ নবেম্বর তারিখে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে শারীরিক ভাল আছেন এবং অনুমান করেন এই জাহাজ জানেওয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিলাতে পঁহুছিবে ইহাতে সন্দেহ নাই—'

অন্যদিকে সতীবিরোধী শিবিরের নেতা রামমোহনের জাহাজ 'আলবিয়ন' ১৯ নভেম্বর, ১৮৩০-এ পূর্বনির্দিষ্ট দিনেই ছাড়ল। তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন শত্রুরা নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন। কেউ বললেন ইংলণ্ডে পৌছবার আগেই তিনি কোনো দুর্ঘটনায় পড়বেন, কেউ বললেন ঈশ্বরের অভিশাপে যাত্রা শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হবে, কেউ বললেন ইংলণ্ড থেকে তাঁকে মাথা নীচু করে ফিরতে হবে।[২] যে যাই বলুক, পথে কোনো অঘটন ঘটল না। যাত্রা হল আরামপ্রদ, জাহাজের কর্মীদের ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ। ৮ এপ্রিল, ১৮৩১-এ রামমোহন নিরাপদে 'আলবিয়ন' থেকে লিভারপুলে নামলেন, সেখান থেকে সোজা এসে পৌছলেন লণ্ডনে। তাঁকে ঘিরে সেখানে অজস্র কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। একজন হিন্দু-ব্রাহ্মণ সাতসাগর পাড়ি দিয়ে লণ্ডনে এসেছেন—পোশাক তাঁর ঝলমলে, বাহু আজানুলম্বিত, চোখে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি—দেখে সাহেবদের রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এ-দেশীয় বিদ্বৎসমাজেও অপরিচিত নন তিনি। তাঁর একেশ্বরবাদী মতামত, সতীপ্রথার বিরোধিতা ইত্যাদির জন্য লণ্ডনের কাগজগুলি

অনেক বছর আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী। তাঁর আসার খবর পেয়ে জেরোমী বেন্থামের মতো দার্শনিক ছুটে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পদমর্যাদাও তাঁর কম নয়—রাজা তিনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করল। সেই আলোকিত ভোজের আসরে নানাপ্রকার সুস্বাদু মাংস ও দুর্লভ মদ্যের মাঝখানে বসে শুধু ভাত আর জল ছাড়া অন্যকিছু তিনি স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না।[৩] সাহেবরা তো দেখে অবাক। কয়েকদিন পরে ৭ই সেপ্টেম্বর, বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট চার্লস গ্রাণ্ট তাঁকে রাজদর্শনে নিয়ে গেলেন। ইংলণ্ডের রাজাকে অভিবাদন জানালেন আধুনিক ভারতের আর এক রাজা—রামমোহন রায়।

লণ্ডনে এসেছেন রামমোহন। কাজেই 'লণ্ডন ইউনিটারিয়ান এসোসিয়েশন' সমমনা এই মানুষটিকে স্বাগত জানাতে তৎপর হয়ে উঠল। রেভাঃ রবার্ট আস্পল্যাণ্ড-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'লণ্ডন ইউনিটারিয়ান এসোসিয়েশনে'র জনাকীর্ণ এক অধিবেশনে এই 'বিখ্যাত অতিথি'কে স্বাগত জানান হল। কেউ তাঁকে বললেন সহকর্মী, কেউ বন্ধু, কেউ ভাই। ডাঃ বাউরিং এই সভায় সতীনিবারণে তাঁর ভূমিকার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বললেন, 'If at this moment Hindoo Piles are not burning for the reception of widows, it is owing to his exhortations, to his arguments.'[৪]

কিন্তু এত জাঁকজমকের মধ্যে থেকে, সাহেবদের মুখ থেকে গাদাগাদা প্রশস্তিবচন শুনেও রামমোহনের মাথা ঘুরে যায় নি। আসল কাজটি তিনি ঠিকই মনে রেখেছিলেন। এরমধ্যেই একদিন লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা করে সতীবিষয়ে নিজের মতামত জানিয়ে এলেন। বললেন, 'প্রত্যেকটি মানবীয় হৃদয় নিঃসন্দেহে এ-প্রথা বিলোপে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।' ভারতের সতী-বিরোধীদের আবেদনটিও তাঁর হাতে দিয়ে এলেন। ১ জুলাই, ১৮৩১-এ হাউস অব লর্ডসে মার্ক্ইস অব ল্যান্সডাউন এই আবেদনটি পেশ করতে গিয়ে বললেন, 'ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কয়েকবছর আগে অনেক ভাবনাচিন্তা করে অমানবিক সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করেন। এর কয়েকমাস পরে কিছুসংখ্যক হিন্দু কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে বিষয়টি সম্পর্কে প্রিভি কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের বক্তব্য প্রিভি কাউন্সিলে পেশ করা হয়েছে, এবং কাউন্সিলের

কর্তব্য তা শোনা। এই আবেদনটি পেশ করার পর ভারতের একজন নামকরা ব্যক্তি রামমোহন রায় (যাঁকে সদস্যদের কেউ কেউ জানেন) তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন, ভারতে প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঐ ধরনের আবেদন প্রিভি কাউন্সিলের পরিবর্তে হাউস অব লর্ডসে পেশ করাই সমীচীন। সেইজন্য ভারতের কিছুসংখ্যক অতি সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তি একটি পাল্টা আবেদন হাউস অব লর্ডসে পেশ করতে মনস্থ করেন। এই আবেদনে বেণ্টিঙ্কের সতীপ্রথা নিবারণকে তাঁরা কত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দেখেন, এ-প্রথা যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়, মনুর বিধান অনুযায়ী বিধবার ব্রহ্মচর্যই যে বিধেয় তা দেখিয়ে, এ-প্রথা নিবারণের জন্য সরকারের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।[৫]

অর্থাৎ সতীপ্রথাকে হিন্দুমাত্রেই যে একচোখে দেখে না, এ বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই যে মতভেদ আছে—এই অতিপ্রয়োজনীয় সংবাদটি রামমোহন হাউস অব লর্ডস পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে সতী-বিরোধী লোকের সংখ্যা যে কম নয়, সাহেবরা তা বুঝতে পারলেন। ইংলণ্ডে রামমোহন সতীবিরোধী শিবিরের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত হলেন।[৬]

কিন্তু সতীসমর্থক বেথি সাহেব ইংলণ্ডে এসে করলেনটা কি? আবেদন তিনিও যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। এবং মাঝে মাঝে চিঠি লিখে 'ধর্মসভা'র পরিবেশকে উত্তপ্ত রাখার দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করে চললেন। ১৯. ১০. ১৮৩১-এ 'ধর্মসভা'র অধ্যক্ষদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে বললেন, জেনারেল পামারের হাত দিয়ে তিনি তাঁদের কাছে খোশখবরভরা এমন একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যা থেকে তাঁরা বুঝতে পারবেন, তিনি তাঁদের জন্যে কি করেছেন! খবরটি 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, ইংরেজরা কি তাহলে সতীপ্রথা পুনঃস্থাপন করতে চলেছে বা করার আশ্বাস দিয়েছে—এও কি সম্ভব? ইংলণ্ডের অধিবাসীরা কি এতই নির্মম যে শুধুমাত্র বেথির পরামর্শে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে তাঁরা স্ত্রীহত্যাকে আবার মেনে নেবেন? ভারতের নারীজাতি তাঁদের কাছে কি এমন অপরাধে অপরাধী যে তাদের ওপর এরকম ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে হবে। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'এনকোয়েরার' বেথির আচরণকে ইংরেজ নামের অযোগ্য বলে বর্ণনা করে তাঁর আশ্বাসবাণীতে গভীর সংশয় প্রকাশ করে লিখল:

'Have the people of England and their representatives in Parliament lost their sense of humanity and agrown callous to those passions that exalthuman nature ?—No , that supposition would be a contradiction of what they are doing and a gross libel upon them. They are Englishmen, and as such it is impossible that they would sanction so barbarous a practice of fanaticism and superstition. We must therefore pause before we take Mr. Bathie's assurances to the Dhurmo Shuba as truth, and are naturally led to be sceptical in consequence of his having proofs of venality and ugly inconsistencies '[৭]

যে যাই বলুক, বেথির আশ্বাস পেয়ে 'ধর্মসভা'র ধার্মিকদের উৎসাহ-আনন্দ দেখে কে। শুধু বেথির কাছ থেকেই নয়, অন্যদের কাছ থেকেও চাক্রকাকার মাঝেমাঝে উৎসাহজনক কথা শুনতেন। এদের মধ্যে 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' সম্পাদক মুনসী আলিমোল্লার মতামতে তৃপ্ত হয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে লেখেন :

'তিনি হিন্দুর ধর্মবিষয়ে বিশেষতঃ সতীর পক্ষ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ করিলাম এবং তাহার বিজ্ঞতা ও পক্ষপাতরাহিত্য প্রকাশ পাইয়াছে।'[৮]

এদেশে যখন সতীপ্রথার পুনঃস্থাপন নিয়ে কানাকানি চলছে, ওদেশে প্রিভি কাউন্সিলে তখন শেষ বিচারের আসর। ১৮৩২-এর জুন-জুলাই-এ আসর রীতিমতো জমজমাট। ভারতের কিছুসংখ্যক হিন্দু অধিবাসী ৫টি কারণে সতী সম্পর্কিত আদেশ নাকচ করার আবেদন জানায় :

(১) এতদ্বারা আবেদনকারীদের পবিত্র ধর্মীয়প্রথা ও আচারে হস্তক্ষেপ করার ফলে সমগ্র জাতির ধর্মবিশ্বাস আহত হয়েছে।

(২) সতী আইনের মুখবন্ধে এ আইন প্রণয়নের যে কারণ দেখানো হয়েছে তথ্যের দিক দিয়ে তা ভুল, এবং হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এখানে যা বলা হয়েছে, তাও সত্য নয়।

(৩) যদি এ-প্রথার কোনো দোষ থেকেও থাকে (যা নেই বলেই আবেদনকারীরা মনে করেন), তাহলে হিন্দুদের যথোচিত দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে তা সংশোধন করা যেতে পারে।

(৪) গবর্নর জেনারেলের কাছে ১৯.১২.১৮২৯-এ এ আইন সম্পর্কে প্রতিবাদ জানালে তিনি যথাবিহিত তথ্যানুসন্ধান না করেই প্রতিবাদপত্রটি নাকচ করে দেন।

(৫) এতদ্বারা হিন্দুদের ধর্ম, আচার-আচরণে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে সরকার দেশীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করার পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।

অভিযোগের উত্তরে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর তরফ থেকে বলা হয়, বাংলার জনগণ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাংলার গবর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয়েছে এবং তা ব্রিটিশ আইনের দ্বারা স্বীকৃত। ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে ভারতীয় সরকার দেশীয়দের ধর্মবিশ্বাসকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। বহুদিন ধরেই সরকারের দৃষ্টি বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করে তবেই গবর্নর জেনারেল এ-বিষয়ক আইন প্রণয়ন করেছেন। হিন্দুদের আবেদনপত্রটি নাকচ কবার পক্ষে কোম্পানির তবফ থেকে ৪টি কারণ দেখান হয়:

(১) বংশের সুনাম বাড়ানো বা মৃতের সম্পত্তি গ্রাস করার মনোবৃত্তির দরুণ এ-প্রথা অনেকসময় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হত।

(২) সতী হওয়া সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার প্রতি আবশ্যিক কোনো নির্দেশ নেই।

(৩) এই আইনকে সরকারের দেশীয়দের ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতার মনোভাব থেকে বিচ্যুতি বলা যায় না। ধর্মীয় কৃত্য হিসাবে সতীপ্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, হয়েছে সমাজের জাজ্বল্যমান এক অপরাধ হিসাবে। অনেক হিন্দুও এ প্রথাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

(৪) মানবিক অনুভূতিবিরোধী এ-প্রথা সুযোগমতো নিরাপদে দমন করা সরকারমাত্রেরই কর্তব্য। এতদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক কারণে এ-প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সমীচীন বোধ হয় নি। বর্তমান অনুকূল সময়ে দেশীয় প্রজাদের কল্যাণচিন্তা করেই সরকার একে নিষিদ্ধ করেছেন।[৯]

আবেদনকারীদের পক্ষ সমর্থন করেন ডঃ ল্যাসিংটন, মিঃ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং মিঃ ম্যাডুগল। প্রতিবাদীপক্ষে দাঁড়ান এটর্নি ও সলিসিটর জেনারেল স্যার জে স্কারলেট, স্যার সি. উইদারেল, স্যার ই. স্যাগডেন, মিঃ সার্জ স্পানকি এবং মিঃ লয়েড।

সওয়াল-জবাব চলল দিনের পর দিন। অন্যান্যদের সঙ্গে রামমোহন রায়ও এইসব দিন উপস্থিত থেকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে দু'তরফের বক্তব্য শুনতেন। ২৩ জুন, ১৮৩২ ডঃ ল্যাসিংটন আবেদনকারীদের পক্ষ সমর্থনে এক জোরালো বক্তৃতায় এই আইনকে 'unjust, impolitic, and direct infringement of the sacred pledge to keep inviolate the religion laws and usages of the Hindoos' বলে অভিহিত করেন।[১০] লণ্ডনের 'খ্রীশ্চান অবজার্ভর' পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করে, আবেদনকারীদের এই অমানবিক প্রথা পুনরুজ্জীবিত করার অনুমতি আবার দেওয়া হবে এমন বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও আমাদের নেই—তা ডাঃ ল্যাসিংটন আবেদনকারীদের পক্ষ সমর্থনে তাঁর প্রতিভা (যাকে তিনি বেশ্যাবৃত্তির কাজে লাগিয়েছেন) যতই দেখান না কেন।[১১] বহু-প্রতীক্ষিত রায় ঘোষণার দিন ধার্য হল শনিবার ১১ জুলাই, ১৮৩২। রামমোহনকে আগে থেকে দিনটি জানিয়ে দেন লর্ড ল্যান্সডাউন। এজন্য লর্ড ল্যান্সডাউনকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে রামমোহন লিখলেন:

'R. R. will not fail to be present at 11 'O' clock to witness personally the scene in which an English Gentleman (or Gentlemen) of highly liberal education professing Christianity is to pray for the establishment of suicide, and in many instances actual murder'[১২]

১১ জুলাই, ১৮৩২। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে সতীপক্ষীয়দের আবেদন নাকচ করে দেবার রায় ঘোষিত হল। রায় অবশ্য সর্বসম্মত হয় নি। মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন, মার্কুইস ওয়েলেসলি, লর্ড জন রাসেল, লর্ড ব্রুহাম, স্যার শাডওয়েল, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট প্রভৃতিরা প্রিভি কাউন্সিলে সতী নিবারণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। রায় জেনে লণ্ডনের 'খ্রীশ্চান অবজার্ভর' পত্রিকা আনন্দ প্রকাশ করে।

লণ্ডন থেকে কলকাতা কম পথ নয়। এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কলকাতায় খবর পৌঁছতে পৌঁছতে কেটে গেল কয়েকটা মাস। নভেম্বরের গোড়ার দিকে কলকাতায় খবর এসে পৌঁছল। সতীবিরোধীরা লাফিয়ে উঠলেন, জয় হয়েছে আমাদের, জয়! সোমবার ৫ নভেম্বর, ১৮৩২ সন্ধ্যাবেলা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সতীপক্ষীয়দের আবেদন ডিসমিস হয়ে যাবার খবর জানাল। খবর পেয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মর্মাহত সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন:

'এ প্রকার ধর্মের প্রতি ব্যাঘাত হওয়াতে অবশ্য কহিতে হইবেক পৃথিবী হইতে বিচার মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুসকল এই সম্বাদ পাইয়া হাহারবে ক্রন্দন করিবেন তাঁহাদিগের অক্ষিসলিলে যে নদী বহিবেক তাহা কে দৃক্‌পাত করিবেন।'

'সংবাদ রত্নাবলী'তে তরুণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দুঃখ করে লিখলেন:

'হায় ২ কি কালমাহাত্ম্য পিতাতুল্য যে রাজা তিনিও সন্তানে স্নেহহীন হইলেন এবং ধর্মনাশের কালে ধর্মরাজ কি নীরবে রহিলেন···।'

অল্পদিন পরে গবর্নরের সতী নিবারণ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে আবার লিখলেন:

' গবর্নর জেনরল যশোলাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতী নিবারণের আইন করিলেন প্রিবিকৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়রা ঐ লোভেও লোভি হইয়াছেন ইহার সন্দেহ নাই হিন্দুসকল ধর্মহানিতে মনঃপীড়ায় পীড়িত হইবেন ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবেক অতএব এই কারণে আপিল ডিসমিস হইয়াছে ইহার পর তজ্জবিজে যে মঙ্গল হয় এমত বুঝিতে পারি না তবে ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ এই ভরসা আছে মাত্র।'[১৩]

রক্ষণশীলদের চোখের জলেই প্রিভি-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ভারী হয়ে উঠল না। ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও এগিয়ে এলেন একে স্বাগত জানাতে। প্রেমচাঁদ রায়ের 'সংবাদ সুধাকর' সতী নিবারণে সন্তোষ প্রকাশ করে। রামমোহনপন্থীদের পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী' আনন্দ প্রকাশ করে লেখে:

'স্ত্রীদাহকারিরা পরাভবহওন জন্য বিরাগ ও বিলাপ করুন কিন্তু সদন্তঃকরণ ব্যক্তিসকল এবং দয়াবিশিষ্ট জনেরা আর প্রকৃত হিন্দুরা অবশ্য ইহাতে আহ্লাদ করিবেন।'[১৪]

প্রগতিশীল বাঙালি যুবকদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখল:

'এইক্ষণে কহিতেছি হে আমারদের মিত্রেরা আপনারা এক সভা করিয়া আপন আপন আহ্লাদসূচক প্রবি-কৌন্সেলের এক ধন্যবাদপত্র বিলাতে প্রেরিত করুন।

কেননা বর্ত্তমান রাজ্যাধিপতি ও তন্মন্ত্রিগণেরা যে আমারদের দেশের স্ত্রীলোকের প্রাণদান করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের ধন্যবাদ না করা আমারদের নিতান্ত অবিজ্ঞতা প্রকাশ সদ্বিবেচনা করিলে সকলেরি তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করা উচিত, কিন্তু ধর্মসভার দলস্থেরা তাহা করিবেন না বিশেষতঃ এই

সমাচার শ্রবণে তাঁহারা একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং তাঁহারা এ বিষয়ের কি লিখিয়া যে বিদেশস্থ ধনদাতারদিগের প্রবোধ জন্মাইবেন এই ভাবনাতে তাঁহারদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইবে এখনে রাগান্বিত হইয়া চন্দ্রিকাকার যাহাই বলুন কিন্তু স্ত্রীহত্যারূপ তাঁহারদের পরম ধর্ম আর ফিরিবেক না কেবল মনের খেদেই চিরকাল রহিবে।'[১৫]

'জ্ঞানান্বেষণে'র এই আহ্বানে সাড়া দিয়েই কিনা জানি না, রামমোহনপন্থীরা শনিবার, ১০ নভেম্বর, ১৮৩২-এ সন্ধ্যা ৬টায় জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজগৃহে একটি জয়োল্লাসসভার আয়োজন করেন।

সভার দিন সন্ধ্যার আগে থেকেই জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজে লোকের আনাগোনা। একে একে আসছেন মিঃ জেমস প্যাটেল, কাপ্টেন এভারেস্ট, সদাহাস্যমুখ ডেভিড হেয়ার। দেশীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ ইত্যাদিরা আগেই এসে গেছেন। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব এসেছেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের গায়ে জ্বর, তবু তিনি আসতে ছাড়েন নি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঘরের সব চেয়ার ভর্তি। আরম্ভ হবার সময় দেখা গেল অনেকে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সভায় কম-সে-কম শ'চারেক লোক।

সভাপতি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমে আজকের এই সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। কালীনাথ চৌধুরী সতী নিষিদ্ধ করার জন্য ইংলণ্ডের রাজাকে ধন্যবাদ জানানোর এক প্রস্তাব করলে, মথুরানাথ মল্লিক তা সমর্থন করার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন, সতীপ্রথা নিবারণের জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকেও ধন্যবাদ জানানো উচিত। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সমর্থিত এই প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় এ-প্রথার নিষ্ঠুরতার দিকটি তুলে ধরে এই নির্মম প্রথা নিবারণের জন্য গবর্নর জেনারেল বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ জানাবার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন রামলোচন ঘোষ। বাংলা ও ইংরেজিতে এই ধন্যবাদপ্রস্তাবগুলি রচনা করার জন্য দ্বারকনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাধাপ্রসাদ রায়, হরিহর দত্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরচন্দ্র লাহিড়ি ও শ্যামলাল ঠাকুরকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়।

হরিহর দত্ত প্রস্তাব করলেন, রামমোহন রায় তো এখন ওদেশে আছেন,

কাজেই ইংলণ্ডের রাজা ও কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের ধন্যবাদটুটি তাঁর মাধ্যমেই দেওয়া যেতে পারে। বিনা আপত্তিতে প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হয়। চন্দ্রশেখর দেব এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন. সতী নিবারণের জন্য রামমোহন রায় প্রচুর সময় ও উদ্যম ব্যয় করেছেন, অতএব ধন্যবাদ তাঁরও প্রাপ্য। শ্যামলাল ঠাকুর প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। সমবেত সকলেই আন্তরিকভাবে প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেন।

এবার উঠলেন 'এনকোয়েরারে'র সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার পৃষ্ঠায় রামমোহনকে যিনি 'হাফ লিবারালে'র বেশি কিছু ভাবতে পারেন নি. তিনিই সতীনিবারণে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকাকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়ে বন্ধু চন্দ্রশেখরের প্রস্তাবের সমর্থনে বললেন :

'Babu Krishna Mohana Banerjea in seconding the above spoke of the Raja's perseverance against the suttee. He referred to the Raja's moral strength in standing, the first Hindoo, against some of the glaring superstitions of the country, and, above all, against the inhuman rite of Suttee. He said that the Rajah, though abused and ridiculed publicly by the Chundrika and others, yet remained firm in his career against idolatry and superstition : and spoke wrote and preached against the Suttee with a fortitude which must command the admiration of all good men.'[১৬]

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রও সভায় রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দেন। সভা যখন ভাঙল, রাত তখন গভীর। উপস্থিত সকলেই ধৈর্য ধরে সভার শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। জয়ের আনন্দে চোখমুখ তাঁদের উদ্ভাসিত।

ঘটনাক্রম দেখে রক্ষণশীল শিবির মুষড়ে পড়লেও, এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র চন্দ্রিকাকার নন। ফাঁকা মাঠেই তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কখনো বলেন, হায় হায় জাত-ধর্ম সব গেল, কখনও, ব্রাহ্মসমাজের সভায় মোটেই লোক হয়নি বলে চিৎকার করেন, কখনও, হায় মেয়েরা আর সতী হতে পারবে না বলে কপাল চাপড়ান। শোকাহত চন্দ্রিকাকারকে অগত্যা অগতির গতি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে পরামর্শ ছিল 'জ্ঞানান্বেষণ' :

'হে আমাদের পরমেশ্বর যাহাতে স্ত্রীহত্যা করিতে পারি এমত শক্তি আমাকে দেও ইহাতে পরমেশ্বরের যদ্যপি স্ত্রীহত্যা করিতে বাঞ্ছা হয় তবে চন্দ্রিকাকারের প্রতি অবশ্য প্রত্যাদেশ করিবেন।'

চন্দ্রিকাকার কি 'প্রত্যাদেশ' পেয়েছিলেন জানি না, কিন্তু ১৮২৯ সালের পরেও সতীর চিতা একেবারে নিভে গেল না। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ সতী-নিষিদ্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গে গোটা ব্রিটিশ ভারতে তা নিষিদ্ধ হলেও, দেশীয় অনেক রাজ্যেই তা চালু রইল। তুলনামূলকভাবে অনেক কম হলেও এদের সংখ্যাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়ঃ

'In other words, out of about 77 millions of souls, this prohibition reached directly only 37 millions who were British subjects , indirectly, perhaps about 19 millions more,··· while there remained not less than 21 millions, the subjects of states which, though our allies, could in no degree be reached by the legislation of 1829'.[১৭]

আর তাই কাশ্মীর, ভূপাল, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে মাঝেমাঝেই সতীর চিতা জ্বলে উঠতে দেখা যেত। ৩০ ৮. ১৮৩৮-এ উদয়পুরের রাজা মহারাজা যুআন সিং মারা গেলে তার সঙ্গে দুই রানী ও ছ'জন রক্ষিতা সহমৃতা হয়। ১৮৩৯-এ 'পঞ্জাব-কেশরী' রঞ্জিত সিংহ মারা গেলে সতী হওয়া নিয়ে তাঁর রানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। শেষপর্যন্ত চারজন রানী ও সাতজন রক্ষিতা তাঁর সহগমন করে। ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার লোকের মধ্য দিয়ে শবযাত্রা এগিয়ে চলে—শবাধারের পেছনে নগ্নপদে তাঁর চার রানী—সম্পূর্ণ নিরাভরণ, পরনে তাদের সাদা সিল্কের শাড়ি—জীবনে এই প্রথম হারেম থেকে বেরিয়ে আলোর মুখ দেখল তারা। রানীদের পেছন পেছন শঙ্কাহীন চিত্তে এগিয়ে চলেছে রক্ষিতা সাতজন - এদের কেউ কেউ ১৪/১৫ বছরের কিশোরীমাত্র। ছ'ফুট উঁচু জাহাজাকৃতি চন্দন কাঠের চিতায় মহারাজের দেহ স্থাপন করার পর একে একে চার রানী মাথার কাছে আর রক্ষিতা সাতজন পায়ের কাছে আসন গ্রহণ করল। যুবরাজ খড়্গ সিং চিতার চারকোণে অগ্নিসংযোগ করার

সঙ্গে-সঙ্গে তা জ্বলে উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবকটি প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেল। বিষয়টিকে ঈষৎ পরবর্তীকালে (১৮৪০) জনৈক অজ্ঞাতনামা শিল্পী ধরে রাখতে চেষ্টা করেন। অজ্ঞাতনামা এই শিল্পীর আঁকা ছবিটি ত্রুটিমুক্ত না হলেও ঘটনাটি সমকালে কতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তারই সাক্ষ্যবহ।[১৮]

আসলে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে ইংরেজ অনাগ্রহী হওয়ায় এইসব রাজ্যে সতী অব্যাহত থাকে। তবে কোথাও কোথাও ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। যে কারণে রাজপুতনায় সতী-নিবারণের ব্যাপারে মেজর লাডলোর নাম জড়িয়ে আছে। তাঁর প্রভাবে ২৩ আগস্ট, ১৮৪৬-এ জয়পুরে সতী নিষিদ্ধ হলে স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে ধন্যবাদ জানান। জয়পুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই বছরে ১৮টির মধ্যে ১১টি রাজপুত রাজ্যে ও ভারতের ১৬টির মধ্যে ৫টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে সতী নিষিদ্ধ হয়।

১৮৫৫-র মে মাসের মধ্যে জয়পুর ছাড়াও কোটা, ঝালওয়ার, বান্দা, জয়সলমীর, বানসারা, প্রতাপগড়, ডঙ্গরপুর, কেরৌলি, শিরোহী, ঢোলপুর, যোধপুর, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, রেওয়া, গোয়ালিয়র, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে সতী নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য এর পরেও রাজপুতনার মেবার, আলোয়ার, বিকানীর, কিশেনগড় ও ভরতপুরে এবং রাজপুতনার বাইরে বরোদা, কাথিওয়ার. ভূপাল, কুচ, ধার, স্বাওস্তয়ারি প্রভৃতি অঞ্চলে তা অব্যাহত থাকে।[১৯] ১৮৫৬-র মধ্যে ভারতের দেশীয় বা মুসলিম রাজ্যগুলিতেও সতীপ্রথা একরকম লোপ পায়। ১৮৬২-তে রাজস্থানেও সতীযুগের অবসান ঘটে। অবশ্য এরপরেও এসব অঞ্চলে কখনো-সখনো সতীর চিতা যে জ্বলে উঠত না তা নয়। ভারতের বাইরে নেপালে গোটা উনিশ শতক ধরে, এমনকি বিশ শতকের প্রথমদিকেও বেশ কিছুদিন সতীর চিতা জ্বলল। বালি, জাভা, লম্বকেও মেয়েরা অবাধে সতী হতে লাগল।

এমনকি আইন করে নিষিদ্ধ করার পরও ব্রিটিশ ভারতে সতীর চিতা মাঝেমাঝে জ্বলে উঠত। কলকাতা বা কানপুর, পাটনা বা এলাহাবাদ—হঠাৎ কোনো জায়গা থেকে খবর এসে পৌঁছত মেয়েদের সতী হবার। অসতীরাও সতী হবার চেষ্টা করত। ১৮৪৯-এ একটি কায়স্থ রমণী তার 'প্রেমাস্পদ নায়কের' সঙ্গে সহমরণের সঙ্কল্প করলেও পুলিশের 'প্রতিবন্ধকতায় ঐ প্রণয়িনীর স্বীয় প্রিয় দেহসহ স্বদেহ সমর্পণ হয় নাই।'[২০] এইসব খবর কানে এলে বয়োবৃদ্ধরা স্মৃতিচারণায় ডুব দিতেন, মনে আসত, হ্যাঁ সত্যিই তো একদিন আমাদের এই দেশে এইরকম একটা প্রথা ছিল।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। যুগ পালটেছে, পালটেছে সমাজ। উনিশ শতকী ধ্যান-ধারণা মূল্যবোধ অনেকখানিই আজ বিপর্যস্ত। বিংশ শতাব্দীতে-সতীপ্রথা যখন ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত—তখনও ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে মাঝেমাঝে সতীর চিতা জ্বলে উঠেছে। ১৯১৩-তে কলকাতায় দু'তিনটি সহমরণের ঘটনা ঘটে। ১৯৩০-এ একজন মহিলা সতী হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে তাকে ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[২১] ১৯৭৫-এর অক্টোবর মাসে জয়পুর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের শিকার জেলার মুণ্ডাকালা গ্রামে জনৈক বৃদ্ধা স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করে সতী হয়।[২২] এই বছরের নভেম্বর মাসে ছত্তবপুর জেলার খয়াদি গ্রামে একজন ৪৬ বছরের মহিলা স্বেচ্ছায় সতী হয়। ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৮-এ সরস্বতী নামে ৫৫ বছরের এক মহিলা শিকার জেলায় সতী হয়।

১৯৮০-তে বেশ কয়েকটি সতী ঘটনা ঘটে। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০-তে রাজস্থানের নাগপুর জেলার নিমডি-কোটিহারি গ্রামে ৭ সন্তানের জননী ৬২ বছরের সোনা কানোয়ার কয়েকহাজার লোকের সামনে তার স্বামী সুগন সিং-এর মৃতদেহ কোলে নিয়ে সতী হয়। আগুন জ্বালানো হলে সমবেত হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে 'সতী মাতা কি জয়।' সোনা কানোয়ারকে সতী হতে প্ররোচিত করার জন্য ৭ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়।[২৩] ১৯৮০-র আগস্ট মাসে মথুরা জেলার পালসন গ্রামে হরদেবী নামে এক মহিলা সতী হয়। তার স্বামী রাধেশ্যাম ক্যান্সার রোগে ১৬ আগস্ট মারা গেলে হরদেবী সতী হবার সঙ্কল্প করে। তার সঙ্কল্পের কথা শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে নিবৃত্ত করে। এর ৩ দিন পরে ১৯ আগস্ট বাড়ি থেকে পালিয়ে হরদেবী স্বামীর দাহস্থানে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরে। ঘটনাটি আশপাশের এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, ঘটনার পর থেকে গ্রামটির নামই হয়ে যায় পালসন-সতী। ৩০ আগস্টের মধ্যে লাখ দুয়েক লোক ঐ গ্রামে আসে। জনসাধারণ হরদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে এখানে একটি ক্যান্সার ইন্সটিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়।[২৪] এর কয়েকদিন পরেই ২৯ আগস্ট রায়পুরের কাছে খেদা গ্রামে শ্রীমতী কাছেরিবাই বৈরাগী নামে ৫০ বছরের এক মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে সতী হয়।[২৫] কাছেরিবাই-এর আত্মীয়রা সতী হওয়া থেকে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য সবরকম চেষ্টা করে—এমনকি তাকে ঘরে তালাবদ্ধও করে রাখে। কিন্তু এক ফাঁকে সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে সে চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। ঘটনাস্থলে

শ'তিনেক লোক উপস্থিত ছিল। ঠিক এর পরের দিন রাজস্থানের শিকার জেলায় ওম কানোয়ার নামে ২০ বছরের একটি তরুণী তার স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়। এর বেশ কিছুদিন পরে ২৪.১২.১৯৮১-তে উত্তরপ্রদেশের বড়সাগব এলাকার বিসানমাউ গ্রামে ২৫ বছরের একটি যুবতী স্বামীর সহগমন করে।

এছাড়া পুলিশি তৎপরতায় সাম্প্রতিককালে বেশ কটি মেয়ে সতী হতে গিয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ১৯৭৭-এর অক্টোবর মাসে একজন বৃদ্ধাকে সতী হওয়া থেকে পুলিশ নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্র থেকে ঘটনাটি উদ্ধাব করছি :

'জয়পুর, ১৬ অক্টোবর—পুলিশ সিকর জেলাব রঘুনাথপুর গ্রামের ৬০ বছরের বৃদ্ধা বাদামীকে সতী হবার সুযোগ দিল না। গত শুক্রবাব তার স্বামী ঝুনটা মারা যায়। তারপরই বাদামী সহমরণ বরণ করার বায়না ধরে। ইতিমধ্যে পুলিশ খবর পেযে যায়। অতিরিক্ত কালেক্টব পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই ওই গ্রামে ছুটে যান। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে তাঁরা বাদামীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন।' আনন্দবাজাব পত্রিকা, ১৭.১০ ১৯৭৭।

এরচেয়েও নাটকীয়ভাবে পুলিশ ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৮-এ উত্তরপ্রদেশের মনিপুরী জেলার মুরানা গ্রামের একটি মেয়েকে উদ্ধার করে। মেয়েটি সতী হবার জন্য প্রস্তুত—স্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে বসেছে, চিতায় আগুনও দেওয়া হয়েছে—এমনসময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির, এসেই মেয়েটিকে তারা চিতা থেকে টেনে নামায়। সমবেত কিছু দর্শক পুলিশের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদেব পাথর ছুঁড়ে মারে।[২৬] এর মাসখানেক পরে ২৪.৫.'৭৮-এ জয়পুর জেলায় যশোদা দেবীকে পুলিশ সময়মতো উপস্থিত হয়ে সতী হওয়া থেকে বিরত করে। ১৯৮০-র আগস্টে সময়মতো খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ একটি মেয়েকে নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্রে ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা এইরকম : ছত্তরপুর জেলার ঝামটুটি গ্রামে ১৮ বছরের একটি মেয়ে তার স্বামীর নৌকা দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক ঐ গ্রামে সমবেত হয়, কিন্তু পুলিশের কাছে খবর পৌছলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েটিকে নিবৃত্ত করে।[২৭] এই বছরের অক্টোবর মাসে রেওয়া থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী উমারিয়া গ্রামে ৭২ বছরের এক বৃদ্ধা পুলিশি তৎপরতায় সতী হতে পারে নি। এর কিছুদিন পরে ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮০-তে মধ্যপ্রদেশের রায়গড় জেলার বিলাসপুর গ্রামের ৭০ বছরের বৃদ্ধা

মায়াবতী তার স্বামী তিলকরামের মৃত্যুতে সতী হতে উদ্যত হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মহিলাটিকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হাজতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে।

অর্থাৎ কম হলেও সতীঘটনা এখনও মাঝেমাঝে ঘটে। মনের কোন গহন গোপন বাসনা তাদের আগুনে ঝাঁপ দিতে ডাকে—প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির জন্য? কিংবা 'মানসিক বিকার ও উত্তেজনার প্রভাবে'? নাকি নিছক আত্মহননের বাসনায় শহীদ হবার লোভে? তবে এইসব ঘটনাগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। এগুলি আত্মহননের ঘটনা ছাড়া কিছু নয়।

দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও এ-প্রথা আজ আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিস্মৃত একটি অধ্যায়। তবু আমরা এ-প্রথার ইতিহাস রচনা করলাম, কারণ একদিন এই বীভৎস প্রথা আমাদের দেশে বর্তমান ছিল—আদর্শের জন্যই হোক আর অন্ধ সংস্কারের জন্যই হোক একদিন এদেশের মেয়েরা সতী হত এবং সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে এ দেশেরই একদল মানুষ তা দেখে বেদনা অনুভব করে এ-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমেছিলেন—তাঁদের পাশে ছিলেন একদল হৃদয়বান বিদেশি মানুষ। মানুষের মর্যাদারক্ষার এই লড়ায়ে তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন—তাঁদের সেই সংগ্রামের ইতিহাস তাই একঅর্থে এদেশের মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস। এবং সেখানেই এর ইতিহাস জানার সার্থকতা।

পরিশিষ্ট

সতীর ছবি

সহমরণের ছবি সহজলভ্য নয়, কিন্তু বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সহমরণের কয়েকটি ছবির সন্ধান আমরা পেয়েছি।

বেলজিয়ান-শিল্পী বল্ট সলভিনস্ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৭৯১-এ। তাঁর '*A Collection of Two Hundred and Fifty Coloured Etchings Descriptive of the Manners, Customs, Character, Dress and Religious Ceremonies of the Hindoos*' (1799) বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সহমরণের চারটি ছবি আছে। এই চারটিই সহমরণের সবচেয়ে প্রচলিত ছবি। ছবি চারটির মধ্যে ১টি সহসমাধির ও ১টি অনুমরণের ছবিও আছে।

চিত্রশিল্পী উইলিয়ম হজেস এদেশে আসার বছরখানেক পরে ১৭৮১-তে বেনারসে ২৪/২৫ বছরের একটি পরমাসুন্দরী বৈশ্য মেয়েকে সতী হতে দেখেন। প্রত্যক্ষদর্শী হজেস দৃশ্যটিকে ছবির মধ্যে রূপ দেন। দ্র. *Early Travels in India during* 1780-83 এটি ছাড়াও তাঁর '*Select Views in India*' বইতে তিনি অগ্রদ্বীপের একটি সতীমন্দিরের ছবিও এঁকেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যেসব বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন তাঁদের অন্যতম পিটার ম্যাণ্ডি। ১৬৩০-এ সুরাটে তাপ্তী নদীর তীরে ফুলপাড়ায় তিনি একটি মেয়েকে চোখের সামনে অম্লানমুখে সতী হতে দেখেছিলেন। দৃশ্যটিকে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে তিনি ছবিতে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। দ্র. *The Travels of Peter Mundy* (*vol* 2).

সপ্তদশ শতাব্দীরই আর এক বিদেশি পর্যটক টমাস বাউরি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সহমরণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সহমরণের একটি লাইন স্কেচও তার বইতে স্থান পেয়েছে। দ্র. *A geographical account of the Countries round the Bay of Bengal.*

সতীপ্রথার বিরুদ্ধে যেসব মিশনরি কলম ধরেন, তাঁদের অন্যতম জন পেগস। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ১৮২৪-এ তিনি '*The Suttees' Cry to Britain*' নামে

একটি বই লেখেন। এই বইতে সতীর দুটি ছবি আছে। দুটি ছবির মধ্যে প্রথমটিতে বলপ্রয়োগে একটি মেয়েকে সতী হতে বাধ্য করা হচ্ছে দেখানো হয়েছে। অন্য ছবিটি সহসমাধির—পেগস এটি সলভিনসের বই থেকে গ্রহণ করেছেন—অবশ্য ঋণস্বীকার না করে। সতীপ্রথার বীভৎসতার নিদর্শন হিসাবে প্রথম ছবিটি বহু জায়গায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

বিখ্যাত পর্যটক নিকোলাই মানুচির *Storio Do Mogor* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে সহমরণের একটি ছবি পাই। ছবিটি মনে হয়, কোনো মুসলমান শিল্পীর আঁকা।

চার্লস কোলম্যানের *The Mythology of the Hindus* বইতে প্রত্যক্ষদর্শীর আঁকা সহমরণের একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছবি আছে। ডিসেম্বর ১৮২৯-এ চাকদহে অনুষ্ঠিত একটি সতী ঘটনার ছবি এটি। মেয়েটিকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা হয়। প্রত্যেকবারই দৃঢ়তার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দেয় 'দেবতা আমায় ডাকছেন, পুড়ে আমাকে মরতেই হবে।'

মেজর জেনারেল গ্রিণ্ডলে সহমরণের একটি ছবি আঁকেন। ১৮১৫-তে স্বপ্নে স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করে বরোদায় জনৈক ব্রাহ্মণী স্বামীর অনুরূপ একটি চালের মূর্তি নির্মাণ করে সেটির সঙ্গে পুড়ে মরে। ঘটনাটির তিনদিন পরে মেয়েটির স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছয়। বহুবর্ণে আঁকা সহমরণের শোভাযাত্রার এই ছবিটি গ্রিণ্ডলের '*Scenery Costumes and Architecture chiefly on the Western Side of India*' বইতে স্থান পেয়েছে। মূল ছবিটি সাউথ কেনসিংটনের ভিক্টোরিয়া এ্যণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।

পূর্বোক্ত মিউজিয়ামেই ভারতীয় চিত্রকরদের আঁকা সহমরণের তিনটি ছবি আছে। প্রথমটি তাঞ্জোরের জনৈক শিল্পীর আঁকা (আনু. ১৮০০)। অন্য ছবি দুটি মুর্শিদাবাদের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর আঁকা (*Mica painting*)। অঙ্কনকাল ১৮০০—১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। মুর্শিদাবাদ চিত্রের প্রথমটি ডাবলিউ. জি. আর্চারের *Paintings of the British* বইতে মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটির অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ হওয়ার জন্য মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ আমাদের তার প্রতিলিপি সংগ্রহ করার অনুমতি দেন নি।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সতীর দুটি ছবি আছে। প্রথমটি তাঞ্জোরের জনৈক শিল্পীর কোম্পানি স্টাইলে আঁকা (আনু. ১৮০০)। দ্বিতীয়টি অজ্ঞাতনামা জনৈক ব্রিটিশ চিত্রকরের আঁকা (আনু. ১৮০০)। কষ্টকল্পিত এই

ছবিটির সঙ্গে পেগসের বইতে ব্যবহৃত প্রথম সতীচিত্রটির কিছুটা মিল চোখে পড়ে।

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'পাঞ্জাব কেশরী' রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে তাঁর রানী ও রক্ষিতাদের সহমরণের একটি ছবি আছে। ১৮৪০-এ আঁকা এই ছবিটি উঁচুদরের শিল্পকর্ম না হলেও এটির মূল্য অনস্বীকার্য।

কলকাতাব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সতীব একটি ছবি আছে। ছবিটি *Muller's Geography* গ্রন্থে মুদ্রিত একটি সহমবণের দৃশ্যেব। ওই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সতীর ছবিটিই ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়ালে সংবক্ষিত।

পরবর্তীকালের শিল্পীদেব মধ্যে কেউ কেউ সতীর ছবি এঁকেছেন। এদের মধ্যে কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়েব আঁকা সহমরণের ছবিটি উল্লেখযোগ্য। এটি কুমুদনাথ মল্লিকেব 'সতীদাহ' বইতে মুদ্রিত হয়েছে।

নির্দেশিকা

১। সতী—যুগে যুগে

১ *The Asiatic Journal and Monthly Register*, March, 1818, p. 290.

২ *Testimonies of the Ancients regarding the Suttee Custom*, The Asiatic Journal, May, 1827, pp. 621-2.

৩ ঐ, পৃ. ৬২৪।

৪ *Sati in Bengal Epigraphy*, S. Chakravarty, Journal of the Varendra Research Museum, vol 2, 1973, p. 42.

৫ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ). শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল (শান্তিনিকেতন, ১৯৬৮), পৃ. ১৩৫।

৬ *Early Hindu Civilisation*, R. C. Dutt (Calcutta, 1908) P. 74. অনুরূপ মত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর '*The Civilisation of India*' গ্রন্থেও ব্যক্ত করেছেন, পৃ. ৮।

৭ *The Position of Women in Hindu Civilisation*, Dr. A. S. Altaker (Benares, 1938), p. 144.

৮ *Reform &, Regeneration in Bengal (1774-1823)*, Dr. Amitava Mukherji, p. 238.

৯ *Hobson-Jobson*, H. Yule & A. C. Burnell, Ed. by W. Crooke (London, 1903), p. 879.

১০ *Widow Burning*, The Ocean of Story, Ed. N. M. Penzar (London, 1925), vol. iv, Appendix 1, pp: 264-6.

১১ *The Travels of Ibn Batuta*, Translated by S. Lee p. 109, F. N.

১২ *The Travels of Marco Polo*, Ed. Thomas Wright (London, 1854), Book III, p. 387.

১৩ *IBN BATUTA*, *Travels in Asia and Africa (1325-54)*, Translated by H. A. R. Gibb (London, 1929), pp. 192-3.

১৪ *India in the 15th Century*, Ed. R. M. Major, II, p. 6.

১৫ *The Book of Duarte Barbosa*, Translated by M. L. Dames (London, 1918), vol. 1, pp. 213-6.

১৬ ঐ, পৃ. ২১৯-২০।

১৭ *Travels in India*, J. B. Tavernier, Translated & Ed. by V. Ball (London, 1889), vol. II, p. 214.

১৮ *Ibid*, vol. 1, pp. 222-3.

১৯ ঐ, পৃ. ২১৯।

২০ *Travels in the Mogul India (1656-68)*, F. Bernier, Ed. A. Constable (Westminster, 1891), pp. 307-8.

২১ *Storio Do Mogor (1653-1708)*, N. Manucci, Translated & Ed. by William Irvine (London, 1907), vol. II, p. 97.

২২ ঐ, পৃ. ৯৬।

২৩ বার্নিয়েরের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩১১-২।

২৪ *Storio Do Mogor*, Introduction, William Irvine, p. lxxii.

২৫ *A New Account of the East Indies*, Alexander Hamilton, Ed. Sir W Foster, vol 1, pp. 157-8.

২৬ *Interesting Historical Events*, J Z. Holwell (London, 1767), Part II, p 88

২৭ *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, James Tod (Cal, 1894), vol 1, p 499.

২৮ *Widow Burning*, The Ocean of Story, Ed. N. M. Penzer, vol. iv, Appendix 1, p. 257.

২৯ *A History of Sexual Customs*, R. Lewinson (New York, 1956), p 134.

৩০ ঐ, পৃ ৩৩।

৩১ ফ্রেঞ্চ মিশনরি দুবাসের মতে 'It was principally in the noble caste of Rajahs that the Suttee originated'. দ্র. *Hindu Manners Customs and Ceremonies*, ABBE J. A. Dubois (Oxford, 1897), vol. II, p. 361. এল. ডি. বারনেটের মতে 'Although the antiquity of Sati cannot be denied, and is probably a relic of pre-historic barbarism preserved in aristocratic kshatriya families.' দ্র. *Antiquities of India*, L. D. Barnett, p. 119. মিঃ পেনজারের উক্তিও প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'It has been suggested that it is perhaps the extension of a royal custom, mentioned in the Epics, which gradually made the rule general, until later law and practice recommended sati for all'. দ্র. মিঃ পেনজারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পৃ. ২৬২।

৩২ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1830, vol 28, pp 12-4.

৩৩ *Ibid,* 1825, vol. 24, p. 162

৩৪ *Ibid,* 1821, vol. 18, p. 116 & *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos,* W. Ward (Serampore, 1811), vol. II, pp. 547-50.

৩৫ *The Asiatic Journal,* December, 1824, pp 623-4.

৩৬ সমাচার দর্পণ, ১২. ২ ১৮২০।

২। সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত

১ '*A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos,* W. Ward (Serampore, 1815), vol. II, pp. 305-6.

২ *Ayeen-I-Akbarry,* Translated by Francis Gladwin (London, 1800), vol. II, p. 448.

৩ *Counter Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta,* The Asiatic Journal, July, 1819, p. 16.

৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1821, vol 18, p. 205.

৫ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No 62,* 3 12.1824.

৬ *Memoir of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India,* Clauds Buchanan (2nd Ed, London, 1812), p. 128.

৭ *The Book of Duarte Barbosa,* Translated by M. L. Dames (London, 1918), vol. I, p. 216.

৮ *A Royal Sati,* The Asiatic Journal, March, 1818, pp 221-2.

৯ *Ranjit Singh,* Sir Lepel Griffin (Oxford, 1898), p. 65. অনেকের মতে গ্রিফিনের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত।

১০ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, p. 72.

১১ *Ibid,* 1830, vol. 28, p. 98.

১২ *Ibid,* 1823, vol. 17, p. 49.

১৩ *Suttees at Nepal* (reprinted from John Bull), The Asiatic Journal, July, 1825, p. 88.

১৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1823, vol. 17, p 49.
১৫ *Ibid*, 1825, vol 24, p. 82.
১৬ *Reports of Cases determined in the Court of Nizamut Adawlut*, (Calcutta, 1827), vol. II, pp. 246-8.
১৭ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1826-7, vol. 20, p. 111.
১৮ *A Young Bride burnt with her betrothed Husband*, The Friend of India, February, 1819, pp. 95-6.
১৯ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1824, vol. 23, p. 25.
২০ *Ibid*, 1830, vol. 28, p. 190.
২১ *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* (Selection from the Journal of Francis Buchanan Hamilton), Ed. M. Martin (London, 1838), vol. 1, p. 497.
২২ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 7*, 4.12.1829.

৩। সতীর জাতি ও বিত্ত

১ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1826-7, vol. 20, p. 109.
২ *The Wealth of India*, P. A. Wadia, G. N. Joshi (London, 1925), p. 55. F. N.
৩ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 67*, 3.12.1824.
৪ বুকানন হামিলটন শাহাবাদ জেলার বিভিন্ন অংশের পরিবারগুলির মাসিক ব্যয়ের যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে ৪৪২টি পরিবারকে পাই যাদের মাসিক ব্যয় ৩০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে। পক্ষান্তরে ২১৭০৮৩টি পরিবারকে পাই যাদের মাসিক ব্যয় ১॥০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। দ্র. মণ্টগোমারি মার্টিন সম্পাদিত বুকানন হামিলটনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ ৪৫।
৫ *Suttees*, The Asiatic Journal, December, 1825, p. 653.
৬ *Census of Bengal*, vol. 1, 1881, J. A. Bourdillon, p. 140.

৭ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1830, vol. 28, p 79.
৮ *Ibid*, p. 243.

৪। 'সতী' তুমি – 'মাতা' নহ ?

১. *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, J. C. Marshman (London, 1859), vol. 2, pp. 357-8.
২ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1821, vol. 18, pp 35-6.
৩ *Ibid*, p. 36.
৪ *Ibid*, pp. 36-7.
৫ *Ibid*. 1825, vol. 24, p. 71.
৬ *Ibid*, p. 83.
৭ *Debate at the East India House*, The Asiatic Journal, May, 1827, p. 689.
৮ *The Infant Mourner* (reprinted from the Bengal Hurkaru), The Calcutta Monthly Journal, August, 1823, p. 155.
৯ *Letter to Right Honorable J. C. Villers*··· W. Ward, pp. 21-2.
১০ *Immolation of Hindoo Widows* (reprinted from the Quarterly Review), John Bull, 31.5.1828

৫। সতী—তোমার বয়স কত ?

১ *Christian Researches in Asia*, Claudius Buchanan, (5th Ed. London, 1812), pp. 41-2.
২ *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*, W. Ward (Serampore, 1811), vol. 2, pp. 558-9.
৩ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11*, 19.3.1819.
.৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1826-7, vol. 20, p. 17.

৫ *Ibid*, 1821, vol. 18, p. 222. এই তালিকাটি নির্ভুল নয়। কারণ এতে ৮৪৯ জনের বয়সের হিসাব পাচ্ছি, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই বছর সতী হয়েছিল ৮৩৯ জন।

৬ *Ibid*, 1830, vol. 28, p. 123.

৭ *Ibid*, 1821, vol. 18, p. 231.

৮ *Indian Women through the Ages*, Paul Thomas, (New York, 1964), p. 278.

৯ সতীদাহ, কুমুদনাথ মল্লিক (১৩২০), ভূমিকা।

১০ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 9*, 4.12.1829.

১১ *Ibid.*

১২ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1830, vol. 28, p. 269.

১৩ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 67*, 3 12.1824.

১৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1823, vol. 17, pp. 208-13.

১৫ *Census of Bengal*, vol 1, 1881, I. A. Bourdillon, p. 104.

১৬ *The Calcutta Morning Post*, 11 1 1811.

৬। হাঁ, জোর করে সতী করা হত

১ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1823, vol. 17, pp. 67-8.

২ ঐ, পৃ. ৬৬-৭।

৩ *The Suttees' Cry to Britain*, J. Peggs (2nd Ed. London, 1828), pp. 33-4.

৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1821, vol. 18, p. 227.

৫ *Parliamentary Debates*, 1821, vol. 5, pp. 1220-1.

৬ *The Oriental Herald*, July, 1825, p. 167.

৭ *The Calcutta Monthly Journal*, June, 1828, p. 49.

৮ *A View of the History etc*···, W. Ward, vol. II, p. 312.

৯ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, pp. 164-181.

১০ *John Bull*, 4.11.1823.

১১ ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩০৫।
১২ *Suttee*, John Bull, 10.11.1823, *Suttee*, The Friend of India, December, 1823, p. 382. *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, p 91. পার্লামেণ্টারি পেপারস্-এ বামুনটি রমলাকান্ত চাটুজ্যে নামে উল্লিখিত।
১৩ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1830, vol. 28, p. 45
১৪ ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩০৫।
১৫ *India's Cries to British Humanity*, J. Peggs, (2nd Ed, London, 1830), p. 8.
১৬ ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩০৪।
১৭ *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society*, vol. 3, pp. 404-5.
১৮ *Reports of Cases*…(Cal, 1827), pp. 342-3.
১৯ *Burning of a Hindoo Widow*, The Asiatic Annual Register, 1809, p 455.

৭। না, জোর করে সবাইকে সতী করা হত না

১ *Interesting Historical Events*, J Z. Holwell (London, 1767), Part II, p 97.
২ ঐ, পৃ. ৯৩-৭।
৩ *Testimonies of the Ancients Regarding the Suttee Custom*, The Asiatic Journal, May, 1827, p. 624.
৪ *The Travels of Ibn Batuta*, Translated by Samuel Lee (London, 1829), p. 110.
৫ *Sketches Chiefly Relating to the History, Religion, Learning and Manners of the Hindoos*, Q. Craufurd, (2nd Ed. London, 1792), vol. II, p. 16.
৬ *India's Cries to British Humanity*, J. Peggs, (2nd Ed. London, 1830), pp. 2-5.
৭ *Suttees*, The Asiatic Journal, October 1827, p. 409.
৮ *Female Immolation*, The Friend of India, September, 1821, pp. 289-90.

৯ *The Burning of Two Widows on one Pile*, The Friend of India, July, 1820, pp. 204-8.

১০ *John Bull*, 12.6.1826.

১১ A *Suttee Consumed*, Missionary Intelligence, October, 1828, pp. 158-9

১২ *John Bull*, 15.10.1825.

১৩ রিচার্ডসনের মূল কবিতাটি নিম্নরূপ :

THE SUTTEE

Her last fond wishes breathed—a farewell smile
Is lingering on the calm unclouded brow
Of you deluded victim,—Firmly now
She mounts, with dauntless mien, the funeral pile
Where lies her earthly Lord—The Brahmin's guile
Hath wrought its will—fraternal hands bestow
The flaming brand—the cracking embers glow
And flakes of hideous smoke the skies defile ?
The ruthless throng their willing aid supply
And Pour the Kindling'oil—the stunning sound
Of dissonant drums—The Priests exulting cry—
The falling Martyr's pleading voice have drowned
While fiercely—burning rafters fall around
And shroud her form from Horror's straining eye !

—*The Bengal Hurkaru and Chronicle*, 16.11.1829.

১৪ *Bengal under the Lieutenant Governors*, C. E. Buckland (vol 1, 1901), pp. 160-1.

১৫ *Suttee Escaped*, The Oriental Observer, 14 12 1828, p. 767.

১৬ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, p. 92.

১৭ *Ibid*, 1824, vol. 23, p. 19

১৮ *Ibid*, p. 44.

১৯ *Ibid*, p. 19.

২০ *Ibid*, 1826-7, vol. 20, p. 113.

২১ *Ibid*, 1821, vol. 18, p. 229.

২২ *Ibid*, 1824, vol. 23, p. 30.

২৩ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 26*, 30 7.1819.

২৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, p. 69.

২৫ *Ibid*, p. 83.

২৬ *Ibid*, 1821, vol. 18, p. 164.

২৭ *Escape from a Suttee*, The Bengal Chronicle, 22.3.1828, pp. 196-7.

২৮ *The Bengal Chronicle*, 22.3.1828, P. 198

২৯ *The Calcutta Monthly Journal*, May, 1828, pp. 31-2.

৩০ *The Life of the Rev. John Thomas*, The Rev. C. B. Lewis (Calcutta, 1873), p. 14.

৩১ *The Christian Missionaries in Bengal (1793-1833)*, Dr. K. P. Sengupta (Calcutta, 1971), p. 23. F. N.

৩২ *John Bull* (reprinted from the Samachar Chandrika), 11.10.1826.

৩৩ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 2.* 4 12.1829.

৩৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1823, vol. 17, p 64.

৩৫ *Ibid*, 1826-7, vol. 20, p. 126.

৩৬ *Ibid*, 1830, vol. 28, p. 98.

৩৭ *A View of the History*....William Ward, vol. II. p. 310.

৩৮ *The Quarterly Review*, September, 1851, p. 262.

৮ । কেন মেয়েরা সতী হত

১ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, p. 110.

২ *The Asiatic Journal*, February, 1816, p. 145.

৩ *Rambles and Recollections of an Indian Official*, W. H. Sleeman, Ed. Vincent A. Smith (1915), pp. 19-23.

৪ *On the Burning of Widows*, The Friend of India, July, 1819, p. 319.

৫ ১৮৭২-তে জেনারেল হার্ভে এ ধরনের ৩৭টি হাতের ছাপ দেখতে পান,

আরও অনেকগুলি তখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। Harvey Quoted in Thompson's *Suttee* (London, 1928), p. 30.

৬ *Ayeen I Akbery*, Translated by Francis Gladwin (London, 1800), vol. II. p. 529.

৭ পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৬৮।

৮ *Suttee* (reprinted from Teemernasuk), The Asiatic Journal, February, 1828, pp. 264-5.

৯ *Ranjit Singh*, Sir Lepel Griffin, p. 66.

১০ *Indian Women through the Ages*, P. Thomas, p. 235.

১১ *Travels in India*, J. B. Tavernier, Translated & Ed. by V Ball, vol. II, p. 209.

১২ *The English Works of Rajah Rammohun Roy*, (Panini office, 1906), p. 379.

১৩ *Female Immolations*, The Friend of India, March, 1822, p. 93.

১৪ *History of India*, M. ElPhinstone (7th Ed. London, 1889), p. 208.

১৫ *Parliamentary* Papers (House of Commons), 1826-7, vol. 20, p. 102

১৬ *Immolation of two Widows* (reprinted from Samachar Durpan), The Asiatic Journal, September, 1825, p. 353.

১৭ *The Burning of Widows*, The Friend of India, July, 1819.

১৮ *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India*, Reginald Heber (London, 1861), vol. 1. p. 48.

১৯ স্লীম্যানের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ২৩।

২০ *The Life of the Rev. John Thomas*, C. B. Lewis, p. 145. F. N.

২১ *A Geographical accounts of Countries round the Bay of Bengal*, Thomas Bowrey (1905), p. 204.

২২ *Interesting Historical Events*, J. Z. Holwell, vol. II, p. 89.

২৩ *Parliamentary Debates*, 1825, vol. 13, p. 1045.

২৪ *Burning of Indian Widows*, John Bull, 5.6.1828.

২৫ *The Quarterly Oriental Magazine*, March, 1824, p. 116.

২৬ *India's Cries to British Humanity*, J. Peggs, pp. 2-3, F. N.

২৭ হেবারের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৭২-৩।

২৮ *Hindu Manners, Customs and Ceremonies*, ABBE J. A.

Dubois, Translated & Ed. by H. K. Beauchamp, vol. II, p. 362.

২৯ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1826-7, vol. 20, pp. 138-9.

৯। সতীবিরোধী আন্দোলন—যুগে-যুগে

১ *Suttees*, The Asiatic Journal, March, 1826, p. 347.

২ *The Position of Women in Hindu Civilisation*, Dr. A. S. Altaker, p. 145.

৩ কাদম্বরী, তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত (কলকাতা, ১৩৬৭), পৃ. ৮২-৩।

৪ ডঃ আলটেকারের পূর্বোক্ত বই, পৃ ১৪৫।

৫ সতীদাহ, কুমুদনাথ মল্লিক, পৃ. ৩০।

৬ শাহনশাহ আকবর, ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী, পৃ. ১০৩।

৭ *Early Travels in India* (1583-1619), William Foster, (New Ed. 1968), p. 119.

৮ *Parliamentary Papers* (House of Commons). 1828, vol. 23, p. 7.

৯ ১৭শ শতাব্দীর পর্যটক পিটার ম্যাণ্ডি লিখেছেন, মোগলরা এ দেশ জয় করার পর এ প্রথার একরকম অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। রাজা বা নিকটবর্তী শাসনকর্তার বৈধ লাইসেন্স ছাড়া এখন কেউ সতী হতে পারে না। দ্র. *The Travels of Peter Mundy* (London, 1914), vol. II. p. 35.

১০ *Early Travels in India*, W. Foster, pp. 219-220.

১১ কলিকাতা সেকালের ও একালের, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৯১৫), পৃ. ৩০৯-১০।

১২ *The Petition for the Burning of Hindoo Widows*, Alexander's East India Magazine, vol. IX, No. 22. p. 243.

১৩ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1821, vol. 18, p. 22.

১৪ *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, J. C. Marshman (London, 1859), vol. II, p. 404.

১৫ *The Annals of the College of Fort William*, Thomas Roebuck, p. 50.

১৬ *The Calcutta Monthly Journal*, August, 1803, pp. 246-7.

১৭ *Periodical Accounts of the B M.S.* vol. II, p. 241.

১৮ *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*, W. Ward (Serampore, 1815), vol. II, p. 312.

১৯ *Ibid*, p. 312.

২০ মার্শম্যানের পূর্বোক্ত বই, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২

২১ *Memoir of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India*, C. Buchanan (2nd Ed. 1812), p. 127.

২২ *Christian Researches in Asia*, C. Buchanan (5th Ed. London, 1812), p. 40.

২৩ *Reform & Regeneration in Bengal (1774-1823)*, Dr. A. Mukherji, pp 245-6.

২৪ মার্শম্যানের পূর্বোক্ত বই, ১ম খণ্ড, পৃ ২২২। রক্ষণশীল হিন্দুরা গবর্নর জেনারেলের কাছে যে সতীদাহ আবেদন পেশ করেন তাতে বলা হয় 'লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে কোন ২ খ্রীষ্টিয়ান মিসিনরি······গুপ্তভাবে কিছু মিথ্যা ও অত্যুক্তিবৃত্তান্ত সতীর বিষয়ে লিখিয়া কৌন্সলে অর্পণ করিয়াছিল এবং প্রথম এই কথা কহিয়াছিল যে এ বিষয় অশাস্ত্র······।'—সতীদাহ আবেদন (কলকাতা, ১৭৫২ শক), পৃ. ৭।

২৫ *The life of William Carey*, George Smith, p. 206.

২৬ *Periodical Accounts of the B.M.S.* vol. II, p. 412.

২৭ মিশনরিদের এইসব কার্যকলাপের জন্য সতীসংখ্যা না কমে বরং বেড়ে গেছে বলে ৬.৬.১৮২৫-এ হাউস অব কমন্সে স্যার হাইড ঈস্ট অভিযোগ করেন। দ্র. *Parliamentary Debates*, 1825, vol. 13, p. 1046. See also *British Baptist Missionaries in India (1793-1837)*, E. D. Potts (Cambridge, 1967), pp. 152-3.

২৮ *A Collection of Facts and Opinions relative to the Burning of Widows*, William Johns, (Birmingham, 1816), p. 38.

২৯ *The Correspondence of William Wilberforce* (vol 2), Ed. by his son R & S. Wilberforce (London), pp. 261-2.

৩০ *The Life & Times of Carey, Marshman and Ward*, J. C. Marshman, vol. 2. p. 231.

৩১ E. D. Potts, *Op. Cit.* p. 149.

৩২ *Bengal Judicial (Criminal) Cons.* No. 4, 30.7.1819.

৩৩ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1821, vol. 18, p. 229.

৩৪ *Ibid*, 1826-7, vol. 20, pp. 10-1. পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছিল। ১৮.৬ ১৮২৩-এ মিঃ ফরবেসকে হাউস অব কমন্সে বলতে শুনি, কোনো আইন করেই এ-প্রথা দমন করা যাবে না। দ্র. *Parliamentary Debates*, 1823, vol 9, p . 1020.

৩৫ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1823, vol. 17, p. 63.

৩৬ *Ibid*. pp. 63-4.

৩৭ *Ibid*, 1825, vol. 24, pp. 148-9.

৩৮ *The Suttees' Cry to Britain*, J. Peggs p 78.

৩৯ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24, p. 6.

৪০ *Bengal Judicial (Criminal) Cons No. 62*, 3.12.1824

৪১ *Social Policy and Social Change in Western India* (1817-30), K. Ballhatchet (London, 1957), p. 298.

৪২ ঐ, পৃ. ২৯৯—৩০০।

৪৩ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1830, vol. 28, pp. 32-3.

৪৪ *Ibid*, p. 124.

৪৫ *Ibid*, p. 130.

৪৬ *Ibid*, p. 133.

৪৭ *Ibid*, p. 216

৪৮ *Parliamentary Debates*, 1821, vol. 5, p. 1222.

৪৯ *John Bull*, 15.10.1825.

৫০ *The Oriental Herald*, April, 1827, p. 39.

৫১ *Burning of Hindoo Widows*, The Oriental Herald, April 1824, p. 552.

৫২ *Burning of Hindoo Widows*, Christian Observer, August, 1826, pp. 470-2.

৫৩ *Burning of Hindoo Widows*, The Asiatic Journal, May 1827, pp. 689-734.

৫৪ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1830, vol. 28, p. 216.

৫৫ *The Suttees' Cry to Britain*, J. Peggs, p. 93.

৫৬ *Lord William Bentinck*, The Oriental Observer, 6.7.1828.

৫৭ *The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck*, Ed. C. H. Philips (Oxford, 1977), vol. 1.

৫৮ 'the dreadful responsibility hanging over my happiness in this world and the next' if he let the practice go on 'for one moment longer, not than our security, but than the real happiness and permanent welfare of the Indian population rendered indispensable'. Quoted by John Rosselli in *Lord William Bentinck* (Sussex, 1974), p. 212.

৫৯ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11*, 4. 12. 1829. বেন্টিঙ্ক তাঁর মিনিটে ৪৯ জন অফিসারের মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬০ ঠিক এই কথাই ১৮২৬-এ 'ওরিয়েণ্টল হেরাল্ড'-এ জনৈক প্রবন্ধলেখক বলেছিলেন। দ্র. *On the Burning of Hindoo Widows*, The Oriental Herald, January, 1826, pp. 17-8. বেন্টিঙ্কের চোখে কি এ লেখাটি পড়েছিল ?

৬১ উইলসনের মতামতের জন্য দ্র. *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11*, 4.12 1829.

৬২ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 12*, 4.12.1829.

৬৩ C. H. Philips, *Op. Cit*, vol I. pp. 191-2.

১০। ঠিক কি করেছিলেন রামমোহন ?

১ রামমোহনের বাড়ির ভোজসভায় বাইজি নাচের এক বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি পার্কস। দ্র. *Wanderings of a pilgrim in search of the Picturesque*, F. Parkes (London, 1850), pp. 29-30.

২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩৮১ সংস্করণ), পৃ. ১৯১।

৩ *The Life & Letters of Raja Rammohun Roy*, S. D. Collet (3rd Ed, 1962) Ed. by D. K. Biswas & P. C. Ganguly p. 106 (Supplementary Notes).

৪ বেদান্ত মত, সমাচার দর্পণ, ২২. ৫. ১৮১৯।

৫ *Counter Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta*, The Asiatic Journal, July 1819, pp.15-7. জে. পেগস, জন পয়েণ্ডার প্রভৃতির মতে ১৮১৯-এ এই আবেদনপত্রটি পেশ করা হয়।

৬ *On the Burning of Widows*, The Friend of India, December, 1818, pp. 301-11.

৭ *Review of a Pamphlet on the subject of Burning Widows,* The Friend of India, October, 1819, pp. 483-4.
৮ *Burning of Widows,* The Quarterly Oriental Magazine, June, 1824, p. 164.
৯ *On the effect of the Native Press in India,* The Friend of India (Quarterly), vol. 1, No. 1, 1821, p. 136.
১০ *On Rammohun Roy,* The Govt. Gazette, 15.10.1830.
১১ *British Baptist Missionaries in India,* E. D. Potts, p. 149.
১২ *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, vol. 24 p. 11.
১৩ *Edinburgh Magazine,* September, 1823, p. 350.
১৪ *Burning of Hindoo Widows,* The Ori. Herald, June, 1824
১৫ *On the Burning of Hindoo Widows,* The Oriental Herald, January, 1826, p 2.
১৬ সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যবস্থাপত্রের ইংরেজি অনুবাদের জন্য দ্র *Parl. Papers* (House of Commons), 1821, vol. 18, pp. 119-25.
১৭ *Suttee,* The Scotsman in the East, quoted by Calcutta Monthly Journal, April 1824, p. 293.
১৮ *Rammohun Roy,* The Asiatic Journal, November, 1833.
১৯ *Sel. from Cal. Gazettes,* W. S. Seton Karr, vol. 2, p. 20.
২০ *Memoir,* C. Buchanan (2nd Ed. London, 1812), p. 119.
২১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলকাতা, ১৩৭৬), পৃ. ৮৭, পা. টী
২২ সমাচার দর্পণ ১৪ ১১. ১৮৩২।
২৩ *Human Sacrifices in India,* John Poynder (London, 1827), pp. 221-2.
২৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩৭৯-৮০।
২৫ পৌত্তলিক প্রবোধ (৩য় সং, ১৭৮৮ শক), ব্রজমোহন দেব পৃ ৪৩।
২৬ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, বিনয় ঘোষ (কলকাতা) ৩ খণ্ড, পৃ. ৬০।
২৭ *Concremation,* The Asiatic Journal, July 1826, pp. 76-7.
২৮ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11,* 4 12. 1829.
২৯ *Heber's Journal,* vol 1, p. 48
৩০ *The Bengal Herald,* 7.11.1829, p. 384.
৩১ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No.* 12, 4.12 1829.
৩২ *The Calcutta Journal,* 24.12.1822.

৩৩ *Lord William Bentinck*, John Rosselli, p. 206.

৩৪ *Suttees*, The India Gazette, 27.7.1829, quoted in the Asiatic Journal, January, 1830, p. 48. রামমোহন-বেন্টিঙ্ক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে রামমোহন-অনুরাগীরা একটি কাহিনী ফেঁদেছেন (দ্র. *Rajah Rammohun Roy*, Rev. K. S. Macdonald (Cal. 1879), p. 19. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৪, কলেটের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৫৫-৬)। এতে বলা হয়েছে সতী-বিষয়ে পরামর্শের জন্যে বেন্টিঙ্ক রামমোহনকে ডেকে পাঠালে শাস্ত্রচর্চার অজুহাতে তিনি তা এড়িয়ে যান, পরে বেন্টিঙ্কের 'আগ্রহাতিশয্যে' সৌজন্যবশত তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কাহিনীটি কষ্টকল্পিত, কারণ এদেশে আসার পর থেকে রামমোহনের সঙ্গে বেন্টিঙ্কের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

১১। সতী নিবারণ—সমকালীন প্রতিক্রিয়া

১ *The Bengal Hurkaru*, 9.11.1829.

২ *Abolition of the Suttee practice*, The Bengal Chronicle, 26.11 1829, quoted in the Asiatic Journal, April, 1830.

৩ *John Bull*, 26.11.1829.

৪ *Abolition of Suttees*, Samachar Chandrika, 19.11.1829, quoted by John Bull, 2.12.1829

৫ *Burning of Widows*, Samachar Chandrika 26.11.1829, quoted by Bengal Hurkaru. 7.12.1829.

৬ *Burning of Widows*, Samachar Durpan, 29.11. 1829, quoted by John Bull, 2.12.1829.

৭ *Abolition of Suttees*, Samachar Chandrika, 30.11.1829, quoted by Bengal Hurkaru 8.12.1829.

৮ *Abolition of Suttees*, Samachar Durpan, 5.12.1829 quoted by Bengal Hurkaru, 8.12.1829.

৯ *Abolition of Suttees*, The Bengal Hurkaru, 7.12.1829.

১০ E D. Potts. *Op. Cit.*, P. 156.

১১ *John Bull*, 9.12.1829.

১২ *The Govt. Gazette*, 18.1.1830.

১৩ *The Bengal Hurkaru*, 10.12.1829.

১৪ *Christian Observer*, April, 1830, p. 255.

১৫ *Social Ideas & Social Change in Bengal*, A. F. Salahuddin Ahmed (Leiden, 1965), p. 125.

১৬ রানী রাসমণির জীবনচরিত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭।
১৭ C. H. Philips, *Op. Cit.*, vol. 1, p. 371.
১৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩০১।
১৯ *Dhurma Shubha, Statue to the Secretary*, The India Gazette quoted by Calcutta Monthly Journal, August 1830
২০ *The Hundred and Eleventh Meeting of the Gurum Shubha*, The Calcutta Monthly Journal, May, 1830, pp. 25-7.
২১ *Suttees*, Samachar Durpan quoted by Calcutta Monthly Journal, June, 1830, p. 92.
২২ C H. Philips, *Op Cit*, vol. 1, p 377
২৩ ড: সালাউদ্দিন আমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৩।
২৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী (১৩৬২ সং) পৃ ১০৪।
২৫ *John Bull*, 27 2 1830.
২৬ *Koumudy*, quoted by Cal. Monthly Journal, June, 1830.
২৭ *The Bengal Chronicle*, 13.2.1834.
২৮ *The Asiatic Journal*, November 1834, pp. 148-9.
২৯ *The Bengal Hurkaru*, 14.12.1829.
৩০ *Suttee Prevented*, The Bengal Hurkaru quoted by John Bull, 29.12.1829.
৩১ *Hurkaru*, quoted by Cal Monthly Journal, Dec, 1829.
৩২ সহমরণ (চন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃত), সমাচার দর্পণ, ২৯. ৫.১৮৩০।
৩৩ *Suttee*, Samachar Chandrika, 18.2.1830, quoted by John Bull, 20.2.1830.
৩৪ *A Suttee*, Samachar Chandrika quoted by Samachar Durpan, reprinted in Cal. Monthly Journal, July, 1830.
৩৫ *False report of the Chundrika*, Coumudy quoted by Durpan, reprinted in Cal. Monthly Journal, August, 1830.
৩৬ *Hindu Widows*, The Govt. Gazette, 16.8.1830.
৩৭ *Dhurma Shubha*, The India Gazette quoted by Calcutta Monthly Journal, August, 1830, pp. 8-9.
৩৮ *Anti Suttee Petition*, The India Gazette quoted by Calcutta Monthly Journal, November, 1830, pp. 381-7.

১২। ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

১ *The Suttee Petition*, The Asiatic Journal, January, 1831.

২ *Sel. from English Periodicals*, Benoy Ghosh, vol. 1, p. 146.

৩ *Dinner of the East India Company to Rammohun Roy*, The Asiatic Journal, August, 1831, p. 227.

৪ *The Last days in England of the Rajah Rammohun* Roy, Mary Carpenter (3rd Ed. Cal. 1915), p. 95.

৫ *Parliamentary Debates*, 1831, vol. 4, pp. 576-8.

৬ The Greville Memoirs (vol II), C. F. Greville (London, 1888), p. 315, F. N

৭ *Mr. Bathie*, Enquirer quoted by Calcutta Monthly Journal, April, 1832, pp. 42-3.

৮ সমাচার চন্দ্রিকা, ৫ ৫.১৮৩১।

৯ *The Asiatic Journal*, August, 1832, pp. 223-4.

১০ *Alexandar's East India Magazine*, July, 1832, p. 99.

১১ *Christian Observer*, July, 1832, pp. 499-500.

১২ S. D. Collet, *Op. Cit* , p. 340.

১৩ 'সংবাদ রত্নাবলী', সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত, ৫.১.১৮৩৩।

১৪ 'সম্বাদ কৌমুদী', সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত, ১৭ ১০. ১৮৩২।

১৫ 'জ্ঞানান্বেষণ', সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত, ১০ ১১ ১৮৩২।

১৬ *The Brumho Shuba Meeting*, Enquirer Nov. 13, quoted by the Calcutta Courier, 14.11. 1832.

১৭ *Widow Burning*, H. J. Bushby (London, 1855), p. 8.

১৮ *Paintings of the Sikhs*, W.G. Archer (London, 1966), p. 30.

১৯ বুশবির পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৭-৯, পাদটীকা।

২০ সংবাদ রসরাজ, ২৪.৪.১৮৪৯।

২১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১.১২.১৯৩০, পৃ. ৬।

২২ যুগান্তর, ১৭.১০.১৯৭৫।

২৩ *The Origin of Sati*, Ikbal Kaul, The Illustrated Weekly of India, 18.1.1981, p. 27.

২৪ ঐ, পৃ. ২৬।

২৫ *The Statesman*, 31. 8.1980.

২৬ ইকবাল কাউলের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ২৭।

২৭ *The Statesman*, 24.8. 1980.

গ্রন্থপঞ্জী

ক. অপ্রকাশিত সরকারি সূত্র

Bengal Judicial (Criminal) Consultations (1815-1830).

মুদ্রিত সরকারি সূত্র

Parliamentary Papers (House of Commons)

	Year	Volume
	1821	18
	1823	17
	1824	23
	1825	24
	1826-27	20
	1828	23
	1830	28

Parliamentary Debates

	Year	Volume
	1821	5
	1823	9
	1825	13
	1830	24
	1831	4

গ. পত্রপত্রিকা

Alexander's East India Magazine	1832-33
Asiatic Annual Register	1800-1809
Asiatic Journal & Monthly Register	1816-34
Asiatic Researches	vol. 4
Bengal Chronicle	1827-29, 1831, 1834
Bengal Herald	1829
Bengal Hurkaru & Chronicle	1829
Blackwood's Edinburgh Magazine	1818-20, 1824
Bengal Past & Present, Jubilee Number,	1957
Calcutta Courier	1832
Calcutta Gazette & Commercial Advertiser	1828-29
Calcutta Journal	1818, 1820, 1822-23
Calcutta Magazine & Monthly Register	1830
Calcutta Monthly Journal	1801-33
Calcutta Morning Post	1810-11
Calcutta Review	1867-68
Christian Observer, London	1819, 1824, 1826, 1830-32

Edinburgh Magazine	1822-23
Friend of India (Monthly Series)	1818-28
Friend of India (Quarterly Series)	1821-26
Government Gazette	1818-20, 1829-32
India Gazette	1831-33
John Bull	1823-30, 1832
Missionary Intelligence	1828-29
Missionary Herald	1828-32
Oriental Herald	1824-29
Oriental Observer	1827-28
Quarterly Oriental Magazine	1824
Quarterly Review	1851
The Sun London	1832
জন্মভূমি	১৩০০
বঙ্গদর্শন	১২৮৪
বঙ্গদূত	১৮২৯
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮৩১
সমাচার দর্পণ	১৮১৮-২১, ১৮২৪, ১৮৩০-৩৩

ঘ. প্রকাশিত গ্রন্থ [যেসব গ্রন্থের নাম নির্দেশিকায় উল্লিখিত হয়েছে, তার পুনরুল্লেখ করা হয় নি]

Dasgupta, A. C	*The days of John Company* (Selection from Calcutta Gazette 1824-32) (Calcutta, 1959)
Hamilton, W.	*The East India Gazetter* (vol. 1, 2nd Ed. London, 1828)
Kamal, A. H M.	*The Bengali Press & Literary Writing* (Bangladesh, 1977)
Longhurst, A. H.	*Humpi Ruins* (3rd Ed Delhi, 1933)
Majumdar, R. C.	*On Rammohun Roy* (Calcutta, 1977)
নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত	মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ঢাকা, ১৯৪৫)
বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ	বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-৬৮) (কলকাতা, ১৩৫৪)
শ্রী পান্থ	দেবদাসী (৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮০)

নির্ঘণ্ট